রুদ্ধশ্বাস পিশাচ উপন্যাস

পিশাচের প্রতিহিংসা

অনীশ দাস অপু



পিশাচের প্রতিহিংসা

অনীশ দাস অপু

প্রথম প্রকাশ

একুশে বইমেলা ২০১৩

স্বত্ব

প্রকাশক

প্রকাশক

জাবেদ ইমন

মুক্তদেশ প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং ২ (২য় তলা)

১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৩৪৬, ০১৬৭৫৪১৭৫৬৪

প্রচ্ছদ

অনন্ত আকাশ

অক্ষর বিন্যাস

সাইবর্গ কম

১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ

মেসার্স আল ফয়সাল প্রিন্টার্স, শ্রীশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মূল্য: ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ টাকা) মাত্র

আমেরিকা পরিবেশক: মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক। যুক্তরাজ্য পরিবেশক: সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন ও রূপসী বাংলা, ২২০ টুটিংহাই স্ট্রিট, লন্ডন।

ISBN: 978-984-8690-23-9

PISACHER PROTIHINGSA (A Horor novel) By **Anish Das Apu**, Published by Jabed Imon, Muktodesh Prokashan, Islami Tower (2nd Floor) Banglabazar, Dhaka 1100, Bangladesh. Date of Publication: February 2013, Price: 250 US$: 10

উৎসর্গ

আলী ইমাম

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এ দেশে শিশু সাহিত্যকে যে অতি স্বল্প ক'জন জনপ্রিয় করে তুলেছেন তিনি তাঁদেরই একজন। কৈশোরে পড়া তাঁর অপারেশন কাঁকনপুর ও তিতিরমুখী চৈতা'র কথা আমি এখনো ভুলতে পারি না।

আলী ইমাম ভাই আমার হরর লেখা খুব পছন্দ করেন। তাঁকে আমার এই হরর উপন্যাসটি উৎসর্গ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

প্রিয় আলী ইমাম ভাই, আপনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং অসাধারণ সব লেখা দিয়ে আমাদেরকে ভরিয়ে তুলুন।

ভূমিকা

গত বইমেলায় মুক্তদেশ প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী জাবেদ ইমন আমার একটি হরর গল্প সংকলন বের করেছিলেন *'প্রেতচক্র'* নামে। এবারে তাঁর অনুরোধে এই পিশাচ উপন্যাসটি লিখে দিতে হলো।

আমি বাংলাবাজারের প্রকাশকদের জন্য খুব বেশি হরর কিংবা পিশাচ উপন্যাস লিখিনি। স্বল্প যে ক'টি লিখেছি সবগুলোই পাঠক সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন। আমি নিশ্চিত *'পিশাচের প্রতিহিংসা'* অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করবে। কারণ এমন গা ছমছমে পিশাচ উপন্যাস আমার পাঠকরা এর আগে কখনও পড়েননি, গ্যারান্টি দিয়েই বলতে পারি। এ বইটি যিনি কম্পোজ করেছেন, সাইবর্গ কমের আজাদ ভাই, তিনি বেশ কয়েকবারই আমাকে বলেছেন লেখাটি রাতের বেলা কম্পোজ করার সময় একলা ঘরে তাঁর নাকি খুব ভয় লাগছিল! আজাদ ভাই শুধু ভালো কম্পোজই করেন না, পাঠক হিসেবেও তিনি দারুণ এবং যথেষ্ট খুঁতখুঁতেও। ভালো না লাগলে সোজা মুখের ওপর বলে দেন অমুক বইটি তাঁর পছন্দ হয়নি। আজাদ ভাইয়ের যখন বইটি কম্পোজ করার সময় গা ছমছম করেছে, আমি জানি, আমার হরর প্রিয় পাঠকরাও *'পিশাচের প্রতিহিংসা'* পড়ার সময় একই অনুভূতি দ্বারা তাড়িত হবেন। আর আমার নিয়মিত পাঠকরা তো জানেনেই অনীশ দাস অপুর হরর ও পিশাচ কাহিনী মানেই ভয় ও আতংকের জগতে প্রবেশ যেখান থেকে ফিরে আসতে চাইলেই ফেরা যায় না!

অনীশ দাস অপু

এক

রাত দশটা। এগারোই জুন। হাই পাওয়ারের পার্টি চলছে স্কাই হাইতে। টাইল রিক্রিয়েশন ডেস্কের চারধারে সাজানো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চারটে স্পিকার কান ফাটানো শব্দে বাজিয়ে চলেছে ডিসকো মিউজিক আর সে বাজনার তালে নৃত্যরত অতিথিদের গায়ে বর্ণালী নকশা তৈরি করছে রঙিন স্পটলাইট। অ্যাপার্টমেন্ট হাউজটির উঠোনে ছড়ানো ছিটানো ছোট ছোট ঝোপের আড়ালের টেবিলে বসে তরুণ জুটিরা একান্ত আলোচনায় মগ্ন। লম্বা একটি টেবিলে পরিবেশিত হয়েছিল খাদ্য। সে টেবিলে এখন কাগজের ছেঁড়া প্লেট, কোঁচকানো ন্যাপকিন, মুরগির হাড়, চিবানো হাড্ডি, সালাদ, টুথপিক ইত্যাদি নানা আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। অতিথিদের জন্য মিচেলরের ক্যান আর কার্লো রসি বার্গান্ডির জাগ ভর্তি। যার যত ইচ্ছা মদ পান করো কেউ মানা করছে না। ড্যান্সাররা যেখানে উদ্দাম নৃত্যকলা দেখাচ্ছে, তার পাশেই বিশাল একটি সুইমিংপুল। খালি। পান্নাসবুজ পানি ঝলমল করছে।

সাবরিনা স্টুয়ার্ট মিউজিকের তালে দুর্দান্ত নাচছে। তার কুচকুচে কালো কেশরাজি নাচের তালে ঘাড়ের কাছে দোল খাচ্ছে, তার কাজলকালো হরিণী চোখ জোড়া ঝকঝকে এবং উজ্জ্বল। শরীর সেঁটে থাকা টি-শার্ট এবং টাইট হোয়াইট জিনসে তাকে দারুণ লাগছে।

সাবরিনা তার নৃত্যসঙ্গীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। তার নাচের সঙ্গিটি, রবার্ট ডান, সাবরিনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচার চেষ্টা করছে। তবে ডিসকো ড্যান্স এত সহজ জিনিস নয় এবং রবার্ট এতে খুব একটা সুবিধে করতেও পারছে না। অবশ্য সাবরিনার সঙ্গে নাচতে পারছে এতেই সে মহাখুশি। সাবরিনাও রবার্টের সঙ্গ উপভোগ করে। রবার্ট ড্যান্স কম্পিটিশনে কোনোদিন পুরস্কার জিতবে না বটে তবে সে বেশ স্মার্ট, ভালোমানুষ এবং তার সঙ্গে কথা বলে মজাই পায় সাবরিনা। তার মনে হচ্ছে সে রবার্টের প্রেমে পড়ে যাবে।

মঞ্চে যারা নাচছে তাদের একজন সাবরিনাকে লক্ষ্য করছিল। তার নাম পিটার লানডাউ। পিটারকে এক কথায় বলা যায় একজন টেরিফিক ড্যান্সার। তার পরনে সাদা লিনেন জ্যাকেট এবং প্যান্ট তার ওয়েস্টার্ন শার্টটি বেল্টের বাকল পর্যন্ত খোলা। রোমশ বুক এবং পেট তাতে পুরোটাই উন্মুক্ত। সে স্কাই হাই'র বাসিন্দা নয়, এক মেয়ের অতিথি হিসেবে এখানে এসেছে। তবে মেয়েটির নাম সে ভুলে গেছে। কেথি, লিন্ডা বা এরকম কিছু একটা নাম বোধ হয়। মেয়েটি পিটারের সঙ্গে স্টেপ মেলাতে

খুবই আগ্রহী। কিন্তু মেয়েটির প্রতি কোনো নজর নেই পিটারের। সে তাকিয়ে আছে সাবরিনার দিকে। একেই বলে সুন্দরী, মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না পিটার। যেমন চেহারা তেমনি ফিগার!

সে সাবরিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পিস্তলের মতো বুড়ো আঙুল নির্দেশ করল। হাঁক ছাড়ল, 'হাই, দেয়ার, ফক্সি লেডি।'

সাবরিনা পিটারের দিকে একঝলক তাকাল। মুখে ফুটল রহস্যময় হাসি। তারপরই সে নজর ফেরাল রবার্টের প্রতি। সাবরিনার মুচকি হাসিই পিটারের জন্য কাফি। সে আমোদই পাচ্ছিল দেখে লম্বা চওড়া চেহারার যুবকটি সাবরিনার সঙ্গে নাচের তাল মেলাতে পারছে না। বারবার ভুল স্টেপ দিয়ে ফেলছে। সে সিদ্ধান্ত নিল যেভাবেই হোক এই কৃষ্ণকেশীর সঙ্গে ড্যান্স করার সুযোগ সে করে নেবে এবং যুবতীটিকে এমন কিছু নাচের মুদ্রা দেখাবে যা জন ট্রাভোল্টার পক্ষেও নাচা সম্ভব নয়।

'তোমার বন্ধু নাকি?' সাবরিনার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে জানতে চাইল রবার্ট ড্রান।

'জীবনেও দেখিনি। লোকটা কে গো?'

'আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়াটে এক মেয়ের সঙ্গে এসেছে। বলছে সাইকিক না কী যেন। লোকটি যে-ই হোক নাচ জানে!'

সাবরিনা আড়চোখে একবার দেখল পিটার লানডাউকে। 'তার তা-ই ধারণা।'

এক মুহূর্তের জন্য পায়ের একটা স্টেপ হারিয়ে ফেলল রবার্ট। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল সাবরিনার দিকে তাকিয়ে। 'কেউ কেউ রিদমটা খুব পারে আবার অনেকে মিস করে।'

'একটা বিরতি নেবে?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'আমি কি তোমাকে ক্লান্ত করে তুলেছি?'

'খুব গরম লাগছে।'

'তাহলে একটা বিয়ার নিয়ে আসি,' প্রস্তাব দিল রবার্ট। 'তোমার চলবে তো?'

'আপত্তি নেই।'

মিউজিকের তালে শরীর দোলাতে দোলাতে ওরা নৃত্যরত শরীরগুলোর মাঝ দিয়ে পথ করে টাইল ডেস্কের দিকে এগোল।

'তুমি বিয়ার নিয়ে এসো ততক্ষণে আমি সুইমিংপুলে একটা ডুব দিয়ে ঠান্ডা হই।'

'তুমি কখন খেয়েছ? খিদে পেয়েছে নিশ্চই।'

প্রিয় রবার্ট, ভাবল সাবরিনা, *আমার প্রটেক্টর*। মুখে বলল, 'মনে নেই। তুমি কতক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করবে?'

'যতক্ষণ দরকার ততক্ষণ,' বলল রবার্ট। 'ত্রিশ মিনিট, একঘণ্টা কিংবা তারও বেশি।'

রবার্ট ড্যান্সারদের বৃত্ত ঘুরে আইস ভরা টাবের দিকে পা বাড়াল। তার দিকে এক পলক ভালোবাসা মাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সাবরিনা তারপর টাইল ডেক আর সুইমিংপুলের মাঝখানের ঘাসের জমিটা পার হলো। পানি দেখে সাংঘাতিক লোভ লাগছে সাবরিনার। ওকে যেন ডাকছে দু'হাত তুলে। শীতল, পরিষ্কার এবং নীল।

জুতো খুলে ফেলল সাবরিনা। দেখল যাকে সে মনে মনে ডিসকো কিং উপাধি দিয়েছিল সেই যুবকটি তার ড্যান্স পার্টনার স্বর্ণকেশী থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে ওর দিকেই আসছে।

'হাই,' বলল সে। 'আমি পিটার লানডাউ। কেমন চলছে আপনার?'

'ভালো। আমি সাবরিনা।'

'চিনি আপনাকে। সাবরিনা স্টুয়ার্ট।' বিয়ার টাবের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'আপনি ওই ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে এসেছেন, না?'

'রবার্ট ডান, জ্বী।'

'আপনার নাচের গতি ভালো। তবে তাল মেলাতে হলে আরও ভালো নাচতে পারে এমন কাউকে আপনার বেছে নেয়া উচিত ছিল।'

'আপনাকে বেছে নেয়ার কথা বলছেন?'

'আমাকে বেছে নেয়ার কথা বলছি।'

'নো, থ্যাংকস। এখন আমাকে একটু মাফ করতে হবে। আমি একটু গোসল করব।'

'পরে আমরা কি আবার একত্রিত হতে পারি না?'

'আমি সেকেলে মানসিকতার মানুষ। আমি তার সঙ্গে নাচ করি যে আমার সঙ্গে লেগে থাকে।'

'বুঝতে পারছি। আপনাকে পরে কখনও ফোন করতে পারি?'

'নাহ্, তা করা ঠিক হবে না।'

'লিবারেটেড, অ্যাঁ? গুড, আই লাইক দ্যাট।' জ্যাকেটের পকেট থেকে একখানা কার্ড বের করে সে সাবরিনাকে দিল।

'তাহলে আপনি একটা ফোন দিয়েন।'

'এত আশা করবেন না।'

সুন্দর, মসৃণ ঝকঝকে এক পাটি দাঁত বের করে হাসল পিটার।

'আমাকে ফোনে না পেলে একটি মেসেজ রাখবেন আমার ফোনে। আমি যোগাযোগ করব। চিয়াও।'

মাথা নাড়ল সাবরিনা। দেখল লোকটা তার স্বর্ণকেশীর কাছে ফিরে গেছে। সে মেয়েটিকে এতক্ষণ একা রেখে আসায় রেগে অস্থির। লোকটার অতিরিক্ত স্মার্টনেস

পছন্দ না হলেও তাকে অপছন্দও করতে পারছে না সাবরিনা। লোকটার মধ্যে শিশুসুলভ একটা ভাব আছে। সে হাতের কার্ডখানায় চোখ বুলাল।

পিটার ল্যানডাউ
সাইকিক কাউনসেলিং

লরেল ক্যানিয়নের একটা ঠিকানা রয়েছে ফোন নাম্বারসহ। মৃদু হেসে কার্ডটি জিনসের পকেটে ঢোকাল সাবরিনা। সাইকিক কাউন্সেলিং। ওয়াও!

লস এঞ্জেলেস ডজার্স পোগো লাগানো টি-শার্টটা খুলে ফেলল সাবরিনা। নিচে নীল রঙের ওয়ান পিস সুইম স্যুট। দু'পাশে কাটা। আজ রাতে সম্ভবত কেউই সুইমিংপুলে নামবে না তবে নতুন কেনা স্যুটটাকে না দেখিয়ে পার্টি ত্যাগ করার কোনো ইচ্ছেই নেই সাবরিনার।

শরীর কামড়ে থাকা ফ্রেঞ্চ জিনস প্যান্টের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করল ও, তাকাল পিটার লানডাউসহ কয়েকজন তরুণের দিকে। তারা সবাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে ওদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল সাবরিনা, তারপর ডাইভ দিল পানিতে।

সারফেসের নিচে তীরের ফলার মতো ঢুকে গেল সাবরিনার খাপখোলা তরবারি শরীর, হাত দুটো সামনে সোজা করে রেখেছে ও, পা দুটো পেছনের দিকে টানটান, আঙুলগুলো খাড়া। পুলের পানি যেন ওর শরীরে বুলিয়ে দিল শীতল আদরের পরশ। ডাইভের গতি হ্রাস পেতে ছন্দময় ভঙ্গিতে পা ছুঁড়তে লাগল সাবরিনা। সুইমিংপুলের টাইল দেখা যাচ্ছে তলের দিকে, গভীর পানিতে। রেকর্ড করা মিউজিক পানির নিচেও শোনা যাচ্ছে বটে তবে আওয়াজটা ভোঁতা এবং দূরাগত, যেন ভারী সুতোর অনেকগুলো স্তর পার হয়ে ফিল্টার করে আসছে।

হাতজোড়া সামনের দিকে সোজা করে রেখে পানিতে লাথি কষাল সাবরিনা। এক মুহূর্ত ভেসে রইল ও, বুগেনভিলিয়ার মিষ্টি সুবাস নিয়ে এল রাতের বাতাস। পুলের কিনারে ও ড্যান্সারদের মাথা এবং কাঁধ দেখতে পাচ্ছে। দেরিতে আসা কে একজন তার বন্ধুদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করল। হেসে উঠল একটি মেয়ে। বেশ জমে উঠেছে পার্টি। এখানে আসতে পেরে ভালোই লাগছিল সাবরিনার। উষ্ণ বাতাস, ঠাণ্ডা পানি, মিউজিক, তরুণদের আড্ডা সবমিলে চমৎকার একটা অনুভূতি আচ্ছন্ন করে আছে ওর দেহমন। শরীরটাকে বলের মতো গোল করল সাবরিনা, তারপর পুলের গভীরতম অংশের উদ্দেশে সাঁতার দিল।

ঠিক তখন কিছু একটা খপ করে চেপে ধরল ওর পা।

দুই

প্রচণ্ড ব্যথায় নীল হয়ে গেল সাবরিনা। জ্ঞান হারানোর দশা হলো ওর। ঝট করে একটা হাত চলে গেল হাঁটুর নিচে। টের পেল ওখানকার গ্রাসিলিস মাসল মুঠোর মতো দলা পাকিয়ে গেছে। চিৎকার দেয়ার জন্য মুখ খুলল সাবরিনা। আর তখন বুঝতে পারল ও পানির নিচে চলে এসেছে।

পাগলের মতো দুই হাত ছুড়ে সারফেসে ভেসে উঠতে চাইল সাবরিনা। পায়ের খিঁচ ভয়ানক ব্যথা দিচ্ছে ওকে, পায়ের নিচের অংশ ভাঁজ হয়ে আসতে চাইছে উরুর পেছনে। ক্লোরিন স্বাদের পানিতে ভরে গেছে ওর মুখ এবং গলা। চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করতেই মুখ দিয়ে বাতাসের বড় একটা বুদ্বুদ বেরিয়ে এল।

সারফেসে চলে এল সাবরিনা, পা দিয়ে পানিতে লাথি মারতে চাইল। কিন্তু খিঁচ ধরা পায়ে ব্যথার আগুনই জ্বলল শুধু, লাভ হলো না কোনো। উল্টো ডিগবাজি খেয়ে পানির গভীরে প্রবেশ করল সে।

দিগবিদিক হারিয়ে ফেলেছে সাবরিনা তবু কেমন করে যেন পানির ওপর ভেসে উঠল। বাতাস দিয়ে ফুসফুস ভরে তোলার মরিয়া চেষ্টা করল ও কিন্তু পানি আর শ্লেষ্মায় বন্ধ হয়ে গেছে বাতাস ঢোকার রাস্তা। মাত্র কয়েকগজ দূরে লোকজন নাচানাচি করছে। সাবরিনা তাদেরকে ডাক দিতে চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে কেবল ক্ষীণ একটু আওয়াজ বেরুল। অনেকেই তার দিকে চাইল, হাসল, হাত নাড়ল এবং নাচে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আবার পানির নিচে চলে গেল সাবরিনা। কানের মধ্যে কীসের যেন শোঁ শোঁ গর্জন। তার চোখের সামনে আলোর রঙিন ফালি নাচছে ওদিকে ওর পৃথিবীর আলো ক্রমে নিভে যেতে শুরু করেছে।

এ ঘটতে পারে না!

সাবরিনার মস্তিষ্ক মেসেজ পাঠাল কিন্তু তার মাসলগুলোর কাছে সে বার্তা পৌঁছাল না।

এ হাস্যকর। একটা অ্যাপার্টমেন্টে সুইমিংপুলে তুমি ডুবে মরতে পার না যেখানে মাত্র কয়েকগজ দূরে জনা পঞ্চাশেক লোক রয়েছে এবং তোমার বয়ফ্রেন্ড কিছুক্ষণের মধ্যেই বিয়ারের দুটো ক্যান নিয়ে ফিরে আসছে।

সাবরিনার মনে হচ্ছে ওর হাত আর পাগুলো সীসের তৈরি। ভীষণ ভারী, খিঁচ ধরা পেশীতে আর ব্যথা অনুভূত হচ্ছে না বটে তবে তাতে কীইবা আসে যায় যখন ও বিন্দুমাত্র নড়াচড়াই করতে পারছে না। ওর চারপাশটা দ্রুত আঁধার হয়ে আসছে।

ঈশ্বর, আমি মরতে চাই না! আমার বয়স মাত্র পঁচিশ এবং আমি দুনিয়াদারীর অনেক কিছুই এখনও দেখিনি।

সাবরিনার মাথার ভেতরে ঝিনঝিন করছে। কেমন ফাঁকা আওয়াজ হচ্ছে। তার চারপাশটা নিকষ অন্ধকার। মাথাটা প্রচণ্ড ব্যথায় ফেটে যাচ্ছে। ওকে শ্বাস নিতেই হবে। ও মুখ খুলল এবং মুখের ভেতরে গলগল করে ঢুকে গেল পানি। ওর বুকের মধ্যে, একপাশে কী যেন একটা গড়িয়ে গেল, তারপর আর কোনো ব্যথা রইল না সাবরিনার।

রবার্ট ডান দেখেছিল সাবরিনা সুইমিংপুলে ডাইভ দিয়ে পড়েছে এবং সারফেসের ঠিক নিচে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে, ডলফিনের মতো মসৃণ এবং ছন্দময় গতি। দারুণ দেখাচ্ছিল ওকে। পানির ওপর ভেসে উঠল সাবরিনা, হাসল।

রবার্ট মিশেলব-এর দুটো বরফ ঠাণ্ডা ক্যান তুলে নিল টাব থেকে, সে সঙ্গে দুটো স্কাইরোফোম কাপ নিল টেবিলের ওপরের স্তূপ থেকে। সাবরিনা বিয়ার পছন্দ করে, ভালোবাসে বেসবল। রবার্ট এরকম একটা মেয়েকে নিজের গার্লফ্রেন্ড হিসেবে পেয়ে খুবই গর্ববোধ করছিল।

ডেক এ ডিস্কো ড্যান্সিংয়ে ব্যস্ত লোকজনের দিকে তাকাল রবার্ট। ওদের বেশিরভাগের বসবাস স্কাইহাই কমপ্লেক্সে, বাকিদেরকে ও আগে কখনও দেখেনি। পিটার লানডাউ'র মতো অতিথিদেরকে মাঝে মাঝে এখানে আসতে দেখেছে সে।

পিটার লানডাউ পার্টিটাকে একদম জমিয়ে দিয়েছে।

নাচতেও পারে বটে লোকটা! নিজেদের পার্টনারদের ফেলে বেশ কয়েকটি মেয়ে পিটারকেই লক্ষ করছে। লোকটার মধ্যে জিনিস আছে, মনে মনে স্বীকার করল রবার্ট। কিন্তু তার কাছে তো আর সাবরিনা নেই। সাবরিনা এ পার্টির সমস্ত মেয়ে থেকে আলাদা। তাকে বালিকাবন্ধু হিসেবে পেয়ে রবার্টের জীবন সত্যি ধন্য।

রবার্ট একঝলক দেখতে পেল সাবরিনাকে পুলের গভীরতম অংশে, ভেসে উঠল। ড্যান্সারদের উদ্দেশ্যে হাতও নাড়ল একবার। একটা টরটিলা চিপস নিয়ে সে এগোল পুলের দিকে, সাবরিনার সঙ্গে যোগ দিতে।

পুলের ধারে এসে সাবরিনাকে প্রথমে কোথাও দেখতে পেল না রবার্ট। তারপর ওকে পুলের মাঝখানে আবিষ্কার করল। সাঁতার কাটছে।

না, সাঁতার কাটছে না, সারফেস আর পানির তলের মাঝখানে ভেসে রয়েছে

সাবরিনা। ঢেউয়ের দোলায় মৃদু দুলছে শরীর।

দৃশ্যটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল রবার্টকে। 'উঠে পড়ো। আর সাঁতার কাটতে হবে না। বিয়ার নিয়ে এসেছি আমি।'

কোনো সাড়া দিল না সাবরিনা।

সাড়া না দেয়ারই কথা, ভাবল রবার্ট। কারণ পানির নিচে তো আর কথা শুনতে পাচ্ছে না সাবরিনা।

পুলের ধারের ধাতব টেবিলের ওপর বিয়ারের ক্যান দুটো আর কাপজোড়া রাখল ও। প্রথম ক্যানটা খুলে নিয়ে বিয়ার ঢালল গ্লাসে। সাবরিনা সারফেসের নিচে ভেসে রয়েছে এখনও। রবার্ট বিয়ারের ক্যানটি নামিয়ে রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সাবরিনার দিকে। অলস ভঙ্গিতে চিৎ হলো সাবরিনা, ওর হাতজোড়া শুঁড়ের মতো ভাসছে শরীরের দুইপাশে। চোখদুটো বিস্ফারিত। হাঁ করে খোলা মুখ।

'ওহ্, যীশাস!' এক লাফে পুলের কিনারে চলে এল রবার্ট। লাফ দিল। ওর গায়ের কাপড়চোপড়ের ওজন– চ্যাম্বেরি শার্ট, ডেনিম বেল্ট, জিনস- টান মেরে ওকে পানির নিচে নিয়ে গেল। সুয়েড বুট পরে পা দিয়ে উন্মাদের মতো লাথি ছুড়ে ভুস করে ভেসে উঠল যেখানে সাবরিনাকে ভেসে থাকতে দেখেছিল সেখানে। হাত বাড়িয়ে ধরল ওকে। সাবরিনার হাতের মাংস ঈল মাছের মতো শক্ত এবং ঠাণ্ডা। রবার্ট এক হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে সারফেসে ঠেলে তুলল। 'হেলপ! গড, কেউ আমাকে সাহায্য করো!'

সুইমিংপুলের ধারের লোকজন রবার্টের চিৎকার শুনে তাকাল। রবার্টের আতংকিত চেহারা আর নিশ্চল শরীরটা দেখামাত্র তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হলো। দু'জন তরুণ ছুটে এল পুলে। লাফ দিয়ে পড়ল পানিতে। সাবরিনাকে তীরে টেনে নিয়ে আসতে সাহায্য করল রবার্টকে। ধরাধরি করে সাবরিনাকে টেনে তোলা হলো পুলের ওপর, শুইয়ে দেয়া হলো ঘাসজমিনে।

হট্টগোলে বন্ধ হয়ে গেল নাচ, বাকি লোকজন সবাই ছুটে এল ওদের কাছে। রবার্ট সাবরিনার ওপর ঝুঁকল। চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছে ফ্যাকাসে মুখ আর নিস্প্রাণ চোখের দিকে। একটি মেয়ে অন্যদিকে ফিরে বমি করে দিল।

'ওকি মারা গেছে?' জিজ্ঞেস করল কেউ।

'আরে, দেখেও বুঝতে পারছ না? ও মরে গেছে।'

রবার্ট দু'হাতে বাঁধল সাবরিনার মাথা। কী ছোট্ট দেখাচ্ছে মাথাটা! সাবরিনার মুখ আর নাক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল পানি।

'সাবরিনা!' হাউমাউ করে কেঁদে উঠল রবার্ট। 'সাবরিনা! সাবরিনা! ফিরে এসো!'

তিন

বুকে শেষবার তীব্রতম খিঁচুনির পরে হাল ছেড়ে দিয়েছিল সাবরিনা। বুঝতে পেরেছিল লড়াই করে আর লাভ হবে না। যে মুহূর্তে সে হাল ছেড়ে দিল সে মুহূর্তে তার মাথা, ফুসফুস এবং খিঁচ ধরা পায়ের প্রচণ্ড ব্যথা দূর হয়ে গেল। আর কোনো সমস্যা হচ্ছিল না সাবরিনার। উষ্ণ এবং আরামদায়ক লাগছিল সবকিছু, মনে হচ্ছিল শান্তির জগতে প্রবেশ করেছে সে।

কানের ভেতরকার ঝিনঝিন শব্দ আর প্রলয়ংকরী গর্জনটাও আর নেই! চারদিকে চমৎকার নীরবতা। আর ওকে ঘিরে রেখেছে আঁধারের একটা চাদর।

ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটে গিয়ে প্রতিভাত হতে শুরু করল আলো। প্রথমে আবছা লাগল তারপর সব পরিষ্কার হয়ে এল। সাবরিনা আবার দেখতে পাচ্ছে সবকিছু। চিন্তাশক্তির চেয়েও দ্রুতগতিতে ছবিগুলো ছুটে চলছিল। ওর মনের মাঝের ছবি।

সাবরিনা দেখছিল নিজের ছোটবেলার ছবি। ছোট্ট, সুখী একটি শিশু সে, তার বিশালদেহী বাবা তাকে নিয়ে শূন্যে লোফালুফি করছেন। সাবরিনা খেলা করছে জর্ডির সঙ্গে, ওদের সোনালী রঙের রিট্রিভার কুকুর। বাড়ির মস্ত উঠোনে। কিন্তু জর্ডি যেদিন ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে মারা গেল সেদিন সাবরিনার বুকভাঙা কান্না দেখে কে!

সাবরিনা দেখছে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হবার প্রথম দিনে মাকে রেখে একা স্কুলে যাওয়ার সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যটি। অনেক ছেলেমেয়েকে সে দেখতে পাচ্ছে যাদের কথা ভুলে গিয়েছিল কবে। সে মুখগুলো এমন তাজা লাগছে যেন গতকালই ওদেরকে দেখেছে সাবরিনা। ছবিগুলো অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে সরে যাচ্ছে, চোখের পলকে একটি ছবির জায়গা দখল করছে আরেকটি।

সে দেখছে সেই ছোট্ট বালিকাটির শরীরের পরিবর্তন ঘটেছে ফিফথ গ্রেডে উঠে, নতুন নতুন সব অচেনা আবেগ তাকে গ্রাস করছে।

এরপরে নিজেকে জুনিয়র হাইস্কুলে আবিষ্কার করল সাবরিনা– নাচছে, ছেলে বন্ধু, সাগর সৈকত। হাইস্কুলে চিয়ারলিডার হওয়ার চেষ্টা করছে, পেরেছেও এবং ভাবছে এরচেয়ে মধুর বিজয় আর কিছুতে হতে পারে না। সতেরো বছর বয়সে ববি মিলসের প্রেমে পড়েছে সে, সেক্স করতে গেছে, প্রথম দিকে অভিজ্ঞতাটি সুখকর মনে না হলেও পরেরবার ব্যাপারটি উপভোগ্যই ছিল।

সাবরিনা UCLA-এতে এসেছে, ভর্তি হতে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়েছে। বেসবল টিমে অংশ নিয়েছে সে।

এরপরের ছবিতে সাবরিনা দেখল সে গরমের ছুটিতে ম্যামথ-এ কাজ করছে। সিগমানু থেকে আসা গেরি রোনাল্ড নামে এক যুবকের সঙ্গে সিরিয়াসলি জড়িয়ে পড়েছে সে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া সত্ত্বেও গর্ভবতী হয়ে পড়েছে সাবরিনা। গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে খুব ভয় পেয়েছিল সে তবে ব্যাপারটা খুব দ্রুত ঘটে যায় বলে সে একটু হতাশই হয়েছিল। এরপর সে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করে।

এরপর গ্রাজুয়েশন ডে-তে মা এবং বাবা ক্যাম্পাস লেনে ফোল্ডিং চেয়ারে বসেছিলেন, তাদেরকে দেখাচ্ছিল নরমাল রকওয়েলের আঁকা ছবির মতো। তারপর সেই বছরটি যে বছরে বাইসাইকেলে চেপে গোটা ইউরোপে চক্কর দিয়েছিল সাবরিনা, সঙ্গে ছিল জার্মান তরুণ হ্যান্স ফ্লেবার। সে সময়টিও দারুণ কেটেছিল ওর।

তারপর বাড়ি ফিরে আসা, চাকরিতে ঢোকা, হলিউডের বীচউড ড্রাইভে ছোট গেস্ট হাউজে উঠে আসা। UCLA-র এক্সটেনশন ক্লাসে রবার্ট ডানের সঙ্গে পরিচয়, প্রথম দর্শনেই তাকে পছন্দ হওয়া। ওদের প্রথম ডেট, ডকার্স এবং সিনসিনাটির মধ্যেকার টানটান বেসবল প্রতিযোগিতা। জুন মাসের এগারো তারিখে রবার্টের অ্যাপার্টমেন্টের পার্টিতে আগমন...

এ জায়গায় এসে ছবিগুলো হঠাৎ সব মুছে গেল এবং সাবরিনা আবার হাজির হয়ে গেল স্কাইহাই অ্যাপার্টমেন্টের উঠোনে। সে সুইমিংপুলের নীল পানিতে ভাসছে, তার শরীরে যেন কোনো ওজন নেই।

আমার শরীর।

নিজের ভাসমান শরীরটাকে চিনতে পেরে সাবরিনা ভয় পেল না কিংবা আঁতকে উঠল না, শুধু আবছা একটা দুঃখবোধ হলো। শরীরটার জন্য মায়া লাগছে তার। এমন অসহায় দেখাচ্ছে শরীরটাকে...। পানির নিচে চোখজোড়া খোলা, তাকিয়ে আছে শূন্যে। কালো মেঘের মতো চুলগুলো ঘিরে রেখেছে মুখমণ্ডল। ওই শরীর আর কাজে লাগবে না সাবরিনার। ওটা স্রেফ শীতল, অচেনা একটা মাংসের স্তূপ।

সাবরিনা দেখল রবার্ট বিয়ারের দুটো ক্যান নিয়ে এল পুলের ধারে। সে পানিতে ভাসমান দেহটির দিকে একবার তাকাল। প্রথমে তাকে বিস্মিত মনে হলো, তারপর ভীত। সে লাফ দিয়ে পানিতে নেমে পড়ল। পাগলের মতো সাঁতরে আসছে শরীরটির দিকে।

বেচারী রবার্ট, তুমি অনেক দেরি করে ফেলেছ। আমি দুঃখিত।

লোকজন তাদের নাচের জায়গা থেকে ছুটে এল। তারা নিস্প্রাণ শরীরটা পানি থেকে তুলল। ফ্যাকাসে সাদা দেহ। তারা দেহটিকে ঘাসের ওপর শোয়াল। লোকগুলো ওকে যখন বাঁচিয়ে তুলবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সাবরিনা তখন অপার শান্তি অনুভব করছে। সে মুক্তভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে, ঘাসের ওপর শুয়ে থাকা

মৃত মেয়েটির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। তবে শান্তি শান্তি ভাবটা কেন জানি আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাচ্ছিল। একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরেছিল সাবরিনাকে। তার মনে হচ্ছিল এ অবস্থা শেষ পর্যন্ত বেশিক্ষণ থাকবে না।

আমার কিছু একটা করা উচিত, কোথাও যাওয়া উচিত।

কী? কোথায়?

প্রথমে খুব অস্পষ্টভাবে টানটা অনুভব করল সাবরিনা। চুম্বকের মতো কিছু একটা ওকে আকর্ষণ করছে, সুইমিংপুলের দৃশ্যপট থেকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। অনুভূতিটা মন্দ লাগছিল না এবং যে জিনিসটি ওকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল তার হাতে নিজেকে সমর্পণ করল সাবরিনা।

সাবরিনা ভেসে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে লম্বা, ছায়াময় একটি গুহা ধরে। গুহার দু'পাশের দেয়ালে গভীর সব কুলুঙ্গি, মনে হচ্ছে ওখানে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, ওকে দেখছে। বিদ্যুতের গতিতে ওদেরকে পাশ কাটাল সাবরিনা যদিও ও যে ছুটে চলেছে তা মোটেই টের পাচ্ছে না।

অসংখ্য মুখের সারি সাঁ সাঁ করে সরে যাচ্ছে সাবরিনার দু'পাশ থেকে। দেখে মনে হচ্ছে তারা হাসছে, আন্তরিক হেসে ওকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। দু'একটি চেহারা চেনাচেনা লাগলেও ভালো করে লক্ষ করার আগেই সেখানে হাজির হয়ে যাচ্ছে নতুন মুখ।

দূরে, অনেক দূরে আলোর একটা বৃত্ত চোখে পড়ল সাবরিনার। ওটাই সম্ভবত গুহার শেষ প্রান্ত। এত দূর থেকেও সাবরিনা অনুমান করল ওখানে কেউ একজন বসে আছে, অপেক্ষা করছে ওর জন্য। বোধহয় পুরুষ মানুষ, তবে ঠিক নিশ্চিত নয় সাবরিনা। আলোটা যেন ওই লোকের শরীর ফুঁড়েই বেরুচ্ছে।

বসে থাকা লোকটির কাছে যাওয়ার জন্য অদম্য একটা তাগিদ অনুভব করল সাবরিনা। ও এ মুহূর্তে শুধু চায় ওখানে যত দ্রুত সম্ভব পৌছে ওই লোকটির সঙ্গে যোগ দিতে, ওই আলোর উষ্ণতা আর নিরাপত্তার স্বাদ পেতে ব্যাকুল সে। মূর্তিটা ওকে হাত ইশারায় ডাকল, সাবরিনার ইচ্ছে করছে আরও জোরে উড়ে গিয়ে টানেলের আলোর কাছে পৌছাতে।

কুলুঙ্গিতে দাঁড়ানো ছায়া ছায়া লোকগুলোকে তীব্রবেগে ছুটে চলার কারণে ঝাপসা লাগছে সাবরিনার। তবে তাদের মৃদু নড়াচড়া, ফিসফিসে কণ্ঠ সবই শুনতে পাচ্ছে সে। তারা যেন সাবরিনাকে দেখে খুশি হয়েছে। সাবরিনা চোখ ধাঁধানো গতিতে ছুটে চলেছে বটে কিন্তু গুহার দৈর্ঘ্যও যেন একই সাথে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ফলে গন্তব্যে পৌছাতে দেরী হয়ে যাচ্ছে ওর।

সাবরিনা!

একটি কণ্ঠ তার নাম ধরে ডাকল। টানেলের শেষ মাথায় বসা লোকটি তাকে আহ্বান করেনি কিংবা দেয়ালে দাঁড়ানো লোকদেরও কেউ ওকে ডাকেনি। তাহলে

কোথেকে এল এ ডাক?

সাবরিনা!

আবার! এ কণ্ঠটি সাবরিনা চেনে। এ পৃথিবীর মানুষের কণ্ঠ যাকে সে পেছনে ফেলে এসেছে। পরিচিত গলা, কণ্ঠে তীব্র যাতনা আর ভালোবাসা। সাবরিনা মনে করার চেষ্টা করল কণ্ঠটি কার। নিজের গতি মন্থর করার ইচ্ছে জাগল তার। কিন্তু চৌম্বকীয় শক্তিটি তাকে আলোর বৃত্তের দিকে দ্বিগুণ গতিতে টেনে নিয়ে চলল। তবে সাবরিনা এ গতির বিরুদ্ধে এবার লড়াই শুরু করে দিল।

সাবরিনা!

কণ্ঠটি এখন প্রায় চিনতে পারছে সাবরিনা। আবার গলার স্বরটি শুনতে চায় ও।

এমন সময় গুহার শেষ প্রান্তের মূর্তিটি হাত তুলে ওকে ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগল। নতুন একটা কণ্ঠ শুনতে পেল সে। কর্তৃত্বপরায়ণ কণ্ঠ, তাতে আদেশের সুর।

এসো, তোমার সফর শেষ করো। ফিরে যাবার কোনো রাস্তা নেই।

ভয়ানক গতির একটা শক্তি সাবরিনাকে গুহার শেষ প্রান্তে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। শক্তিটা কী যে জোরে টানছে ওকে! যেন প্রকাণ্ড একটা ভ্যাকুম ক্লিনার ওকে টেনে নিয়ে যাবে আলোটার কাছে। কিন্তু এ মুহূর্তে ওই লোকটার কাছে যাওয়ার আর তাগিদ অনুভব করছে না সাবরিনা।

চৌম্বকীয় শক্তির বিরুদ্ধে ফাইট করছে সে, নিজের ইচ্ছাশক্তির পুরোটা দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে লড়াই। ধীরে ধীরে তার চলার গতি কমে এল, তারপর থেমে গেল। দেয়ালে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। এখন আর তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ফিসফিসানি নেই। সামনের ওই মূর্তিটির কাছ থেকে ধেয়ে এল শক্তির কতগুলো ঢেউ।

সাবরিনা, ফিরে এসো!

পৃথিবীর মানুষের সেই কণ্ঠ। জীবনের কণ্ঠ। বহু কষ্টে নিজের ভেতরে একটা শক্তি তৈরি করল সাবরিনা ফিরে যাবার জন্য!

গুহার শেষ মাথায় মূর্তিটা এখন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে– দীর্ঘদেহী, শক্তিশালী, প্রবল কর্তৃত্বব্যঞ্জক। তার ভেতরের কোমল ভাবটি সম্পূর্ণ অদৃশ্য। মূর্তিটি কালো এবং বিকটদর্শন। উষ্ণ আলোর বদলে তার শরীর থেকে এখন বিচ্ছুরিত হচ্ছে চোখ ধাঁধানো সাদা আলোর ঝলকানি।

একটু একটু করে নিজের ইচ্ছাশক্তি ফিরে পাচ্ছে সাবরিনা, তার জন্য অপেক্ষমান ভয়ংকর জিনিসটা থেকে ধীরে ধীরে সরে আসছে। দেয়ালে দণ্ডায়মান ছায়াগুলো এখন ক্রোধের প্রতিমূর্তি। তারা মাকড়সার মতো আঙুল বাড়িয়ে দিল, থাবা মারল সাবরিনাকে লক্ষ্য করে। গুহার শেষ প্রান্তের ভয়ংকর চেহারার মূর্তিটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বৃদ্ধি পেতে পেতে এখন পুরো গুহামুখটাই ঢেকে ফেলেছে। সাবরিনার মস্তিষ্কে

বজ্রপাতের মতো আছড়ে পড়ল তার কণ্ঠ।

ফিরে যাবার কোনো রাস্তা নেই! তুমি এখন আমাদের একজন!

শব্দহীন চিৎকার দিল সাবরিনা।

না! আমি এখানে থাকতে চাই না! এখনই এখানে থাকার সময় আমার হয়নি।

সাবরিনা!

আবার সেই চেনা কণ্ঠটি ওকে পেছন থেকে ডাকল। জীবনের কণ্ঠ। অদেখা ভুবনে ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যে ভয়ংকর শক্তিটি চেষ্টা করছিল, এ কণ্ঠটি সেই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি যোগাল সাবরিনাকে।

গুহার দু'পাশে সার বেঁধে দাঁড়ানো লোকগুলোর সম্মিলিত ক্রোধ যেন শারীরিক আঘাত হানছিল সাবরিনাকে। ও প্রাণপণে লড়াই করে যাচ্ছিল। ওর ইচ্ছাশক্তি ক্রমে বেড়ে চলছিল। সে প্রচণ্ড গতিতে ফিরে চলল। যে গতিতে এখানে এসেছিল তারচেয়েও ভীষণ গতিতে। ফিরে চলল জীবনের কাছে।

সেই ভয়ংকর কণ্ঠটি আবার বজ্রপাতের মতো বিস্ফোরিত হলো।

তুমি এখন ফিরে যেতে পারবে না! তুমি অনেকদূরে এসে পড়েছ। তুমি কখনোই ফিরতে পারবে না!

পারব! মনে মনে চিৎকার করল সাবরিনা। *আমি পারব! আমি বেঁচে উঠব।*

বালুঝড়ের মতো কণ্ঠটি গর্জে উঠল, ওর শরীর যেন ভেদ করে গেল।

আমরা তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে আসব। আমরা তোমাকে এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবই!

না! তোমরা কখনোই তা পারবে না।

প্রতিধ্বনি তোলা গুহার দেয়ালে শেষবারের মতো বজ্রনির্ঘোষে ঘোষিত হলো ভয়ংকর কণ্ঠটি।

তুমি প্রথমবার হয়তো জিতে যাবে, দ্বিতীয়বার হয়তো ফাঁকি দিতে পারবে, খুব জোর তৃতীয়বারেও বেঁচে যাবে কিন্তু চতুর্থবার– কক্ষনো না। ইভ অব সেন্ট জন এর সময় তুমি ফিরে আসবেই।

অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল গুহা, সে সঙ্গে দেয়াল এবং মানুষজন, উধাও হলো দূরের সেই আলোক রেখা আর সেই ভীতিকর কণ্ঠটিও।

প্রথমে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার তারপর বিন্দুর মতো একটি আলো দেখা গেল, সেটি অত্যন্ত দ্রুত চোখ ধাঁধানো সাদায় পরিণত হয়ে ওর পুরো মাথাটাকে যেন পূর্ণ করে ফেলল। কথা বলার চেষ্টা করল সাবরিনা, কিন্তু গলা দিয়ে শুধু কাশির আওয়াজ বেরিয়ে এল। তার বুকটা উঁচু হলো। বুকে ব্যথা অনুভব করল ও।

সাবরিনা এখন আর মৃত নয়, জীবিত!

চার

কেউ একজন বন্ধ করে দিল রেকর্ড প্লেয়ার। থেমে গেল কান ফাটানো ডিসকো সাউন্ড। তরুণরা সবাই জড়ো হয়েছে সুইমিং পুলের ধারে সাবরিনার পাশে। রঙিন বাতিগুলো এখনও আলোর ফুলঝুড়ি ছড়াচ্ছে অ্যাপার্টমেন্ট রিক্রিয়েশন ডেকে।

অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা একটি মেয়ে সাবরিনার মাথা কোলে তুলে নিল। মাথাটা যাতে ডানে বামে হেলে না যায় সেজন্য হাত দিয়ে ধরে থাকল। রবার্ট সাবরিনার পাশে হাঁটু মুড়ে বসেছে। একটু পরপর সে সামনে ঝুঁকে সাবরিনার মুখে মুখ লাগিয়ে ওর ফুসফুসে বাতাস ঢোকানোর চেষ্টা করছে। সাবরিনার চেহারা বিবর্ণ এবং শীতল, নিজে নিজে যে নিঃশ্বাস নিতে পারবে তার কোনো আলামতই দেখা যাচ্ছে না।

সাবরিনা, ফিরে এসো! মনে মনে চিৎকার দিল রবার্ট। সে ওর মুখে মুখ ঠেকাচ্ছে, বাতাস ভরে দিচ্ছে, মুখ তুলছে, এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুনছে তারপর আবার ঝুঁকে মুখে মুখ রেখে ফুসফুসে অবিরাম ঢোকানোর চেষ্টা করছে। যতক্ষণ শরীরে কুলোবে করে যাবে রবার্ট। সে আশপাশের কোনো শব্দ শুনছে না, কাউকে দেখছে না। তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে এখন শুধু সাবরিনা।

রবার্ট ডান জানেও না কখন সাবরিনা তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। সে সাবরিনা ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না। শয়নে স্বপনে জাগরনে শুধু সাবরিনা আর সাবরিনা। ওকে ও কিছুতেই হারাতে পারবে না। এটা সে কোনোভাবেই ঘটতে দেবে না।

রবার্ট সাবরিনাকে বাঁচিয়ে তোলার প্রাণান্ত চেষ্টা করছে, ওকে ঘিরে লোকজন উত্তেজিত স্বরে নানান কথা বলছিল, পরামর্শ দিচ্ছিল।

'কেউ কি অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিয়েছে?'

'প্যারামেডিকরা আসছে।'

'কী জানি ওরা কী করবে।'

'এখানে কোনো ডাক্তার নেই?'

'অ্যাপার্টমেন্টে একজন আছেন তো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাঙালি একজন ডাক্তার। অশোক চৌধুরী।'

'কত নম্বর ইউনিটে থাকেন তিনি?'

'১২ নম্বার। টেনিস কোর্টের পাশেই।'

'চলোতো দেখি। ওনাকে পাওয়া যায় কিনা?'

অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের দূরপ্রান্তে, সুইমিং পুল এবং পার্টি ডেক থেকে খানিকটা দূরে, ডা. অশোক চৌধুরী শুনলেন হঠাৎ করেই ডিসকো মিউজিকের গমগমে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি পাতলা একটি সোনার ঘড়ি বের করে সময় দেখলেন। মাত্র দশটা বেজে দশ। স্কাই হাইয়ের পার্টিতো এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ার কথা নয়!

হয়তো কোনো অ্যামপ্লিফয়ারের তারটার ছিঁড়ে গেছে, আশান্বিত হয়ে ভাবলেন ডা. অশোক। কারণ যা-ই হোক, যতক্ষণ না আবার মিউজিক বাজছে ততক্ষণ অন্তত: নীরবতাটুকু উপভোগ করতে পারবেন তিনি।

ডা. অশোক চৌধুরীর বয়স পঞ্চান্ন। স্কাই হাই কমপ্লেক্সের সিনিয়র বাসিন্দাদের একজন। তাঁর জন্ম বাংলাদেশে। ঢাকা মেডিকেল থেকে পাস করে ডাক্তার হিসেবে কিছুদিন প্রাকটিস করার পরে উচ্চ শিক্ষার্থে আমেরিকা এসেছিলেন কুড়ি বছর আগে। দেশে তাঁর বিধবা মা ছাড়া কেউ ছিল না। মা'র টানেই মাঝে মাঝে দেশে যেতেন। নিজের ভিটে ত্যাগ করতে রাজি হননি বলে মাকে কোনোদিনই আমেরিকায় নিয়ে আসা হয়নি ডা. চৌধুরীর। তাঁর মা মারা গেছেন বছর দশেক আগে। দেশের জমি বাড়ি বিক্রি করে আমেরিকায় প্রত্যাবর্তনের পরে আর জন্মভূমিতে ফেরা হয়নি। কোনোদিন ফিরবেন বলেও মনে হয় না। কারণ বাংলাদেশে তার আপন আত্মীয় বলতে কেউ-ই নেই। এক বিদেশীনিকে বিয়ে করেছিলেন ডা. অশোক। থাকতেন এলসিনো শহরে, বিশাল এক বাংলো নিয়ে। কিন্তু বউয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরে বাংলোটা হারাতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর দুই বাচ্চাই তাদের মায়ের সঙ্গে থাকে। প্রিয় কুকুর বাঘাকেও নিজের কাছে রাখার অনুমতি পাননি আইনী আদেশে। বাংলো বাড়িটি ছেড়েছেন শুধু নিজের ভিডব্লিউ র‍্যাবিট গাড়ি আর কিছু রেকর্ড কালেকশন নিয়ে। উঠে এসেছেন স্কাই হাইতে। এ অ্যাপার্টমেন্টে মাঝে মাঝেই হুল্লোড় করে পার্টির আয়োজন করে তরুণ বাসিন্দারা। তিনি বুড়ো বলেই সেখানে দাওয়াত পান না।

ঈশ্বর, তিনি কি সত্যি বুড়ো হয়ে গেছেন? এই পঞ্চান্ন বছর বয়সেই? বুড়ো দূরে থাক নিজেকে মধ্যবয়স্ক ভাবতেই ঘোর আপত্তি ডা. অশোকের। এইতো সেদিন একটি বার-এ দারুণ চা-চা নৃত্য দেখালেন। সবার কান ফাটানো হাততালিও পেয়েছিলেন। আহা, সেসব দিনগুলি কই?

ডা. অশোক চৌধুরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন থেকে এসব মন খারাপের চিন্তা

জোর করে দূরে ঠেলে দিলেন। মেঝের র‍্যাক থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটি রেকর্ড বের করে প্লেয়ারে চালিয়ে দিলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনলে তাঁর মন ভালো হয়ে যায়। রেকর্ড প্লেয়ারে দরদ দিয়ে গাইতে লাগলেন মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে।' ডা. চৌধুরীর খুব প্রিয় গান এটি।

ডা. অশোক চৌধুরী দিনের বেলায় ব্রকস ব্রাদার্সের সুট পরেন এবং পছন্দ করেন ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক। এ দুটো জিনিসই লোকাল লাইফ স্টাইলের সঙ্গে যায় না। তবে লাইফ স্টাইলের জন্য স্কাই হাইর এক শয্যাবিশিষ্ট, আসবাব সজ্জিত অ্যাপার্টমেন্টে আসেননি ডা. অশোক। তিনি এ অ্যাপার্টমেন্টটি ভাড়া নিয়েছেন কারণ এখান থেকে তাঁর সান্তা মোনিকায় অফিস খুব একটা দূরে নয় এবং সপ্তাহে যে দুটো দিন তিনি ওয়েস্ট লস এঞ্জেলেস হাসপাতালে সময় দেন, সেখানকার যাতায়াত ব্যবস্থাও এখান থেকে বেশ সুবিধাজনক। ডাক্তারের উকিল গত মাসেই এ বাড়িটি তার জন্য ভাড়া করেছিল। আর গেল মাসেই স্ত্রী ক্যারোলিনের সঙ্গে ডাক্তারের ডিভোর্সের মামলা হয়ে গেল।

ডা. চৌধুরী নরম প্লাস্টিকের সোফায় গা ঠেকালেন, পা তুলে দিলেন ফরমিকা কফি টেবিলের ওপর। চোখ বুজে উপভোগ করছেন মানবেন্দ্র'র ভরাট কণ্ঠ। অধৈর্য ভঙ্গিতে কে যেন টেনিস কোর্টের স্লাইডিং গ্লাস ডোরে টোকা মারছে। আজ রাতে টেনিস কোর্ট খালি কারণ সবাই গেছে সুইমিং পুলের পার্টিতে। টেবিল থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পা নামালেন ডা. অশোক। কারণ টোকা মারার শব্দটি বিরতিহীন চলছে।

বাইরে থেকে একটি কণ্ঠ হাঁক ছাড়ল, 'ডা. চৌধুরী, বাড়ি আছেন? একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।'

হা, ঈশ্বর, ভাবলেন ডাক্তার, নিশ্চয় আরেকটি OD নয়। গত সপ্তাহের পার্টিতে জনৈক মাদকাসক্ত অতিথি হেরোইন খেয়ে হঠাৎ উন্মাদ হয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু করছিল। তাকে থামায় কার সাধ্য। শেষে তিনজন বলবান লোক তাকে ঠেসে ধরলে ডা. অশোক ওই ছেলেকে ট্রাংকুলাইজার দিয়ে আপাতত: শান্ত করেন। সবশেষ খবর শুনেছেন ছেলেটিকে একটি প্রাইভেট স্যানিটারিয়ামে ভর্তি করা হয়েছে। এখনও সে দেয়ালে মাথা ঠোকে। তবে এবারের পার্টিতে মদ, গাঁজা আর কোক ছাড়া অন্য কিছু পরিবেশন করা হচ্ছে না বলে তিনি শুনেছেন।

ডা. চৌধুরী গ্লাস ডোর খুললেন। বাইরে দুই তরুণ তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখ মুখ শক্ত এবং উদ্বিগ্ন।

'একটি মেয়ে, ডক্টর,' বলল তরুণ। 'সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে নেমেছিল। পানিতে ডুবে গিয়েছিল।

'ওর জন্য কী করা হয়েছে?'

'ওর বয়ফ্রেন্ড ওকে মাউথ-টু-মাউথ শ্বাস প্রশ্বাস চালচ্ছে।'

'ঠিক আছে। চলো যাই।' ডাক্তার টেবিলের ওপরে রাখা তাঁর কমপ্যাক্ট ইমার্জেন্সি কেসটি তুলে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। পেছনে আবছা হয়ে এল মানবেন্দ্রর সুরেলা কণ্ঠ।

প্রায় ছুটেই ওদের সঙ্গে উঠোন ঘুরে সুইমিং পুলের ধারে চলে এলেন ডাক্তার। পুলের পেছনে ঘাস জমিন ঘিরে মানুষের ভিড়।

'এই যে ডাক্তার সাহেব এসে গেছেন,' বলল তরুণ। 'দেখি সবাই সরো। ওনাকে আসতে দাও।'

ভিড়টা দু'ভাগ হয়ে গেল। ডা. চৌধুরী ফাঁকটার মাঝে ঢুকে পড়লেন। দেখলেন মাটিতে শুয়ে আছে একটি মেয়ে। আরেকটি মেয়ে তার মাথা কোলে নিয়ে বসে রয়েছে। আর এক তরুণ, তাকে দেখেই চিনলেন ডাক্তার, রবার্ট ডান, সে অচেতন মেয়েটির মুখে মুখ রেখে অক্সিজেন দিচ্ছে। ডাক্তারকে ভিড় ঠেলে আসতে দেখে সে বিহ্বল দৃষ্টিতে মুখ তুলে চাইল।

'চালিয়ে যাও,' বললেন অশোক। রবার্ট তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগল।

ডাক্তার মেয়েটির বরফ শীতল কব্জি হাতে নিয়ে পালস পরীক্ষা করলেন। কোনো সাড়া নেই। চোখের একটি পাতা উল্টে দেখলেন। নিস্প্রভ চোখের তারা। প্রাণের কোনো চিহ্নই নেই। মেয়েটির গায়ের চামড়া অস্বাভাবিক সাদা হয়ে আছে। ডাক্তার ভয় পেলেন ভেবে তিনি দেরী করে ফেলেছেন।

তিনি ঝট করে খুলে ফেললেন ইমার্জেন্সি কেস। একটা ডায়াল থেকে ওষুধ ভরলেন হাইপারডামিক সিরিঞ্জে। মাঝে মাঝে হার্ট থামলে সরাসরি ম্যাসিভ শট দিলে আবার সচল হয়ে ওঠে হৃৎপিণ্ড। তবে মেয়েটির চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না ইনজেকশনে কোনো কাজ হবে। কিন্তু তিনি একজন ডাক্তার এবং লোকে আশা করে তিনি কিছু করতে পারবেন।

কেশে উঠল মেয়েটি।

হাতে হাইপারডামিক সিরিঞ্জ নিয়ে মেয়েটির দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার।

রবার্ট ডান মেয়েটির মুখ থেকে সরিয়ে নিল মুখ, থুথু করে পানি আর কফ ফেলল। মেয়েটি তার মাথা এপাশ-ওপাশ করতে লাগল সে সঙ্গে কাশছে বেদম। তার ফুসফুস থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসতে লাগল সুইমিং পুলের পানি। যে মেয়েটি ওর মাথা কোলে নিয়ে বসেছিল সে এবারে কেঁদে ফেলল।

রবার্ট ডান দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকল। 'সাবরিনা,' ডুকরে উঠল সে। 'ওহ্, সাবরিনা।'

সম্বিত ফিরে পেলেন ডা. চৌধুরী। 'ওকে ভেতরে নিয়ে যাও,' বললেন তিনি। 'শরীর গরম রাখতে কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে রাখবে।'

'আমার বাসায় নিয়ে যাই?' বলল রবার্ট। 'আমার বাসা ওইতো সামনে।'

তিন যুবক হাত দিয়ে একটা দোলনা বানাল, তার ওপর শুইয়ে দেয়া হলো সাবরিনাকে। ওরা ওকে ধরাধরি করে নিয়ে চলল রবার্টের অ্যাপার্টমেন্টে। ডা. অশোক তাঁর ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে ওদের পিছু নিলেন মন্থর গতিতে। তাঁর মস্তিষ্ক ঝড়ের গতিতে চলছে। একটু আগের ঘটে যাওয়া ঘটনাটির চিকিৎসাশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করছেন তিনি।

পাঁচ

শব্দের খণ্ডাংশগুলো জোড়া লেগে পরিণত হলো কণ্ঠে। এবারে মানুষের সত্যিকারের গলা শুনতে পাচ্ছে সাবরিনা, অন্য ভুবনে মস্তিষ্কের মধ্যে শোনা বার্তার মতো নয়। ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারল কী বলা হচ্ছে।

রবার্ট   ও ঠিক হয়ে যাবে তো?

একজন বয়সী লোক   ও আশ্চর্যরকম দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে। ওর পালস দুর্বল তবে ঠিকঠাক আছে আর শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

পিটার লানডাউ   আপনার কি মনে হয় ওর কোনো... ব্রেন ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

বাহ্, কী সুন্দর একটি কথা বললে তুমি, পিটার! থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ, মনে মনে বলল সাবরিনা।

বয়সী লোকটা : তা বলা মুশকিল। এটা নির্ভর করবে ওর মস্তিষ্ক কতক্ষণ বাতাস সরবরাহ থেকে বঞ্চিত ছিল।

রবার্ট   দুই তিন মিনিটের বেশি নয়।

বয়সী লোকটি : তাহলে আশা করি ব্রেন ড্যামেজ হবে না। পাঁচ মিনিট অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ থাকলে আমরা সেটাকে ক্রিটিকাল পিরিয়ড বলে গণ্য করি।

চোখ মেলে চাইল সাবরিনা। সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পেল। ও শুয়ে আছে একটি সোফায়, রবার্টের বাসার সোফায় যেখানে বসে ও আর রবার্ট বহুবার একসঙ্গে টিভি দেখেছে, পান করেছে মদ এবং কখনও কখনও মিলনের আহ্বানে সাড়াও দিয়েছে।

কতগুলো মুখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। প্রথমে রবার্টকে দেখতে পেল সাবরিনা। ওর হালকা চুলগুলো ঝুলে আছে ভুরুর ওপর, চাউনিতে প্রবল স্বস্তি। তার পাশে পিটার লানডাউ। ওকে কৌতূহল নিয়ে দেখছে। সোফার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন পেশাদার চেহারার, ধূসর চুল এবং শ্যামলা ত্বকের একজন সুদর্শন পৌঢ়। রবার্টকে ছুঁতে চাইল সাবরিনা কিন্তু হাত দুটো কম্বলের নিচে বন্ধ বলে বের করতে পারল না।

'কেমন লাগছে এখন?' জানতে চাইলেন ধূসর চুলের ভদ্রলোকটি।

'ভালো। কে আপনি?'

'আমার নাম অশোক চৌধুরী। আমি একজন ডাক্তার।'

'হাই, ডক্টর। আমার মাথাটা খুব ব্যথা করছে।'

'ব্যথা করতেই পারে,' ডাক্তার চামড়ার একটি ব্যাগ খুলে রূপোলি রঙের একটি পেন লাইট বের করলেন। আলো ফেললেন সাবরিনার চোখের তারায়। প্রথমে এক চোখে, তারপর অন্যটিতে। মাথা ঝাঁকালেন তিনি সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে।

'ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

সাবরিনার কপালে হাত রাখলেন ডাক্তার। তাঁর হাতটি শুকনো এবং শক্ত, সাবানের হালকা গন্ধ আসছে।

'দরকার নেই,' জবাব দিলেন তিনি। 'ওর শরীরটা আজ গরম রাখার চেষ্টা করো, কাল ওর নিজের ডাক্তারকে দিয়ে একটা থরো চেকআপ করিয়ে নিও।'

'আমি তো আছিই,' বলল সাবরিনা। 'যা বলার আমাকে বলুন না।'

'আয়াম সরি,' হাসলেন অশোক। 'কথাটা আবার বলব?'

'না, দরকার নেই।'

'প্যারামেডিকরা এসে পড়েছে,' ঘরের ওধার থেকে ঘোষণা করল একজন।

'আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি,' বলল রবার্ট। সাবরিনার হাতে মৃদু একটা চাপ দিয়ে দরজায় পা বাড়াল সে। ঘাড় ঘোরাল সাবরিনা। খাটো চুলের, নীল ইউনিফর্ম পরা দু'জন তরুণের সঙ্গে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে রবার্ট। সে কাউচে শোয়া সাবরিনাকে হাত ইশারায় দেখাল। তরুণ দুটির দিকে তাকিয়ে হাসল সাবরিনা। ওকে সুস্থ দেখে সবাই যেন খুশি হয়েছে এবং স্বস্তি পেয়েছে।

'ডক্টর অশোক,' বলল সাবরিনা।

'বলো?'

'আমার নিজের কোনো ডাক্তার নেই। চেক আপের জন্য আমি কি আপনার কাছে যেতে পারি?'

'নিশ্চয়,' ডাক্তার ওয়ালেট খুলে একটি কার্ড বের করলেন।

'আসার আগে আমার অফিসে একটি ফোন কোরো। আমি আমার সেক্রেটারিকে তোমার কথা বলে রাখব। সকালে ফোন দিও। কাল বিকেলে ওয়েস্ট এল-এর ইমার্জেন্সিতে আমার ডিউটি আছে।'

কার্ডখানা হাতে নিল সাবরিনা। 'আমি সকালেই ফোন করব।'

ঘর ভর্তি লোকজন বেরিয়ে যেতে শুরু করল। তারা এখন মামুলি আলাপচারিতায় ফিরে গেছে।

'বিয়ার টিয়ার আছে এখনও?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'এক টাব ভর্তি বিয়ার আছে,' জবাব দিল আরেকজন। 'এখনও স্পর্শ করেনি

কেউ।'

'ওয়েল, লেটস গো। আবার চালিয়ে দাও মিউজিক। রাত খুব বেশি হয়নি।'

অনেকেই রবার্টের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় মৃদু হাসল সাবরিনার দিকে তাকিয়ে, শীঘ্রি খালি হয়ে গেল ঘর। শুধু তিনজন রইল ওরা।

ডাক্তার অশোক চৌধুরী সাবরিনাকে বড়ি ভর্তি প্লাস্টিকের ছোট একটা শিশি দিলেন। 'এটা মাইল্ড সিডেটিভ। রাতে ঘুম না এলে দুটো বড়ি গিলে নিও। আর শরীর ঢেকেঢুকে রেখো যাতে ঠাণ্ডা না লাগে। এবং দুশ্চিন্তা কোরো না।'

'আচ্ছা,' বলল সাবরিনা।

'বেশ। কাল দেখা হবে, কেমন?'

ডাক্তারকে দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিল রবার্ট। তিনি চলে গেলে সে জানালার পর্দাগুলো ফেলে দিল। ফিরে এল সোফায়। কুশনের কিনারায় বসে ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে রইল সাবরিনার দিকে। কম্বলের নিচে থেকে একটা হাত বের করল সাবরিনা। রবার্টের হাত ধরল। রবার্ট ওর হাতটি মুঠো করে ধরল। চাপ দিয়ে ওকে যেন আশ্বস্ত করতে চাইল।

'বেবী, বেবী,' বলল রবার্ট, 'কিছুক্ষণের জন্য ভেবেছিলাম তোমাকে বুঝি সত্যি হারিয়ে ফেলেছি।'

'সত্যি তুমি আমাকে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে ফেলেছিলে,' ওকে বলল সাবরিনা।

'তুমি কিছু খাবে? এক গ্লাস ওয়াইন দিই? কিংবা কফি অথবা সুপ?'

'গরম সুপ দিতে পারো। তবে বেশি ঘন কোরো না।'

'আচ্ছা, আমি নিয়ে আসছি।'

রান্নাঘরে গেল রবার্ট। বালিশগুলো ঠিকঠাক করে মাথাটা এলিয়ে দিল সাবরিনা। চোখ বুজল। নাকের ফুটো দিয়ে বের করে দিল পরিষ্কার, শুকনো বাতাস। ওর বুক অল্প অল্প ব্যথা করছে, এখনও সামান্য মাথা ধরা আছে, তবে সিরিয়াস কিছু নয়।

যা ঘটেছে তা নিয়ে আবার ভাবছিল সাবরিনা। ও ডুবে যাচ্ছিল, তারপর শরীরটা পানির ওপর ভেসে উঠেছিল, ওর শৈশব থেকে তারুণ্যের দিনগুলোর ছবি ভেসে উঠছিল মনের মুকুরে, তারপর চৌম্বকীয় একটা শক্তি ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর সেই টানেল, দেয়ালের গায়ে ছায়ামূর্তি, গুহার শেষ মাথায় সাদা আলোর তীব্র ছটা, সেই মূর্তিটা- কী জানি ওটা কে বা কী ছিল– আলোর বৃত্তের মাঝখানে বসে ছিল। প্রথম দিকে কেমন শান্তি শান্তি লাগছিল সবকিছু, ও বসে থাকা মূর্তির কাছে চলে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অনুভব করছিল। মনে হচ্ছিল বাতাসে ভেসে চলেছে সে টানেলের মধ্যে, হঠাৎ একটি কণ্ঠ তাকে পিছু ডাকতে শুরু করে। সাবরিনা

এখন জানে ওটা ছিল রবার্টের কণ্ঠ। রবার্টের গলা শুনে সে ইতস্তত করছিল এগিয়ে **যেতে**। তারপর সবকিছু কেমন বদলে যায়। আলোর শরীরটা হঠাৎ বিকট রূপ ধারণ **করে**, দেয়ালে দাঁড়ানো ছায়া ছায়া লোকগুলো ওকে ফিরে আসতে মানা করছিল। **কিন্তু** সাবরিনা ফিরে এসেছিল।

সাবরিনা জানে তার জীবনে বিশেষ কিছু একটা ঘটে গেছে। ও কোনো স্বপ্ন দেখেনি। যা ঘটেছে সব দিব্যি তাজা রয়ে গেছে স্মৃতিতে। যদিও ওর যুক্তিবাদী মন এসব মেনে নিতে আপত্তি জানাচ্ছে কিন্তু ওর হৃদয় জানে কি ঘটেছিল। মারা গিয়েছিল সাবরিনা। কিছুক্ষণের জন্য দেহে ওর প্রাণ ছিল না, তারপর সে আবার ফিরে এসেছে পৃথিবীতে। অদ্ভুত স্বস্তি বোধ করছে সাবরিনা। যেন পাহাড়ের খাদ থেকে পা পিছলে পড়তে যাচ্ছিল একদম শেষ মুহূর্তে ওকে টেনে তোলা হয়েছে। সাক্ষাৎ যমের দুয়ার থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে সাবরিনা। ওর তো খুশিতে ধেই ধেই করে নাচা উচিত। কিন্তু ওর সুখের নদীতে একটা ছায়া পড়েছে। গুহার সেই ভৌতিক কণ্ঠটা এখনও বাজছে কর্ণকুহরে।

তুমি প্রথমবার হয়তো জিতে যাবে, দ্বিতীয়বার হয়তো ফাঁকি দিতে পারবে, খুব জোর তৃতীয়বারও রক্ষা পাবে হয়তো কিন্তু চতুর্থবার– কখনোই না। ইভ অব সেন্ট জনের সময় তোমাকে ফিরে আসতেই হবে।

এ কথার মানে কী? কথাগুলো মনে পড়তেই গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল সাবরিনার।

কিচেন থেকে ফিরল রবার্ট। 'কিছু বলছিলে?'

'না। এমনি চিন্তা করছিলাম।'

'চিকেন গাম্বো (মুরগির সঙ্গে সবজির ঘন ঝোল) চড়িয়ে দিয়েছি প্যানে। চলবে?'

'খুব চলবে। রবার্ট?'

'কী, বেবী?'

'ইভ অব সেন্ট জন কী?'

'জানি না। কোনো নাটকের নাম?'

'না। সে তো দ্য ইভ অব সেন্ট মার্ক।'

'তাহলে আমি বলতে পারলাম না। ব্যাপারটা জানা কি খুব জরুরি?'

'বোধহয়। আমার কাছে এসে একটু বোসো।'

সোফার ধারে এসে বসল রবার্ট। সাবরিনার কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে চুম্বন করল।

'তুমি জানো, তুমি আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছ, রবার্ট।'

দরাজ গলায় হেসে উঠল রবার্ট। 'কী যে বলো না তুমি! আমি তো শুধু তোমার মুখে মুখ ঠেকিয়ে তোমাকে বাতাস দিচ্ছিলাম। আর তখন কী করছিলাম নিজেও

জানতাম না। ভাগ্যিস, কোনো দাড়িঅলা কাজটা করার সুযোগ পায়নি।'

তবে সাবরিনা হাসল না। 'তুমি আমায় ডেকেছিলে।'

'তোমাকে ডেকেছিলাম?'

'রবার্ট, আমরা পরস্পরকে খুব ভালোভাবে চিনি তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা কখনও আ্যালোচনা করিনি।'

'যেমন?'

'যেমন মৃত্যু।'

অস্বস্তির ছায়া পড়ল রবার্টের চেহারায়। 'মৃত্যু কোনো ঠাট্টা-ইয়ার্কির বিষয় না যে এ নিয়ে আমরা মজা করব।'

'আমরা তো সবসময় মজা করতে পারি না।'

'তাতো বটেই। তো মৃত্যু নিয়ে তুমি কী বলতে চাও শুনি?'

'মৃত্যুর পরে কী ঘটে?'

'কী ঘটে? আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা এসে তোমার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ফেলে তোমাকে নিয়ে ভালো ভালো কথা বলে। তারপর তোমাকে কবর দেয়।'

'আমি লাশের কথা বলিনি,' বলল সাবরিনা। 'আমি বলছি মৃত্যুর পরে তোমার আত্মার কী ঘটে?'

'গড, সাবরিনা, আমি তা কী করে বলব? আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং নাস্তিক। তুমি কি সত্যি এখন এ বিষয়টি নিয়ে দার্শনিক আলোচনা করতে চাইছ?'

'বিষয়টি আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'ঠিক আছে। আচ্ছা, এক মিনিট দাঁড়াও। সুপটা বোধহয় হয়ে এসেছে। তুমি এইফাঁকে ভেজা সুইম স্যুটটা ছেড়ে ফেলো। আমি তোমার জন্য একটা রোব নিয়ে আসি।'

সোফায় উঠে বসল সাবরিনা। গা থেকে ফেলে দিল কম্বল।

'আমি নিজেই নিতে পারব। আমি জানি কোথায় আছে ওটা।'

'হাঁটতে পারবে?'

'খুব পারব। তুমি যাও। সুপ হলো কিনা দেখো গে।'

বাথরুমে ঢুকল সাবরিনা। নীল রঙের ওয়ানপিস সুইম স্যুটটা খুলে ফেলল। কেউ এটাকে নিয়ে প্রশংসা করার সুযোগ পায়নি। শাওয়ার হেডের মাথায় ঝুলিয়ে রাখল ওটা। রবার্টের বিশাল, তুলোর মতো নরম তোয়ালে দিয়ে গা মুছল। তারপর বাথরুমের দরজার পেছনে রাখা পশমি পেন্ডলটন রোবটা গায়ে চড়াল। লিভিংরুমে ফিরে এসে দেখে কফি টেবিলের ওপর গরম সুপ নিয়ে অপেক্ষা করছে রবার্ট, পাশেই

একটা প্লেট ভর্তি বিস্কিট।

চিকেন গাম্বোর স্বাদটা দারুণ লাগল সাবরিনার। ওর সুপ খাওয়া শেষ হলে দু'জনের জন্য দুটো গ্লাসে ব্রান্ডি ভরে নিল রবার্ট। তারপর সোফায় বসল গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। বাইরে থেকে পার্টির হৈহুল্লোড় আর হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। শরীরটা বেশ উষ্ণ লাগছে সাবরিনার। সে আর মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলল না।

রবার্ট চুম্বন করল ওকে। একটা হাত ঢুকে গেল সাবরিনার রোবের ভেতর, আলতো করে চাপ দিল ভরাট বুকে। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল সাবরিনা। অবশেষে যখন ওদের চুম্বন পর্ব শেষ হলো একটু অবাক হয়েই ওর দিকে তাকাল রবার্ট।

'যে মহিলাটি ঘণ্টা কয়েক আগে পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছিল সে এখন দিব্যি চুমু খাচ্ছে। এরপরের ঘটনাগুলো ঘটানোর জন্য তুমি কি প্রস্তুত?'

'আমাকে বিছানায় নিয়ে যাও। তারপর দ্যাখো আমি প্রস্তুত কিনা,' বলল সাবরিনা।

রবার্ট ওকে কোলে তুলে নিল। চলল শয়নকক্ষে।

ওরা বিছানায় শুয়ে প্রেম করল। যেন নতুন করে রবার্টের শরীর আবিষ্কার করছে সে উন্মাদনা নিয়ে মিলিত হলো সাবরিনা। যেন এটা ওর প্রথম প্রেম।

রবার্ট যখন ওর ভেতরে প্রবেশ করল, অসম্ভব সুখ পেল সাবরিনা। চাইল এ সুখের যেন অবসান না ঘটে। যখন চরম সময় এল, একের পর এক নরম বিস্ফোরণ ঘটতে লাগল সাবরিনার দেহে, ওর সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে এল, তীব্র সুখের আবেশে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো ওর। রবার্টকে ওই মুহূর্তে ওর এত আপন মনে হলো ইচ্ছে করল মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পূর্ব মুহূর্তের অলৌকিক ঘটনাগুলো খুলে বলে ওকে। কিন্তু সুখের মিলনটি ওকে দারুণ ক্লান্ত করে তুলেছিল, ঘুম এসে গিয়েছিল চোখে। ভাবল কাল সকালে এসব নিয়ে কথা বলা যাবে।

চোখ মুদে এল সাবরিনার এবং গভীর ঘুমের রাজ্যে ডুবে গেল সে সঙ্গে সঙ্গে।

ছয়

কাঁটায় কাঁটায় সকাল সোয়া সাতটায় ঘুম থেকে জেগে গেল সাবরিনা। এমনিতেও তার এ সময়েই ঘুম ভাঙে। কাজে যায় সে। এক মুহূর্ত সময় লাগল বুঝে নিতে কোথায় আছে সে– স্কাই হাইতে রবার্ট ডানের কিংসাইজ বেডে শুয়ে আছে ও। আরাম করে আড়মোড়া ভাঙল সাবরিনা, মুখটা গুঁজে দিল রবার্টের মাথার বালিশে। রবার্টের গা থেকে ইংলিশ লেদার সেন্টের গন্ধ আসছে। গন্ধটা নাক দিয়ে টানল ও।

একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হলো সাবরিনা। ভোরের বাতাসে মম করছে ভাজা বেকন আর কফির জিভে জল আসা গন্ধ। কিচেনে হাড়ি পাতিলের ঠুনঠান মৃদু শব্দ। নাশতা বানাচ্ছে রবার্ট। আবার হাত-পা টানটান করল সাবরিনা অলস ভঙ্গিতে, হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মুখ, অদ্ভুত একটি তৃপ্তিতে ভরে আছে তনুমন। তবে পরমুহূর্তে দপ করে নিভে গেল মুখের হাসি। মনে পড়ে গেছে গত রাতের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা।

বেডরুমের দরজায় উদয় হলো রবার্ট। 'হাই, ঘুম ভাঙল?'

'কী?'

'জিজ্ঞেস করছি ঘুম ভাঙল কিনা।'

'ও হ্যাঁ। নাশতা বানাচ্ছ বুঝি?'

'হুঁ। খিদে পেয়েছে?'

'ছুঁচো ডন মারছে পেটে।'

ঘরে ঢুকল রবার্ট, বসল বিছানায়। সাবরিনা গড়ান দিয়ে ওর কাছে চলে এল। চাদরের ওপর দিয়ে সাবরিনার সুডৌল নিতম্বে আদর করল রবার্ট।

'এখন কেমন বোধ করছ, সোনা?'

'খুব ভালো।' বলল সাবরিনা।

'সত্যি?'

'সত্যি সত্যি সত্যি।'

ওর দিকে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তাকাল রবার্ট। 'তোমার সঙ্গে আজ থাকব আমি?'

'দরকার নেই। তুমি তোমার কাজে যাও। আমি আমার অফিসে ফোন করে আজ ছুটি নিয়ে নেব।'

'বেশ তো। ইচ্ছে করলে সারাদিন বিশ্রাম নিতে পারো।'

'থ্যাংকস। তবে একটু মুক্ত বাতাসে ঘুরে আসব ভাবছি।' একটু ইতস্তত করল ও। 'রবার্ট।'

'বলো?'

'গত রাতের ঘটনাটা নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই।'

'ও নিয়ে আর কী বলার আছে? তুমি সাঁতার কাটতে নেমেছিলে সুইমিংপুলে। তারপর তোমার পায়ে খিঁচ ধরে যায়।'

'না, তারপরের ঘটনা নিয়ে কথা বলব।'

ওর সরাসরি চাউনিটা এড়িয়ে গেল রবার্ট। বলল, 'আমি নাশতা সাজাইগে। তুমি দশ মিনিটের মধ্যে হাত মুখ ধুয়ে এসো?'

মাথা ঝাঁকাল সাবরিনা। ওর গালে চুমু খেয়ে বেডরুম ত্যাগ করল রবার্ট।

খোলা দরজার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল সাবরিনা। সে জানে যে সব বিষয় তত্ত্ব এবং কম্পিউটারের সাহায্যে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা যায় না তা নিয়ে কথা বলতে আগ্রহবোধ করে না রবার্ট। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতার কথা রবার্টকে সাবরিনার বলতেই হবে। পুরো বিষয়টি এমন পরিষ্কারভাবে মনে পড়ছে ওর যেন মাত্র পাঁচ মিনিট আগে ঘটেছে ঘটনা। ওটা স্বপ্ন হতেই পারে না।

দ্রুত গোসল সেরে নিল সাবরিনা, গত রাতে পার্টিতে যে পোশাকগুলো পরেছিল তা-ই আবার পরে নিল। কে যেন ড্রেসগুলো পুলের ধার থেকে কুড়িয়ে এনে দিয়ে গেছে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে রবার্টের সঙ্গে নাশতার টেবিলে যোগ দিল সাবরিনা। ব্রেকফাস্টে স্ক্র্যাম্বলড এগ, বেকন, টোস্টেড মাফিন, কমলার রস আর কফির আয়োজন করেছে রবার্ট। শুধু এ খাবারগুলোই তৈরি করতে জানে সে। তবে খুব যত্ন করে রাঁধে।

রেডিওতে খবর শুনতে শুনতে ওরা চুপচাপ নাশতা খেল।

খাওয়া শেষ হলে দ্বিতীয় কাপ কফি নিল সাবরিনা। ধরাল সিগারেট। ঈষৎ কুঁচকে গেল রবার্টের ভুরু। সে সাবরিনার ধূমপানের অভ্যাস মোটেই পছন্দ করে না। তবে ওকে এ নিয়ে কিছু বলেও নি। তাই সাবরিনা ওর প্রতি কৃতজ্ঞ।

রবার্ট গত রাতের পার্টি নিয়ে কী যেন বলছিল কিন্তু তার কথায় মনোসংযোগ করতে পারছিল না সাবরিনা। রবার্ট একটু বিরতি দিলে সে কথা বলে উঠল।

'গত রাতে,' বলল সাবরিনা, 'সুইমিংপুলে আমার পায়ে খিঁচ ধরার পরে আমি আর পানির ওপর ভেসে উঠতে পারছিলাম না। আক্ষরিক অর্থেই একটা পর্যায়ে শরীরের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। মনে হচ্ছিল আমি আর শরীর দুটো আলাদা জিনিস।'

'আসলে তুমি বলতে চাইছ তোমার মস্তিষ্কের কথা, তাই না?

'না। আমি আমার শরীরের কথা বলছি। তাকিয়ে দেখি পানির নিচে ভাসছে আমার দেহ।'

ঘড়ি দেখল রবার্ট।

'আমি তোমাকে এবং অন্যান্য সবাইকে দেখতে পাচ্ছিলাম। তোমরা কী বলছিলে তা-ও শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছি।'

'অদ্ভুত ব্যাপার,' মন্তব্য করল রবার্ট। 'আরেকটু কফি নেবে?'

'না। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কী বিষয়ে?'

'এ বিষয়টি নিয়ে, ফর ক্রাইস্ট শেক, গতরাতে যা ঘটেছে তা নিয়ে।'

'তুমি বলছ তোমার মনে হচ্ছিল যে তুমি পুলের ওপর, বাতাসে ভেসে আছ?'

'না, মনে হচ্ছিল না, রবার্ট। আমি সত্যি ওখানে ভাসছিলাম।'

'বেশ। বুঝলাম তুমি শূন্যে ভাসছিলে।'

'তবে এরপরে যে ঘটনা ঘটে ওটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি খোঁচাচ্ছে।'

'শোনো, এ বিষয়টি নিয়ে এখন কথা বলার প্রয়োজন নেই। তুমি এখনও খুব আপসেট হয়ে আছ।'

'রবার্ট, আমি এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই। আমি বিষয়টি বুঝতে চাই। আর কথা না বললে তা করতে পারব না।'

ওর ঘাড়ের পেছনে হাত রাখল রবার্ট, ম্যাসেজ করে দিতে দিতে বলল, 'গত রাতে তোমার ওপর দিয়ে মস্ত ধকল গেছে। অনেক উল্টোপাল্টা চিন্তা ঢুকে গেছে তোমার মনে। এমনটা যে কারও ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে।'

'ড্যাম ইট, রবার্ট, আমি কোনো উল্টোপাল্টা কল্পনার কথা বলছি না, যা ঘটেছে তা-ই বলছি।' গভীর দম নিল সাবরিনা, স্বাভাবিক স্বরে কথা বলার চেষ্টা করল। 'আমি সত্যি... অন্য আরেক জায়গায় চলে গিয়েছিলাম।'

'শোনো, এখন তুমি একটু বিশ্রাম নাও। পরে এ নিয়ে কথা বলব কেমন?'

'তুমি আসলে এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাইছ না, তাই না?'

'না, তা নয়। আমার মনে হচ্ছে তুমি তোমার শরীর অন্য ভূবনে ভেসে বেড়াচ্ছিল এ বিষয়টি খুব বেশি সিরিয়াসভাবে নেয়ার চেষ্টা করছ।'

'তুমি আমার কথা শুনতে চাইছ না এ ভয়ে যে এগুলো তোমার ছোট্ট কম্পার্টমেন্টালাইজড দুনিয়ার সঙ্গে ফিট খাবে না, তাই তো?'

'আমি কোনো কিছু শুনতে ভয় পাচ্ছি না,' সাবধানে শব্দ বাছাই করছে রবার্ট। 'আমার কাজে যাওয়ার সময় হলো। তবে তুমি যদি কথা বলতেই চাও, পরেও বলা যাবে।'

'বেশ,' বলল সাবরিনা। কিন্তু তার কাছে বিষয়টি মোটেই 'বেশ' মনে হয়নি।

সিধে হলো রবার্ট, নাশতার বাসন কোসন সিঙ্কে নিয়ে গেল।

'আমি ওগুলো ধুয়ে রাখবখন,' বলল সাবরিনা। 'তুমি অফিসে যাও। আমি বেরুবার সময় দরজায় তালা মেরে যাব।'

'ধন্যবাদ,' আরেকটি রুমে ঢুকল রবার্ট, এক মিনিট পরেই ফিরে এল নেকটাই আর জ্যাকেট পরে।

'আমি তোমাকে পরে ফোন করব।'

'আচ্ছা।'

সাবরিনাকে ছোট্ট চুমু খেয়ে বেরিয়ে পড়ল রবার্ট। সাবরিনা বাসন কোসন ধুয়ে সাজিয়ে রাখল সিঙ্কে। বিছানা গোছগাছ সেরে ফোন করল ওর অফিসে। বলল গতরাতে ও অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তাই আজ অফিস যেতে পারবে না। ওর বস, ডিপার্টমেন্ট স্টোরের অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার সাবরিনার দুর্ঘটনার কথা শুনে সহানুভূতি প্রকাশ করে বলল, 'ঠিক আছে। আজ তুমি রেস্ট নাও। কাল দেখা হবে।'

সাবরিনা ফোন ছেড়ে দিয়ে ভাবতে বসল এখন কী করা যায়। ওর একা একা ভাল লাগছিল না। গত রাতের ভৌতিক অভিজ্ঞতাটি নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলার তীব্র ইচ্ছে জাগছিল মনে। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলা যায়?

ডা. অশোক চৌধুরী। ভদ্রলোক গতকাল ওকে বলেছিলেন সাবরিনা যদি চেকআপ কারতে চায় তাহলে আজ যেন ফোন করে। শারীরিকভাবে ওর কোনো ডাক্তারের প্রয়োজন নেই তবে ডাক্তারকে বললে হয়তো বুঝতে পারবেন সাবরিনার ঘটনাটা। সে ডাক্তারের কার্ড খুঁজে বের করে তাঁর অফিসে ফোন করল। এক মহিলা অপরপ্রান্তে সাড়া দিতে নিজের নামটা বলল সাবরিনা।

'ও, হ্যাঁ, মিস স্টুয়ার্ট, ডাক্তার বলেছিলেন আপনি ফোন করতে পারেন। তিনি সকাল সাড়ে নটায় আপনাকে আসতে বলেছেন। পারবেন কি?'

'জ্বী, পারব।'

ফোন রেখে দিয়ে কার্ডের ঠিকানায় চোখ বুলাল সাবরিনা। ডা. চৌধুরীর অফিস সান্তা মোনিকায়, স্কাই হাই থেকে মাত্র পনেরো মিনিটের রাস্তা। সাবরিনা একবার ভাবল বাড়ি ফিরে গিয়ে পোশাক বদলাবে কিনা। নাহ্, তাহলে দেরী হয়ে যাবে।

সে ত্রিশ মিনিটের অলস সময়টা কাটাতে রবার্টের পত্রিকায় চোখ বুলাতে লাগল। সবই টেকনিক্যাল জার্নাল আর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত পত্রিকা। এসবের প্রতি কোনোই আগ্রহ নেই সাবরিনার। রবার্ট খুব চমৎকার ছেলে কিন্তু ওর ভেতরে কল্পনাশক্তি নেই বললেই চলে।

সকাল সোয়া ন'টার দিকে মুখে একটু পাউডার বুলিয়ে, চুল আঁচড়ে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়ল সাবরিনা। তবে তার আগে দরজায় তালা লাগাতে ভুলল না। সে হেঁটে এগোল পার্কিং লটে।

সাত

মাথার ওপরের আকাশটা সিলভার গ্রে কালারের, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার জুন মাসের সকালের আকাশের চেহারা এরকমই হয়। রিক্রিয়েশন ডেক-এ কেউ নেই একজন ঝাড়ুদার ছাড়া। সে গতরাতের পার্টির আবর্জনা ঝাঁট দিচ্ছে। নিরীহ চেহারা নিয়ে শুয়ে আছে নীল সুইমিংপুল। ওই নিষ্পাপ চেহারার পুকুরেই গতকাল পায়ে খিঁচ ধরে ডুবে মরতে বসেছিল সাবরিনা। পুল থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে পার্কিং লটের দিকে এগিয়ে চলল ও।

স্কাই হাইওয়ের পার্কিং লটে অল্প কয়েকটি গাড়ি। বেশিরভাগ বাসিন্দা যে যার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে কাজে। একটি গাঢ় নীল রঙের করভেট গাড়িটার দিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইল সাবরিনা তারপর পার্স খুলে চাবি বের করে নিজের ছোট্ট কমলা রঙের ডাটসানের দরজা খুলল।

'হাই।'

পেছন থেকে মনুষ্য কণ্ঠ শুনে ঘুরল সাবরিনা। ডিসকো কিং পিটার লানডাউ যে কিনা ধারণা করেছিল সাবরিনার ব্রেন ড্যামেজ হয়েছে।

'হ্যালো,' শীতল গলায় সাড়া দিল সাবরিনা।

'আজ কেমন বোধ করছেন?'

'ভালো,' লোকটা সত্যি ওর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন বুঝতে পেরে কিঞ্চিৎ নমনীয় হলো সাবরিনা।

'একটু আধটু গা কাঁপছে বটে তবে সিরিয়াস কিছু নয়।'

'খুব ভালো খবর। গত রাতে তো আপনি আমাদের সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।'

'হুঁ। আমি নিজেও অনেক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

কাছিয়ে এল পিটার। 'গত রাতে কিছু একটা ঘটেছিল আপনার জীবনে, তাই না? অদ্ভুত কিছু।'

'হ্যাঁ। আপনি কী করে জানলেন?'

'আপনাকে অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাওয়ার সময় আপনি বিড়বিড় করে কিছু কথা বলছিলেন। তখনও আপনার পুরোপুরি জ্ঞান ফেরেনি।'

'আর কেউ শোনে নি?'

'সবাই ভেবেছে আপনি প্রলাপ বকছেন।'

'কিন্তু আপনি ভাবেন নি?'

'না। আপনার বন্ধুর অভিমত কী?'

'জানি না। সে এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলতেই চায় না।'

'আমি চাই, অবশ্য আপনি যদি চান।'

'আচ্ছা?'

পিটার শার্টের পকেট থেকে একটি বিজনেস কার্ড বের করে সাবরিনাকে দিল।

সাবরিনার মনে পড়ল এরকম কার্ড সে আগেও দেখেছে, পিটার পার্টিতে ওকে আরেকখানা কার্ড দিয়েছিল। সে এবার জোরে জোরে পড়ল, *'পিটার লানডাউ, সাইকিক কাউন্সেলিং* মানে কী এর?'

'এর মানে অনেক কিছুই। সেলফ-হেল্প, প্যারানরমাল সাইকোলজি, ই.এস.পি।'

'ড্যান্স লেসন পড়ে না এর মধ্যে?' ঠাট্টা করল সাবরিনা।

'ওটা একটা সাইড লাইন মাত্র।'

কার্ডে আবার চোখ বুলাল সাবরিনা। 'আপনি নিশ্চয় জ্যোতিষী শাস্ত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন না?'

'সত্যি বলতে কী, আমি আমার ক্লায়েন্টদের কোষ্ঠি করে দিই। আমি ট্যারট কার্ড এবং আই চিং নিয়েও কাজ করি।'

'বেশ বেশ। তবে আমার মনে হয় না এসবের সঙ্গে আমার ঘটনাগুলোর কোনো সম্পর্ক আছে।'

'সম্পর্ক যে নেই তা কী করে জানেন? এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইলে আমাকে একটা ফোন করবেন, প্লীজ।

'ধন্যবাদ,' বলল সাবরিনা। 'আপনার কথা আমার স্মরণে থাকবে।'

'অথবা আপনি যদি ওই নাচের মুদ্রাগুলো শিখতে আগ্রহবোধ করেন...'

হেসে উঠল সাবরিনা। হাসতে হাসতে মাথা নাড়ছে।

ওকে সেলুট করল পিটার, তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে এগুলো পার্কিং লটে পার্ক করা গাঢ় নীল রঙের করভেট গাড়িটির দিকে।

সাবরিনা পিটারের কার্ডখানা রেখে দিল ওর ব্যাগে, হাসছে।

সাইকিক কাউন্সেলিং। ওর কাছে এ ব্যাপারটি মনে হয় একটা ধাপ্পাবাজি। তবুও আজ সকালে রবার্টের রোবটের মতো প্রতিক্রিয়ার পরে কারও কাছ থেকে অল্প সহানুভূতিও ওর কাছে উপভোগ্য লাগছে।

পিটারের করভেট বেরিয়ে এল পার্কিং লট থেকে, অ্যাডমিরালটি ওয়ের দিকে মোড় নিল। নিজের ডাটসান চালু করল সাবরিনা, চলল করভেটের পিছন পিছন।

দুটো গাড়িই মেরিনা ফ্রি ওয়ে হয়ে সান ডিগো থেকে উত্তর দিকে চলল। তারপর করভেটের গতি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল এবং সাবরিনার দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সামনের গাড়ির সারির মধ্যে।

সান্ডা মোনিকা বুলেভার্ডের ফ্রিওয়েতে মোড় নিল সাবরিনা, চলল ডা. চৌধুরীর অফিসের ঠিকানায়। ওটা প্রকাণ্ড একটা ভিক্টোরিয়ান বাড়ি, একদা মানুষ বাস করত, এখন ডা. অশোক চৌধুরী এবং তাঁর পার্টনার ভবনটিকে ডাক্তারখানা বানিয়েছেন।

উঁচু ছাদের ওয়েটিংরুমে ঢুকল সাবরিনা। আসবাবগুলো ভারী এবং কালো– প্যাস্টেল প্লাস্টিকের কোনো ব্যবহার নেই। দেয়ালের অয়েল পেইন্টিংগুলো অরিজিনাল ল্যান্ডস্কেপ। মধ্যবয়স্কা এক রিসেপশনিস্ট সাবরিনাকে মুখ তুলে দেখে হাসি দিল। সাবরিনা তার নাম বলল। রিসেপশনিস্ট ফোন তুলে কথা বলল ডাক্তারের সঙ্গে।

'উনি একটু পরেই আপনাকে ডাকবেন,' জানাল মহিলা।

সাবরিনা একটি চেয়ারে বসে টেবিলে রাখা সানসেট আর অ্যারিজোনা হাইওয়েজ পত্রিকার স্তূপের মধ্যে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এর একটি সংখ্যা পেয়ে গেল। সে সবে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ সংক্রান্ত লেখাটি পড়তে শুরু করেছে, রিসেপশনিস্ট বলল, 'আপনি এখন যেতে পারেন, মিস স্টুয়ার্ট। দুই নম্বর রুম।'

মার্বেল টপড টেবিলে অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক রেখে হলওয়ে ধরে হাঁটা দিল সাবরিনা। চলল এক্সামিনেশন রুমে। দরজায় 'দুই' লেখা কক্ষটিতে ঢুকে পড়ল। ছোট একটি ঘর। ওখানে এক মুহূর্ত অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সাবরিনা। হোয়াইট এনামেল করা আসবাবে চোখ বুলাচ্ছে। এমন সময় ঘরে ঢুকলেন ডা. অশোক চৌধুরী। তাজা এবং আমুদে।

পরনে সাদা কোট, পকেট থেকে বেরিয়ে আছে স্টেথিস্কোপের ইয়ারপিস, ডাক্তারকে দেখে সাবরিনার মনে হলো তিনি বুঝি এইমাত্র একটি বিজ্ঞাপন চিত্রের কাজ করে এলেন। খাটো, ধূসর চুলগুলো সযত্নে আঁচড়ানো, মুখের চামড়া আশ্চর্য সজীব। গোল্ডরিম চশমার পেছনে চোখগুলো আন্তরিক এবং পেশাদার।

'ওয়েল, সাবরিনা,' ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে করতে বললেন ডাক্তার, 'তোমাকে দেখে কিন্তু মোটেই অসুস্থ মনে হচ্ছে না। কেমন বোধ করছ তুমি?'

'খুব ভালো। কোনো সমস্যা বোধ করছি না।'

'তোমার খিদে লাগে?'

'লাগে। সকালে পেটপুরে নাশতা খেলাম।'

'হুমম। আমরা স্রেফ কয়েকটি রুটিন টেস্ট করাব তবে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি একদম ফিট আছ।'

ডা. চৌধুরী সাবরিনার শরীরের তাপমাত্রা, পালস, রক্তচাপ, চোখের তারার রিয়্যাকশন, রিফ্লেক্স ইত্যাদি সব একএক করে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষা করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ওর সঙ্গে খোশালাপ চালিয়ে গেলেন। জানালেন তার ছেলে স্টামফোর্ডে পড়ে, মেয়ে এ মাসে হাই স্কুলের পাট চুকাচ্ছে। পরীক্ষার পুরোটা সময় স্বস্তি আর রিল্যাক্স বোধ করল সাবরিনা।

'যা ভেবেছিলাম,' পরীক্ষা শেষ করে মন্তব্য করলেন ডক্টর।

'কী ভেবেছিলেন?'

'তোমার ফিজিকাল শেপ এ ওয়ান মার্কস্ পাবার যোগ্য। তুমি চাইলে আমরা আরও নিবিড় চেকআপ করতে পারি তবে তার দরকার আছে বলে মনে করি না।'

'আমারও মনে হয় দরকার নেই,' বলল সাবরিনা। একটু ইতস্তত করে যোগ করল, 'আপনাকে একটা কথা বলতে চাইছিলাম।'

'কী কথা?'

'গত রাতে, আমি যখন সুইমিং পুলে ডুবে যাই এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলি, তারপর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয় আমার।'

একটা চেয়ার নিয়ে ওর মুখোমুখি বসলেন ডাক্তার।

'ব্যাপারটা খুলে বলো তো শুনি।'

গলার স্বর স্বাভাবিক এবং ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করতে করতে সাবরিনা পুরো ঘটনা খুলে বলল ডাক্তার চৌধুরীকে। তার মনে হচ্ছিল সে তার শরীর ছেড়ে চলে গেছে, ঢুকে গেছে একটা গুহার মধ্যে, সেখানে ছায়া ছায়া মানুষ, তারা তাকে ফিরতে দিতে চাইছিল না, অবশেষে তাদেরকে অগ্রাহ্য করে ফিরে আসে সাবরিনা ইত্যাদি সব বিস্তৃত জানাল সে।

সাবরিনার সমস্ত কথা চুপচাপ শুনে গেলেন ডা. চৌধুরী। এক মুহূর্তের জন্যও ওর মুখের ওপর থেকে তাঁর চোখ সরল না।

'ব্যস... এই-ই সব,' অবশেষে বলল সাবরিনা, মনে হচ্ছে কথাগুলো বলতে পেরে হালকা লাগছে বুক।

'আই সি। ওয়েল, তোমার জায়গায় আমি হলে আমারও এ বিষয়টি নিয়ে একইরকম দুশ্চিন্তা হতো।' বললেন ডাক্তার। 'এটা অস্বাভাবিক কোনো অভিজ্ঞতা নয়।'

'নয়?'

'একদমই না। এরকম আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনার শিকার হলে প্রায় ডুবে মরতে যাচ্ছিলে তুমি, এসময় মন এমন অদ্ভুত সব খেলা করতেই পারে।'

'আপনি আসলে আমার কথা বুঝতে পারেন নি, ডক্টর। আমি প্রায় ডুবে মারা

যাচ্ছিলাম না। আমি সত্যি মারা গিয়েছিলাম। কিছু সময়ের জন্য। তবে কতক্ষণের জন্য তা বলতে পারব না। কারণ আমি যেখানে ছিলাম সেখানে সময়ের কোনো হিসাব ছিল না। তবে আমি সত্যি মারা যাই। যেভাবেই হোক আমি মৃত্যুর জগত থেকে আবার ফিরে আসি।'

'হুঁ। দেখতেই পাচ্ছি তুমি ব্যাপারটা বিশ্বাস করে বসে আছ। সম্প্রতি বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে তাতে মানুষ আকস্মিক মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে আসার অভিজ্ঞতা বয়ান করেছে। তুমি এসব বই পড়েছ?'

'না।'

'এরকম বইয়ের কথা তো শুনেছ?'

'হয়তো শুনেছি,' ডাক্তার যে ওর কথা বিশ্বাস করেননি এ জন্য বিরক্তবোধ করছে সাবরিনা। 'তবে ওসব বইয়ের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে করি না।'

'মাঝে মাঝে কোনো আইডিয়া বা ইমপ্রেশন অবচেতন মনে এমনভাবে গেঁথে যায়, বড় রকমের কোনো সমস্যা বা দুর্ঘটনায় পড়লে ওগুলো মনের সারফেসে ভেসে ওঠে।'

'জানতাম না তো আপনি একজন মনোবিজ্ঞানী,' শীতল গলা সাবরিনার।

হাসলেন ডা. চৌধুরী। 'আমি তা নই-ও। আমি স্রেফ পুরানো আমলের একজন জেনারেল প্রাকটিশনার। সে যাকগে, তুমি যদি আমার মেডিকেল মতামত চাও তাহলে বলব তুমি তোমার যে অভিজ্ঞতাগুলো উদ্ভট এবং বিদঘুটে বলে মনে করছ তা আসলে ডাক্তারী ভাষায় anoxic hallucination, মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে এরকম উল্টোপাল্টা অনেক কিছুই মানুষ ভাবে এবং দেখে।'

'আপনার তা-ই ধারণা?'

'তাছাড়া আর কী?'

'আ-আমি ঠিক জানিনা। তবে আমার মনে হচ্ছে এটার এখনও সমাপ্তি ঘটেনি।'

ডা. চৌধুরী চেয়ার ছাড়লেন। ডেস্কে গিয়ে একটি প্রেসক্রিপশন প্যাডে কী যেন লিখলেন। 'তোমার ভেতরে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে তাই তোমার জন্য ট্রাংকুলাইজার লিখে দিলাম। মনমেজাজ খিঁটখিটে লাগলে চার ঘণ্টা অন্তর একটা করে ট্রাংকুলাইজার খাবে পরপর কয়েকদিন। তারপর আর ওগুলো তোমার দরকার হবে না।'

'আচ্ছা,' বলল সাবরিনা। সে কাগজের টুকরোটা নিয়ে ভাঁজ করে ব্যাগে রেখে দিল। ডাক্তারের ব্যাখ্যা এতটাই যৌক্তিক যে সাবরিনার মনে হচ্ছিল তিনি বোধহয়

ঠিকই বলেছেন। মস্তিষ্কে কিছুক্ষণ অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ থাকলে সে উল্টোপাল্টা দেখতেই পারে।

কিন্তু সাবরিনা তা মনে করে না।

হলওয়ে দিয়ে ওয়েটিংরুম পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দিলেন ডা. অশোক চৌধুরী। বললেন, 'যে সব কাজে তুমি মজা পাও সেসব কাজ করো। আর কোনো সমস্যা হলে আমাকে ফোন দিও।'

'আচ্ছা।'

ভবন ত্যাগ করে রাস্তায় নিজের গাড়ির দিকে পা বাড়াল সাবরিনা। ধূসর মেঘ ক্রমে নীল হয়ে উঠছে আকাশে, সূচনা করছে একটি চমৎকার দিনের।

এখনই বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না সাবরিনার। ঠিক করল ওয়েস্টউডে গিয়ে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ কিনবে। তারপর একটু ঘুরে বেড়াবে দোকানে এটা সেটা দেখে। ভাবনাটা ওর মনে স্ফূর্তি এনে দিল। তাই লক্ষ করল না ও সান্তা মনিকা বুলেভার্ড দিয়ে গাড়ি চালানোর সময় ওকে অনুসরণ করছে একটি শেভি স্টেশন ওয়াগন।

আট

ওয়েস্টউডের রাস্তা দোকানদার, ফেরিঅলা, কলেজ ছাত্র আর ট্যুরিস্টদের ভিড়ে যথারীতি জনারণ্যে পরিণত হয়েছে। এবং যথারীতি গাড়ি পার্ক করার কোনো জায়গা দেখতে পাচ্ছে না সাবরিনা। উইলশায়ার থেকে হল কেন্টিন পর্যন্ত শুধু গাড়ি আর গাড়ি। এত গাড়ি কোত্থেকে যে আসে! সূর্য এখন তেজে তাপ বিলোতে শুরু করেছে, সাগর ভাসিয়ে নিয়ে আসছে মৃদুমন্দ বায়ু, গাড়ি পার্ক করার জায়গা নেই বলে বাকি ব্লকগুলো হেঁটেই যাবে ঠিক করল সাবরিনা।

তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে গাড়ি নিয়ে উত্তরের কয়েকটা ব্লক পার হলো ও। হিলগার্ড থেকে কয়েক ব্লক দূরে, UCLH ক্যাম্পাসের পুব দিকে অবশেষে পার্ক করার জায়গা পেল। রাস্তার যানজটের কারণে সাবরিনা খেয়াল করেনি অনেকক্ষণ ধরে ওকে অনুসরণ করে আসছে স্টেশন ওয়াগন।

হিল গার্ডের পার্কিং লটে গাড়ি ঢোকাল ও, পার্কিং মিটারে একটি কোয়ার্টার ফেলল। ওর বেশ পেছনে পার্ক করল স্টেশন ওয়াগন, ইঞ্জিন চালু রেখে দাঁড়িয়ে রইল। ড্রাইভারের দিকে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সাবরিনা। সাদা মুখো, থমথমে চেহারার এক মহিলা। চোখে কী ক্রুর দৃষ্টি! গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল সাবরিনার, অন্য দিকে নজর ফিরিয়ে নিল। মহিলাকে কেমন চেনা চেনা লাগল। মহিলাকে নিয়ে একটা স্মৃতি মনে করতে গিয়েও পড়ছে না। তবে স্মৃতিটা ঠিক সুখকর নয়। মন থেকে চিন্তাটা দূর করে দিল সাবরিনা। গাড়ি থেকে নামল। হেঁটে এগোল লো কান্টি অভিমুখে। ওখানে বুলক'স রয়েছে, ক্যাম্পাসের ঠিক বিপরীত রাস্তায়। প্রকাণ্ড ওই ডিপার্টমেন্ট স্টোরে সবার শেষে ঢুঁ মারবে ও। আগে ওয়েস্টউডের ছোট ছোট দোকানগুলো ঘুরে দেখবে।

ওর ডানদিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে ক্যাম্পাসের সবুজ লন। ঘাসের ওপর জড়ো হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা। কেউ ঝিমুচ্ছে, কেউ পড়ছে বই, দু'একটি জুটিকে দেখা গেল বিশ্ব সংসার ভুলে বিভোর হয়ে তাকিয়ে আছে একে অন্যের দিকে। বছর চারেক আগে কলেজের পালা সাঙ্গ করেছে সাবরিনা। তরুণ মুখগুলো ওকে মুগ্ধ করল। কী সুন্দর ঝামেলাবিহীন জীবন যাপন ওদের।

ওর পেছনের স্টেশন ওয়াগনটি আগে বাড়ল। হুইলের পেছনে বসা মহিলা তার পেছনের গাড়িগুলোর চালকদের গালি গালাজ উপেক্ষা করে পার্ক করা কারগুলোর মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল সাবরিনার পিছু পিছু।

লো কান্টিতে এসে ডানে মোড় নিল সাবরিনা, ক্যাম্পাসের কিনার বরাবর হাঁটছে, ট্রাফিক বাতি জ্বলে উঠতে থেমে দাঁড়াল, পার হবে রাস্তা। ওর থেকে কুড়ি

গজ পেছনে স্টেশন ওয়াগনটিও দাঁড়িয়ে পড়ল।

লাল রঙে লেখা 'DONT'T WALK' কথাটি মুছে গিয়ে সাদা রঙে 'WALK' ঝলসে উঠল ট্রাফিক সিগনালে। সাবরিনা রাস্তা পার হতে শুরু করল।

তার বামে হঠাৎ একটি অটোমোবাইল ইঞ্জিন গর্জে উঠল। অ্যাসফল্টে ঘষা লেগে তীক্ষ্ণ শব্দ করল টায়ার। অন্যান্য পথচারীরা সাবধান করে দিতে চিৎকার করল। আর্তনাদ করে উঠল একটি বাচ্চা মেয়ে।

ক্রসওয়াকে এক মুহূর্তের জন্য জমে বরফ হয়ে গেল সাবরিনা। দেখল উন্মত্ত ষাঁড়ের মতো তার দিকে ছুটে আসছে স্টেশন ওয়াগন। উইন্ডশিল্ড দিয়ে হুইলে বসা মহিলার চেহারা দেখতে পেল ও পরিস্কার। প্রচণ্ড ক্রোধের একটি মুখোশ যেন পরে আছে মহিলা, ঠোঁট জোড়া দু'পাশে সরে গিয়ে হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়েছে হিংস্র ভঙ্গিতে। যেন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আছে একটা হায়েনা।

কেউ একজন পেছন থেকে খামচে ধরল সাবরিনাকে, বিহ্বল দশা থেকে মুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে পেল ও। সামনে লাফ মারল সাবরিনা, পেভমেন্টে সজোরে বাড়ি খেল হাত। গড়াতে গড়াতে ফুটপাতের প্রান্তে চলে গেল। ঝড়ো বাতাসের একটা ঝাপটা যেন গায়ে, স্টেশন ওয়াগনটি বিদ্যুৎগতিতে ওর শরীরের কয়েক ইঞ্চি দূর থেকে চলে গেল।

প্রচণ্ড ধাতব সংঘর্ষের শব্দ হলো। ওয়াগনটা পার্ক করা একটি গাড়ির পেছনে ধাক্কা খেয়েছে। ঝাঁকির চোটে উঠে এল ফুটপাতে। সাইডওয়াক পার হয়ে লনের দিকে চলল। গাড়ির গতি এখন কমে গেছে বটে তবে পথচারী আর ছাত্ররা এখনও ভয়ে ছোটাছুটি করছে।

মাথা ঝিমঝিম আর কানে ঘণ্টাধ্বনির শব্দ নিয়ে পেভমেন্টে উঠে বসল সাবরিনা। মানুষজন ওকে ঘিরে ধরেছে, বেশিরভাগ কলেজ স্টুডেন্ট। উদ্বেগ নিয়ে দেখছে তারা সাবরিনাকে, একই সঙ্গে লক্ষ করছে স্টেশন ওয়াগনটা রাস্তার অপর পাশে ছুটে গেল। সবাই একসঙ্গে কথা বলে উঠল।

'আপনার কি খুব লেগেছে?'

স্টপ লাইট দেখেও থামেনি গাড়িটা...'

গতি কমায়নি পর্যন্ত...'

ড্রাইভারটা নিশ্চয় পাগল...'

'...মাতাল...'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল সাবরিনা। ফুটপাতে বাড়ি খেয়ে ছড়ে গেছে হাতের চামড়া। তবে আর কোনো ক্ষত ও দেখতে পাচ্ছে না। সে অন্যদের দৃষ্টি অনুসরণ করে স্টেশন ওয়াগনটির দিকে তাকাল। ওটা রাস্তার ধারের একটা লরেল ঝোপের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেছে। বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন, এক মুহূর্তের জন্য দৃশ্যপটটিতে নেমে এল অস্বাভাবিক নীরবতা।

নয়

স্টেশন ওয়াগনের দরজা খুলে গেল। স্টিয়ারিং হুইলের পেছন থেকে মন্থর গতিতে নেমে এল মহিলা। বেঁটেখাটো, নিতান্তই সাদামাটা চেহারা, বেশ স্থূলকায়া, পরনে সুতির প্রিন্ট ড্রেস। তার ধূসর চুলগুলো আলুথালু, চেহারায় বিহ্বল ভাব। ডানে বামে মাথা ঘোরাল সে যেন কিছু খুঁজছে। তার চোখের চাউনি ফাঁকা এবং শূন্য।

রাস্তায় দাঁড়ানো লোকজন, যারা এতক্ষণ মহিলার দিকে তাকিয়ে ছিল, তারা যেন এবারে সম্বিৎ ফিরে পেল। কয়েকজন লোক মারমুখী ভঙ্গিতে ছুটে গেল মহিলার দিকে। তারা মহিলাকে ঘিরে ধরেছে এমন সময় সে হাত পা ভাঙা পুতুলের মতো নেতিয়ে পড়ল মাটিতে।

রাস্তা দিয়ে ছুটে এল সাদা-কালো রঙের পুলিশের একটি গাড়ি, ব্রেক কষল ফুটপাতের সামনে। দুই তরুণ অফিসার লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। একজন গেল স্টেশন ওয়াগনের দিকে ঘাসের ঢালে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা মহিলার কাছে, অপরজন প্রত্যক্ষদর্শীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে এল সাবরিনার পাশে।

'আপনার লেগেছে, মিস?'

'না। ফুটপাতে লাফিয়ে পড়ার সময় শুধু হাতের চামড়া একটু ছিলে গেছে।'

'ওরা বলছে গাড়িটা নাকি সোজা আপনাকে লক্ষ্য করেই ছুটে আসছিল।'

'তা বলতে পারব না। সবকিছু খুব দ্রুত ঘটে যায়। আমি ক্রসওয়াকে আসার আগ পর্যন্ত কিছুই খেয়াল করিনি। হঠাৎ দেখি গাড়িটা আমার দিকে ছুটে আসছে। লাফ মেরে রাস্তা থেকে সরে গিয়েছিলাম বলে অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।'

'রিপোর্ট করার জন্য আপনার নাম ঠিকানা লাগবে আমাদের।'

ব্যাগ হাতড়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করে তরুণ অফিসারকে দিল সাবরিনা। সে পকেট সাইজ নোটবুকে সতর্কতার সঙ্গে নাম-ঠিকানা টুকে নিল।

'জিমি!'

ডাক শুনে রাস্তার ওপারে দাঁড়ানো পার্টনারের দিকে তাকাল অফিসার, সে ঘাসের ওপর পড়ে থাকা মহিলার পাশে হাঁটু মুড়ে বসেছে।

'কী?'

'এদিকে একবার এসো।'

জিমি নামের পুলিশম্যানটি সাবরিনার ড্রাইভিং লাইসেন্স ফেরত দিয়ে বন্ধ করল

নোটবুক। শার্টের পকেটে ওটা ফেলে দিয়ে পার হলো রাস্তা। সাবরিনার কাছে থাকা ভিড়টা এবার জিমির পিছু নিল। তাদের সঙ্গে সাবরিনাও আছে।

দুই পুলিশম্যান নিচু গলায়, জরুরি ভঙ্গিতে কথা বলছে। লোকের ভিড়টা তাদেরকে কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে মাটিতে শুয়ে থাকা মহিলার দিকে নজর ফেরাল।'

'এ মহিলার আবার কী হলো?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'এ অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

'আরে কীসের অজ্ঞান। এ মারা গেছে।'

'মারা যাবার প্রশ্নই নেই। সলিড কিছুতে তার গাড়ি ধাক্কা খায়নি। শুধু ঝোপের সঙ্গে বাড়ি লেগেছে।'

'আরে ধুর, মহিলা মারা গেছে, ভালো করে দেখেন না।'

ঘুরল সাবরিনা। রাস্তার এমব্যাংকমেন্টের দিকে পা বাড়াল। যে পুলিশ অফিসারটি ওর সঙ্গে কথা বলেছিল, সে ছুটে এল।

'এক্সিকিউজ মি, মিস...' নোটবুকে একবার চোখ বুলাল সে।

'মিস স্টুয়ার্ট।'

'বলুন।'

'যে মহিলা স্টেশন ওয়াগন চালাচ্ছিল তাকে কি আপনি ভালোভাবে লক্ষ করেছিলেন?'

'না। বললাম না খুব দ্রুত সবকিছু ঘটে যায়।'

'এখন কি একবার দেখবেন?'

'দেখাটা কি খুব জরুরি?'

'প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ কেউ বলছে মহিলা নাকি আপনাকে গাড়ি চাপা দিতেই আসছিল। আপনি তাকে চিনতে পারেন কিনা আমাদের জানা দরকার।'

'ঠিক আছে।'

ঘাসের ঢালে শুয়ে থাকা মহিলার কাছে ফিরে এল সাবরিনা। মহিলাকে ঘিরে থাকা মানুষজন ওকে যাওয়ার পথ করে দিল। মহিলার চোখ এখন বোজা। শান্ত, সমাহিত একটা মুখ। গাড়িটা ওকে ধাক্কা মারার চেষ্টা করার পূর্ব মুহূর্তে যে ভয়ংকর ক্রোধান্বিত চেহারা সে দেখেছিল এর সঙ্গে তার কোনো মিলই নেই। চেহারায় মৃত্যুর ধূসর বিবর্ণতা না থাকলে বলা যেত সে ঘুমিয়ে আছে।

'চেনেন একে?' জিজ্ঞেস করল পুলিশম্যান।

'জীবনেও দেখিনি।'

'শিওর?'

'একশোবার। এখন কি আমি যেতে পারি?'

পুলিশম্যান তার পার্টনারের দিকে তাকাল। সে প্রত্যক্ষদর্শীদের নাম ঠিকানা লিখতে ব্যস্ত। 'হ্যাঁ, আপনি এখন যেতে পারেন,' বলল সে। 'তবে ইনকুয়েস্ট হলে সাক্ষী দেয়ার জন্য আপনাকে ডাকা হতে পারে।'

সাবরিনা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে আবার রাস্তার দিকে হাঁটা দিল। সবকিছু কেমন অসাড় এবং ভোঁতা লাগছে, এই মাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন লাগছে নিজেকে। সাইডওয়াকে পৌঁছার পরে সে নিজের গাড়িতে যাওয়ার বদলে রাস্তা পার হয়ে একটি ওষুধের দোকানে ঢুকল। পেয়ে গেল একটি টেলিফোন বুথ। ব্যাগ খুঁলে প্রত্যাশিত কার্ডটি পেয়ে গেল *পিটার লানডাউ। সাইকিক কাউন্সেলিং।*

ওয়েস্ট লস এঞ্জেলেস রিসিভিং হাসপাতালে বুধবার বিকেলগুলোতে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ভিড় একটু কম থাকে। অবশ্য যখন আবহাওয়া হয়ে ওঠে উষ্ণতর, সাগর সৈকত থেকে রোগির আগমন শুরু হয়ে যায় এখানে– কেউ সাগরের লবণ পানি গিলে ফেলেছে কিংবা কেউ খুব বেশিক্ষণ সূর্যতাপে চিৎ হয়ে থাকতে গিয়ে ফোস্কা ফেলে দিয়েছে চামড়ায়। তবে গরম পড়ার আগের দিকে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে রোগীর সংখ্যা স্বাভাবিকই থাকে। রোগী বলতে মায়েরা তাদের শিশুদের নিয়ে আসে যারা সিঙ্কের নিচে পড়ে থাকা উল্টোপাল্টা জিনিস গিলে ফেলেছে। কুকুরের কামড় খাওয়া রোগীও থাকে দু'একজন, গাজর কাটতে গিয়ে কোনো গৃহবধূর আঙুলই গেছে কেটে কিংবা কারও হাড় ভেঙেছে, কারও শরীরে হয়েছে খিঁচুনি অথবা করোনারি থ্রম্বসিস ইত্যাদি। শুক্র এবং শনিবার ভয়ানক ব্যস্ততায় কাটে ইমার্জেন্সির ডাক্তারদের। নানান কিসিমের রোগী আসে এ দিন দুটিতে। তবে তাদের বেশিরভাগই মদ্যপ, মারামারি করতে গিয়ে আহত হয়েছে কিংবা বেপরোয়া গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। শনি আর রোববারগুলোতে ইমার্জেন্সির ডাক্তাররা এমনই ব্যস্ত থাকেন যে একটু ধূমপানের ফুসরতও মেলে না। ডা. অশোক চৌধুরীর জুন মাসের উজ্জ্বল বিকেলে এরকম ব্যস্ততার মধ্যেই সময় কাটছিল, এমন সময় তার কাছে মিসেস ইভন কার্লসনকে নিয়ে আসা হলো।

মহিলাকে এক নজর দেখেই ডা. চৌধুরী বুঝতে পারলেন এর জন্য কিছু করার নেই। এ সবকিছুর উর্ধ্বে চলে গেছে। তবু অফিশিয়ালি DOA রিপোর্ট করার আগে তিনি স্টান্ডার্ড কিছু টেস্ট করেছিলেন। লাশটা পাঠিয়ে দিলেন বেসমেন্টে, প্যাথলজি ল্যাবে।

সময় কাটাতে মিসেস কার্লসনের পুলিশ রিপোর্ট উল্টেপাল্টে দেখলেন ডা. চৌধুরী অফিস কিউবিকলে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে। তিনি নিজের অফিসে

বসে কখনও ধূমপান করেন না কোনো রোগী দেখে ফেলার ভয়ে। তাহলে প্রতিদিন তিনি ধূমপানবিরোধী যে লেকচার দেন তার অবমাননা করা হবে।

কাঠের সুইভেল চেয়ারে হেলান দিয়ে ড্রয়ারে পা তুলে দিয়ে মহিলার পুলিশ রিপোর্টে চোখ বুলাতে লাগলেন অশোক চৌধুরী। মহিলার বয়স সাতান্ন, ককেশীয়। ঘন্টাখানেকেরও কম সময় আগে ওয়েস্টউডে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে সে। রিপোর্টে সাবরিনা স্টুয়ার্টের নাম দেখে তিনি সামনে ঝুঁকে এলেন। আবার প্রথম থেকে মনোযোগ দিয়ে রিপোর্টটি পড়তে শুরু করলেন।

পড়া শেষে ফোল্ডারটি হাতে নিয়ে ওয়ার্ডে গেলেন ডাক্তার। সেখানে এক তরুণ রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বললেন। তরুণ ডাক্তারটি এক রোলার স্কোর্টারের আহত হাঁটুর চিকিৎসা করছিল।

'আমাকে কয়েক মিনিটের জন্য ছেড়ে দেয়া যায়?' বললেন ডা. চৌধুরী।

প্রায় খালি ওয়ার্ডে একবার চোখ বুলাল রেসিডেন্ট। 'যদি না ভূমিকম্প ঘটে।'

'আমি প্যাথলজি ল্যাবে আছি।'

ম্যানিলা ফোল্ডারে বন্দি, অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্টটি বগলে চেপে এলিভেটরে পা বাড়ালেন ডা. অশোক চৌধুরী।

দশ

ঠোঁট কুচকে দুই হাতের আঙুলের ডগা পরস্পরের সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখে জ্যোতিষ চার্টের দিকে তাকিয়ে আছে পিটার লানডাউ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন এ পোজটি প্রাকটিস করেছে সে। জানে এ রকম পোজে তার মধ্যে বেশ বুদ্ধিজীবী একটা ভাব এনে দেয়। প্রতি কুড়ি সেকেন্ড অন্তর সে ফেল্ট টিপ নিয়ে চার্টের গায়ে বিচিত্র সব আঁকিবুকি করে। তারপর আবার মুখে ফুটিয়ে তোলে ভীষণ চিন্তার ছাপ, তবে এবারে তার কপালে থাকে ভাঁজ এবং মৃদু সন্তুষ্টির চিহ্ন চোখে।

যে টেবিলে বসে কাজ করে পিটার লানডাউ সেটি আকারে গোলাকার, ভারী এবং ঝালর দেয়া মোটা মখমলের বেগুনী কাপড় দিয়ে ঢাকা। বাতাসে ধূপের গন্ধ, সঙ্গে মিশে রয়েছে মশলার মিষ্টি সুঘ্রান। ঘরের কোথাও লুকানো স্পিকারে সেতার বাজিয়ে চলেছেন রবি শংকর।

টেবিলের ওপাশে, পিটারের মুখোমুখি বসেছেন মিসেস লিওনোরা গ্রিসবেক। লোকের ধারণা মিসেস গ্রিসবেকের বয়স পঁয়তাল্লিশ হতে পারে আবার পঁয়ষট্টি হওয়াও বিচিত্র নয়। বিষয়টি নির্ভর করে তিনি কসমেটিক সার্জারীর কোন্ স্টেজে রয়েছেন। আজ তাঁর মুখের চামড়া টানটান, অতি সম্প্রতি সার্জারীর কারণে খানিকটা চকচকেও লাগছে। তবে তাঁর ঘাড়ের চামড়ায় পড়েছে গভীর ভাঁজ, কড়া মেকআপের আস্তরণ ওগুলো ঢেকে দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

অনিসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে পিটারের দিকে তাকিয়ে আছেন মিসেস গ্রিসবেক। পিটারের মুখে সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তোষের ছাপের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চেহারার ভাব বদলে যাচ্ছে ভদ্রমহিলার। চার্ট দেখে পিটার যখন মন্তব্য করছে, তিনি কঠোরদৃষ্টিতে ওদিকে তাকিয়ে থাকছেন যেন তীক্ষ্ণ মনোযোগের ছুরি দিয়ে ওগুলো ফালা ফালা করে অর্থোদ্ধার করবেন।

অবশেষে কিছু নোটেশন উল্লেখ করে কাগজে লম্বা একটি দাগ টানল পিটার লানডাউ।

'এই যে আমরা সব পেয়ে গেছি,' বলল পিটার, ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল যেন নিদারুণ পরিশ্রম গেছে তার কাজটা করতে।

সামনে ঝুঁকলেন মিসেস গ্রিসবেন, উঁকি দিলেন চার্টে।

'কেমন দেখলে, পিটার?'

'আজকের দিনটার কথা যদি ধরি, তাহলে দিনটা তেমন ভালো যাবে না।' চার্টে হাত বুলাল পিটার। 'তবে দেখে মনে হচ্ছে কালকের দিনটি আপনার জন্য কোনো শুভ সংবাদ নিয়ে আসবে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিসেস গ্রিসবেকের চেহারা। 'নিশ্চয় শুভ সংবাদটি আমার দোতলার ঘর পুনঃসংস্কারের বিষয়ে।'

'উইকএন্ডটা,' বলে চলল পিটার, 'ভালোই কাটবে। তবে সাবধান থাকবেন আপনার নামে কেউ মিথ্যা রটনা করছে।'

'কে? কে আমার সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করছে? কী বলছে তারা?'

'গ্রহ-নক্ষত্রগুলো নামটি পরিষ্কারভাবে বলছে না,' বলল পিটার।

'হুমম। আমার সন্দেহ শিলা ফেস এ কাজ করছে। আমার পড়শী সে। রাস্তার অপর পাড়ে বাড়ি।'

'হতেও পারে,' চার্টে চোখ বুলাতে বুলাতে মন্তব্য করল পিটার।

'জানতাম আমি। যাক গে, তুমি বলতে থাকো।'

'সোমবার আপনার শারীরিক কোনো বেদনা হওয়ার সম্ভাবনা দেখছি।'

'আমার পিঠ,' অনুযোগের সুরে বললেন মিসেস গ্রিসবেন। 'আবার ব্যথা শুরু হয়ে গেছে।'

'সোমবার কাউকে খবর দেবেন আপনার পিঠ দেখানোর জন্য।'

'বাড়ি ফিরেই ডা. আইজাককে ফোন করব।'

'মঙ্গলবার– আঃ – মঙ্গলবার আপনার অপছন্দের কারও ওপর প্রতিশোধ নিতে পারবেন। এমন কেউ যার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খুবই খারাপ।'

'শিলা ফেস,' খুশি খুশি গলায় বললেন মিসেস গ্রিসবেক। 'এবারে উচিত শিক্ষা পাবে সে।'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বুধবার দিনটা একটু খারাপ যাবে। কেউ আপনাকে কুপরামর্শ দিতে পারে। সতর্ক থাকবেন।'

'কে হতে পারে?'

'বলা কঠিন। জাস্ট বি কেয়ারফুল।'

'ও নিয়ে ভাববে না। আমি সাবধানে থাকব। আর কিছু?'

'এরপরে বৃহস্পতিবারের কথা তো আগেই বলেছি। পরের হপ্তায় আবার আসবেন।'

'তাতো আসতেই হবে। সপ্তাহটা কী তাড়াতাড়ি যায়!'

'সময় উড়ে বেড়ায়,' প্রাজ্ঞদের মতো বলল পিটার।

ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন মিসেস গ্রিসবেক। 'তোমার কাছে এলে অনেক স্বস্তি পাই আমি, পিটার। তুমি জানো না এসব সেশন আমার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।'

সে আমি ভালো করেই জানি, মনে মনে বলল পিটার। আপনি প্রতি সপ্তাহে আসা

মানে আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাছ থেকে আমার একটি চেক প্রাপ্তি।

মুখে বলল, 'আমি আমার ক্ষুদ্র সামর্থ দিয়ে যদি আপনার জীবনের বলীরেখাগুলো সামান্যও মুছে দিতে পারি–' ইস, শব্দচয়নটা ঠিক হলো না– 'তাহলেই আমি খুশি।'

'তুমি সত্যি খুব ভালো।'

পিটার জ্যোতিষী চার্ট সরিয়ে রেখে হাত দিয়ে টেবিলের কাপড়টি সমান করতে লাগল।

'যাওয়ার আগে,' বললেন মিসেস গ্রিসবেক, 'তোমার ওই বিখ্যাত ভেষজ চা এক কাপ পান করলে কেমন হয়? তোমার মতো অত সুন্দর চা আর কেউ বানাতে পারে না।'

মুখে করুণ ভাব ফোটাল পিটার। 'আপনাকে চা বানিয়ে খাওয়াতে পারলে খুবই খুশি হতাম, লিওনোরা, তবে আমার ভেষজ চায়ের জোগানদার এ মুহূর্তে শহরে নেই। সিঙ্গাপুরে তার আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। আর আমারও দুর্ভাগ্য গতকালই আমার ভেষজ চা তৈরির সমস্ত উপকরণ-ফুরিয়ে গেছে।'

পিটারের ভেষজ চায়ের প্রকৃত যোগানদার হলো সানসেট এবং লা ব্রিয়ার র‍্যালফস মার্কেট। আর যে উপকরণের কথা সে বলেছে তা হলো ভদকা। সে চা বানানোর সময় মিসেস গ্রিসবেকের কাপে কয়েক ফোঁটা ভদকা ঢেলে দেয়। আর ভদকা মেশানো চা পান করেই তৃপ্তিতে আঃ উঃ করেন মহিলা।

'খুবই দুঃখের কথা,' বললেন তিনি। 'তোমার চা পান করলে আমার দিনটিও বেশ সুন্দর যায়।'

'আগামী সপ্তাহেই ভেষজের নতুন সাপ্লাই চলে আসবে,' মিসেস গ্রিসবেককে আশ্বস্ত করল পিটার।

অন্যদিন হলে মিসেস গ্রিসবেকের সঙ্গে বসে আরও মিনিট দশেক বকবক করতে পারত পিটার লানডাউ, মহিলাকে ভদকা মেশানো চা বানিয়েও খাওয়াতে পারত। কারণ ভুয়া জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চা করে পিটার এই মহিলার কাছ থেকে সাপ্তাহিক সেশনে যে পরিমাণ টাকা পায় তার অংক নেহায়েত মন্দ নয়। কাজেই মহিলাকে সে একটু তোয়াজ করতেই পারে। শুধু মিসেস গ্রিসবেক নয়, তার অন্যান্য ক্লায়েন্টরাও তাকে ভালো টাকা দেয়। পিটারের কাজ নিয়ে এখন কেউ কোনো অনুযোগ করেনি বলেই সে করভেট গাড়ি চালাতে পারছে, গুচ্চির পণ্য ব্যবহার করতে পারছে।

তবে আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। মিসেস গ্রিসবেককে তাঁর বেভারলি হিলসের আঠারো কক্ষ বিশিষ্ট বাড়িতে, যেখানে ভদ্রমহিলা তাঁর গাইনকলজিস্ট স্বামী এবং বিটসি ফেস নামে একটি ইয়র্কশায়ার টেরিয়ার নিয়ে বাস করেন, সেখানে দ্রুত ফেরত পাঠাতে চাইছিল পিটার শুধু একজনের জন্য। তার নাম সাবরিনা স্টুয়ার্ট। পিটার চাইছিল যখন সাবরিনা এসে পৌঁছাবে তখন সে রিল্যাক্সড মুডে এবং প্রস্তুত

অবস্থায় থাকবে।

বিকেলে সাবরিনার ফোন পেয়ে বেশ অবাকই হয়েছিল পিটার। সাবরিনার মতো সুন্দরী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বুদ্ধিমতী তরুণীরা খুব কমই আসে তার কাছে হাত দেখাতে। রাশিটাশিতে এদের বিশ্বাস নেই বলেই হয়তো। তবে গত রাতে পিটার ঠিকই অনুমান করেছিল কোনো অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল সাবরিনার। মেয়েটির চেহারার অভিব্যক্তিই ছিল তার প্রমাণ। মাঝে মাঝে পিটার নিজেই অবাক হয়ে ভাবে তার হয়তো সত্যি অতিন্দ্রীয় কোনো ক্ষমতা রয়েছে।

মিসেস গ্রিসবেককে সে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে হাত নাড়তে লাগল। ভদ্রমহিলা আঁকাবাঁকা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। সিঁড়িগুলো গিয়ে মিশেছে ক্যানিয়ন স্ট্রিটে। এখানেই পিটারের নিবাস। সিঁড়ির গোড়ায় অপেক্ষা করছিল মিসেস গ্রিসবেকের ধূসর রঙা মার্সিডিস। তাঁকে আসতে দেখে তরুণ ড্রাইভার লাফ মেরে এগিয়ে এসে পেছনের দরজাটি খুলে ধরল। পিটারের দিকে এক ঝলক চাইল ড্রাইভার। তারপর নিজের আসনে গিয়ে বসল।

শক্তভাবে বন্ধ হয়ে গেল গাড়ির দরজা, লরেল ক্যানিয়ন বুলেভার্ড হয়ে হলিউডের দিকে ছুটল গাড়ি।

পিটার বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিকেলের বাতাস সেবন করল ফুসফুস ভরে। ছোট্ট বাড়িটি নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যথার্থ। ঘরটি মনের মতো করে সাজিয়েছে সে। একজন জ্যোতিষীর অফিসকে রহস্যময় একটা আবহ দিতে যা যা দরকার তা জোগাড় করতে কার্পণ্য করেনি সে। রয়েছে গাঢ় নীল কাপড়ে মোড়া একটি ক্রিস্টাল বল, রাশিচক্রের ছবিঅলা একটি ঘড়ি, একটি হাইতিয়ান ভুডু মুখোশ– এতে ঘরটা অতিপ্রাকৃতিক একটি পরিবেশ পাচ্ছে, আবার মুখোশটা অতটা ভয়ংকর নয় যে পিটারের ক্লায়েন্টরা দেখে ভীত হয়ে উঠবে।

ঘরে ফিরল পিটার। সাবরিনার আসতে এখনও পৌনে এক ঘণ্টা বাকি। ঘরে ধূপের গন্ধ দূর করতে সে সামনের বড় জানালাটির ওপরের একজস্ট ফ্যান চালিয়ে দিল। ধূপধূনোর গন্ধে মুগ্ধ হওয়ার মতো মেয়ে নয় সাবরিনা। সে রবিশংকরের সেতার বন্ধ করে লরিন্ডো আলমিডার গিটার জ্যাজ চালিয়ে দিল। কিছুক্ষণ বাজনা শোনার পরে প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল পিটার। নাহ্, এ মিউজিকটাও মন্দ নয়।

তবে কোনো ড্রিংকের ব্যবস্থা করল না পিটার। শত হলেও মেয়েটা তাকে ফোন করেছে, সে তা আর ফোন করেনি। কাজেই বেশি বেশি আদিখ্যেতা দেখানো যাবে না। সন্তুষ্টচিত্তে নিজের অ্যাক্রিলিক ফার স্ট্রাটোলাউভারে ধপ করে বসে পড়ল পিটার। মৃদু হেসে বুজল চোখ। জীবন তার খারাপ কাটছে না।

এগারো

পাঁচ বছর আগে পিটার লানডাউর জীবন এত আরাম আয়েশে কাটত না। তখন সে ছিল হলিউডের হাজারো সুদর্শন তরুণ অভিনেতাদের একজন আর টিভি কিংবা মুভিতে একটু পার্ট পাবার আশায় হন্যে হয়ে ঘুরত। ক্যানসাস সিটি কম্যুনিটি থিয়েটারে অভিনেতা হিসেবে বেশ নামডাক করলেও পিটার যখন আবিষ্কার করল হলিউডের দরজা তার জন্য খোলা নেই, খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সে।

ডেসিলু স্টুডিওর কাছে, মেলরোজ এভিন্যুতে দুই আশাবাদী তরুণের সঙ্গে একটি ঘর ভাগাভাগি করে থাকত পিটার। এদের একজন ছিল হবু উপন্যাসিক যে কিনা যখন যার বই পড়ত তখনই তার মতো লেখার চেষ্টা করত। সে ইতিমধ্যে দুশো পৃষ্ঠার একটি পাণ্ডুলিপি লিখে ফেলেছিল যার মধ্যে রস ম্যাকডোনাল্ড থেকে জন গ্রেগরি ডানের স্টাইল তো ছিলই, ফিলিপ রথ এবং মার্ক টোয়েনের প্যাসেজের স্মৃতিচারণও বাদ পড়েনি। অপর রুমমেটটি ছিল একজন কৌতুকাভিনেতা, মানে কৌতকাভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখতো সে। ভাবত সে পিছনে পড়ে আছে কারণ সে একজন WASP (White Anglo-Saxon Protestant) তাই তাকে যাতে ইহুদিদের মতো লাগে সেজন্য সে গালে দাড়ি গজিয়েছিল এবং নিজের নাম কনরের বদলে ক্রাভিজ রাখে।

সেইসব দিনগুলোতে অভিনয়ের কাজ জোটানো সত্যি দুর্লভ ছিল বলে যতটা পারে সস্তায় আহার করত পিটার। আর চেষ্টা করত বিভিন্ন পার্টিতে দাওয়াত পেতে। কোনো পার্টিতে দাওয়াত পাওয়া মানে সেদিন রাতের খাবারটা জুটে গেল। আর আকর্ষণীয় দেখতে এবং জনপ্রিয় ছিল বলে দাওয়াত পেতে খুব একটা কষ্ট করতে হতো না ওকে।

এসব পার্টিতে গিয়েই হঠাৎ করে অতিথিদের হাত দেখার বিষয়টি মাথায় আসে পিটারের। ভাগ্য গণনার ওপরে একটি পেপারব্যাক পড়া ছিল ওর। ভাবে যেহেতু পুরো ব্যাপারটাই একটা বুলশিট কাজেই এ নিয়ে কাজ করতে ওর কোনো অসুবিধা হবে না।

হয়ওনি। চল্লিশোর্ধ নারীরা পিটারের মতো সুদর্শন যুবকের সামনে নিজেদের হাত মেলে ধরতে বেশ পছন্দই করত। পিটার তাদেরকে বলত, 'আপনার জীবনটা

দেখছি খুবই অসাধারণ। আর আপনি দারুণ সব বাধা পেরিয়ে আজ এতদূরে আসতে পেরেছেন। এরকম তোষামোদি কথা শুনতে কে না পছন্দ করে? পিটার কখনো বলত, 'আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে আপনি অপ্রত্যাশিতভাবে বড় অংকের একটা টাকা পেয়ে যাবেন।' কিংবা সহানুভূতির সুর তুলত, 'আপনার হাতের রেখায় অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি করুণ ঘটনার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।'

এসব লোক পরে পিটারকে খুঁজতে থাকে তাদের হাত দেখানোর জন্য। পিটার বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করে হাত দেখার পরে সে পয়সাপাতিও পাচ্ছে।

পিটারের শুরুর দিকের এক মক্কেল ছিল এক হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট টাইকুনের স্ত্রী। সে-ই পিটারকে জ্যোতিষ চর্চাকে পেশা হিসেবে নিতে উৎসাহিত করে। এ মহিলাই লরেল ক্যানিয়নে পিটারের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করে দেয়। বদলে পিটারকে উইজা বোর্ডের সাহায্যে মহিলার মৃত স্বামীর যোগাযোগ করিয়ে দিতে হতো এবং মাঝে মাঝে তার শয্যাসঙ্গীও হতে হতো যে কাজে ভদ্রমহিলার স্বামী অপারগ ছিল কিংবা হয়তো আগ্রহ বোধ করত না।

পিটার বিজনেস কার্ড ছেপে হাত দেখার ব্যবসায় নেমে পড়েছিল। এখন তার ব্যবসা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আর আগের মতোই বিভিন্ন পার্টিতে দাওয়াতেও কোনো বিরাম নেই। স্কাই হাই'র মতো পার্টিতে গেলে সুন্দরীরা তাকে ঘিরে থাকে। কিন্তু সাবরিনা স্টুয়ার্টকে তার মোটেই এরকম সাধারণ কোনো মেয়ে বলে মনে হয়নি। মেয়েটিকে প্রথম দর্শনেই যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মনে হয়েছিল। আর সাবরিনার মতো মেয়েরা পিটারের মতো সুদর্শন পুরুষ দেখলেই গলে যায় না। তবু সে একটি চান্স নিতে গিয়েছিল। সাবরিনা যখন পানিতে ডুবে যায় তখন সত্যি তার বুকে হাহাকার তৈরি হয়েছিল। মেয়েটিকে বেঁচে উঠতে দেখে সে সত্যি খুশি হয়েছিল।

পুল থেকে অ্যাপার্টমেন্টে সাবরিনাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ও ঠিক কী বলেছিল সে কথা মনে করার চেষ্টা করল পিটার। সবাই চিৎকার চেঁচামেচি করছিল তাই সাবরিনা বিড়বিড় করে কী বলছিল সেদিকে কারও নজর ছিল না। তবে পিটারের সমস্ত মনোযোগ সাবরিনার প্রতি ছিল বলেই সে মেয়েটির কথা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে। ওই সময় কথাগুলো শুনে মনে হয়েছিল উন্মাদের প্রলাপ। কিন্তু আজ সকালে সে সাবরিনার সঙ্গে কথা বলার পরে সাবরিনা নিজেই ওর সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহ দেখিয়েছে। আর এটুকুই পিটারের জন্য যথেষ্ট। যদি সাবরিনাকে ঠিক মতো সামাল দিতে পারে পিটার, বলা যায় না এর শেষটা ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

বারো

লরেল কেনিয়ন বুলেভার্ড ধরে ছোট্ট গলির মধ্যে গাড়ি নিয়ে ঢুকল সাবরিনা। এখানেই থাকে পিটার লানডাউ। আধ ব্লক দূরে পিটারের নাম লেখা সাইনবোর্ড দেখতে পেল ও। ডাটসান গাড়িটি পার্ক করে চুপচাপ কিছুক্ষণ স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসে রইল সাবরিনা। 'আমি এখানে কেন মরতে এলাম' হঠাৎ এরকম একটা চিন্তা ঢুকে গেছে ওর মধ্যে। মাঝে মাঝে এরকম হয় ওর যখন প্লেনে চড়ে কিংবা কোনো অদ্ভুত পার্টিতে যায়। এয়ারপোর্টে ও গভীর দম নিয়ে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে সে কোথায় যাচ্ছে কিংবা কেন, আর পার্টিতে গেলে ও সাধারণত জানে কে বা কারা ওকে স্বাগত জানাতে আসবে। কিন্তু আজ হলিউডের এই সবুজ কেনিয়নে এসে মনের ভেতর থেকে উদ্বেগ দূর করতে পারছে না কিছুতেই।

গতকাল সত্যি চব্বিশ ঘন্টা হয়ে গেল?– যখন পিটার লানডাউর সঙ্গে তার দেখা হয়, কল্পনাও করেনি পরের দিনই নিজে গাড়ি চালিয়ে এ লোকের বাড়ি আসবে সাবরিনা, যেমন সে স্বপ্নেও ভাবেনি সুইমিংপুলের পানিতে ডুবে যাবে। এমনকী আজ সকালেও পিটারের সঙ্গে আবার দেখা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না সাবরিনার। কিন্তু ডা. চৌধুরীর সঙ্গে অতৃপ্ত আলোচনা এবং ওয়েস্টউডে এক উন্মাদ ড্রাইভারের গাড়ির নিচে প্রায় চাপা পড়তে যাওয়ার পরে ওর মনে হয়েছিল নিজের গল্পটা কাউকে বলা উচিত আর পিটারই হয়তো ওর কাহিনী মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

গাড়ি থেকে নামল সাবরিনা। তাকাল পরিপাট্যহীন, সাদামাটা বাড়িটির দিকে। ভঙ্গুর চেহারার, রঙ করা কাঠের সিড়ির দিকে তাকিয়ে ও হাসল। সিঁড়িগুলো বারান্দা পর্যন্ত বিস্তৃত। সাবরিনা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে হাসিমুখে দোর খুলে দিল পিটার লানডাউ। তার পরনে কালো লেদার জিন্স এবং বেল্ট বাকল পর্যন্ত খোলা সাফারি শার্ট। তার গলায় সোনার চেইনের সঙ্গে ঝুলছে একটি সোনালী সিংহ।

'আসুন, আসুন,' আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল পিটার সাবরিনাকে। 'ভেতরে আসুন।'

ছোট এবং উষ্ণ একটি ঘরে প্রবেশ করল সাবরিনা। ঘরটি কুশন আর নিচু ফার্নিচার দিয়ে সাজানো। মোটা কার্পেট দিয়ে ঢাকা মেঝে। সুক্ষ্ম আলোর উৎস বোঝা

যাচ্ছে না। লুকানো স্পিকার মৃদু লয়ে গিটারের ঝংকার ছড়িয়ে চলেছে। সাবরিনা ভাবছিল এখানে এসে সে ভুলই করে ফেলল কিনা।

'বাসা খুঁজতে সমস্যা হয়নি তো?'

'না।'

'আপনার জন্য কী আনব?'

একবার ভাবল মানা করে, পরমুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলে বলল, 'মার্টিনি দিতে পারেন।'

'দুঃখিত। আমার কাছে কোনো হার্ড ড্রিংকস নেই। ওয়াইন চলবে?'

'চলবে।'

পুতির পর্দা সরিয়ে অপর একটি রুমে গেল পিটার। বই এবং ছবিগুলো দেখতে লাগল সাবরিনা। বেশিরভাগ বই অকাল্ট আর সাইকোলজির উপর। ছবিগুলোও তাই। তবে বীভৎস রঙের কোনো ছবি নয়।

পুতির পর্দা খসখস শব্দ তুলল, দুই গ্লাস ওয়াইন নিয়ে ফিরে এল পিটার। একটা গ্লাস নিয়ে চুমুক দিল সাবরিনা। বেশ স্বাদ। পিটারের দিকে তাকিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে মাথা দোলাল ও। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পিটারের চেহারা।

'আশা করি আপনার কাজের কোনো ক্ষতি করছি না,' বলল সাবরিনা।

'নাহ,' ঘড়ি দেখল পিটার। 'বিকেল চারটা পর্যন্ত আমি ফ্রি আছি।'

'বলতে হাস্যকরই লাগছে,' বলল সাবরিনা, 'কিন্তু আমি নিজেই জানি না আমি কেন এখানে এসেছি।'

'গত রাতের ঘটনা নিয়ে আপনি কথা বলতে চেয়েছিলেন,' ওকে মনে করিয়ে দিল পিটার।

'ও, হ্যাঁ এখানে আসার সেটা একটা কারণ বটে।'

'আরাম করে বসুন। তারপর আপনার গল্প শোনা যাক।'

আরামদায়ক একটি লাভ সিটে সাবরিনাকে বসার জন্য ইঙ্গিত করল পিটার। সাবরিনা একটু অবাকই হলো দেখে পিটার ওর পাশে না বসে মুখোমুখি একটা চেয়ার দখল করেছে।

জানালার ম্লান সবুজ রঙের পর্দাগুলো ফেলে দেয়া হয়েছে, বিকেলের আলো সামান্যই ঢুকতে পেরেছে ঘরে। হালকা লয়ের বাজনা, কোথাও মৃদু ঘরঘর শব্দে চলেছে একটি ফ্যান, আর পিটারের নরম কণ্ঠ সব মিলে কেমন একটা সম্মোহনের ভাব এনে দিয়েছে। খুব বেশি রিল্যাক্স বোধ করা যাবে না, নিজেকে মনে করিয়ে দিল সাবরিনা।

'গতরাতে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল,' বলল ও, 'তা হলো মৃত্যু-অভিজ্ঞতা।

আমি মারা গিয়েছিলাম।'

পিটারের প্রতিক্রিয়া আশা করল সাবরিনা কিন্তু সে শুধু ওকে কথা চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল।

'মানে আমি বলতে চাইছি, একটা সময়ের জন্য আমি সত্যি মৃত্যুবরণ করি।'

'শুনছি আমি,' বলল পিটার। 'বলে যান।'

তৃতীয়বারের মতো গল্পটা বলল সাবরিনা। নিজের শরীর ত্যাগ করার পরে টানেলে প্রবেশ এবং বেরিয়ে আসার সময় যে অনুভূতিগুলো হয়েছিল ওর সেগুলো আবারও শোনাল। কথা শেষ করার পরে চরম ক্লান্তি ভর করল শরীরে।

নিচু টেবিলের দিকে হাত বাড়িয়ে সাবরিনার ওয়াইনের গ্লাসটি ভরে দিল পিটার। 'আজ দুপুরে আমাকে ফোন করার কারণ কী?'

'ওই অ্যাক্সিডেন্টটার কারণে। আমি ওয়েস্টউডে রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ি চাপা পড়তে যাচ্ছিলাম। এক মহিলা গাড়িটা চালাচ্ছিল।'

'এ ঘটনার সঙ্গে গত রাতের ঘটনার কোনো সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করছেন?'

'জানি না আমি। সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। মহিলার বোধহয় হার্ট অ্যাটাক জাতীয় কিছু হয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে আসার পরপরই সে মারা যায়।'

'অদ্ভুত তো!' মন্তব্য করল পিটার।

'ঠিক তাই। তখন আমি ভাবি কারও সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'ওয়েল, আপনার আগমনে আমি খুশিই হয়েছি। এখন বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?'

'সাইকিক কাউন্সেলিং ধরনের কিছু করতে চান?'

'বা আপনার মাথায় যদি অন্য কোনো আইডিয়া থেকে থাকে,' সাবরিনাকে ভ্রু কোঁচকাতে দেখে সিরিয়াস হয়ে উঠল পিটার। সাইকিক কাউন্সেলিং এর কাজটাই আমি করে থাকি।'

'আমি আপনার কাছে ঠিক কী ধরনের সাহায্য চাইতে এসেছি নিজেই জানি না, পিটার। সত্যি বলছি। হয়তো সহানুভূতিসূচক কিছু বাক্য শুনতে এসেছি। তবে আপনি বা অন্য কেউ আমার জন্য কিছু করতে পারবে বলেও আশা করছি না।'

'আগেই অত নিশ্চিত হবেন না,' ঘরের চারপাশে অনিসন্ধিৎসু চোখে নজর বুলাল পিটার। 'ক্রিস্টাল দিয়ে এ কাজ চলবে না। ওইজা বোর্ড?' চট করে সাবরিনার দিকে একবার তাকাল সে, তারপর মাথা নাড়ল। 'না, আমরা এখনই ওইজা বোর্ডের জন্য প্রস্তুত নই। আপনার জন্য যে অ্যাস্ট্রোলজিকাল চার্ট করে দেব সে সময়ও নেই। হাত দিয়ে চিবুক ঘষল সে। 'ট্যারট রিডিংয়ে আপনার আপত্তি নেই তো?'

'ভাগ্য বলা কার্ড? জিপসিদের মতো?'

সামনে হাত বাড়িয়ে দিল পিটার তালু খোলা রেখে।

'না, না, না, ভাগ্য বলা টলা নয়। এ শব্দটাই উচ্চারণ করবেন না। ভাগ্য বলা আইনবিরোধী কাজ। জিপসিদের ব্যাপারটাও তাই, যদ্দুর আমি জানি। আমি কোনো জিপসি জ্যোতিষী নই, আমি একজন সাইকিক কাউন্সেলর।' হাসল পিটার।

'এর বিরুদ্ধে এখনও কোনো আইন তৈরি করা হয়নি।'

'আমার আসলে এসবে খুব একটা বিশ্বাস নেই,' বলল সাবরিনা।

'গত রাতের আগে আপনি কি বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন যে আপনি মারা যাবেন এবং আবার ফিরে আসবেন?'

'আপনার এ কথাটায় অবশ্য যুক্তি আছে।'

'সে যাক গে, আপনি বিশ্বাস করবেন কী করবেন না তাতে কিছু আসে যায় না। ট্যারট রিডিংয়ে কোনো সমস্যা নেই। একবার চেষ্টা করেই দেখুন না? আমরা তো আর কিছু হারাব না।'

'আ... ইয়ে ঠিক আছে,' একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে ঝোলাল সাবরিনা, সাথে সাথে লাইটার দিয়ে ওটাতে আগুন ধরিয়ে দিল পিটার। 'আপনি যেমনটি বললেন, সত্যি তো আমার হারাবার কী আছে?'

'দ্যাটস দা স্পিরিট,' সিধে হলো পিটার। একটা লেখার টেবিলে এগিয়ে গেল। ড্রয়ার থেকে রেশমি কাপড়ে মোড়া আয়তাকার একটি বাক্স বের করল। সাবধানে রেশমি কাপড়টি খুলল সে। সাবরিনা দেখল ভেতরে অনেকগুলো কার্ড।

তের

পিটার কার্ডগুলো নিয়ে সাবরিনার পাশে এসে বসল। ওদের সামনে রাখা একটি টেবিলে মেলে দিল কার্ডগুলো। রঙবেরঙের নানান কার্ড। কোনোটিতে মানুষের ছবি, কোনোটি জানোয়ারের। পৌরাণিক বিভিন্ন প্রাণী দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু কার্ডে। এ ছাড়াও রাজা-রানীর ছবি সম্বলিত কার্ডও আছে কয়েকখানা।

'এই প্রথম ট্যারট কার্ড দেখছেন?' জিজ্ঞেস করল পিটার।

'হুঁ। প্রতিটি কার্ডের কি আলাদা আলাদা অর্থ আছে?'

'এক অর্থে আছে বৈকি!' মসৃণ গলায় জবাব দিল পিটার।

'তবে সিম্বলিজম হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি বিষয়। ট্যারটের এটাই হলো প্রাণ। লেআউটের কোথায় কার্ডগুলো আছে সে অনুসারে প্রতিটি কার্ডের আলাদা অর্থ থাকে, কার্ডগুলো সোজাভাবে থাকতে পারে, উল্টোভাবেও থাকতে পারে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কুয়েরেন্ট যে আবহ তৈরি করে, সেটা।'

'কুয়েরেন্ট?' প্রশ্ন করল সাবরিনা।

'কুয়েরেন্ট হলেন আপনি। আর আমি রিডার।'

'আপনি যা বলেন,' সাবরিনা একটা কার্ড তুলে নিল, কার্ডে লম্বা, চৌকোণা একটি কাঠামো দেখা যাচ্ছে। কাঠামোটা একটা পাহাড়চুড়োর ওপরে। তার গায়ে আঘাত হেনেছে বিদ্যুত। জানালা দিয়ে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে, একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা, তাদের চেহারা বিকৃত হয়ে আছে, বোঝা যাচ্ছে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। 'এর মানে কী? দেখে মনে হচ্ছে অশুভ কিছু।'

ওর হাত থেকে কার্ডখানা নিল পিটার। 'এ হলো টাওয়ার।' বলল সে। 'আপনি ঠিকই বলেছেন এ কার্ড দুঃসংবাদের প্রতীক। সংঘর্ষ, দুর্যোগ, ভয়ংকর কোনো পরিবর্তন, নিপীড়ন। তবে পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করে টোটাল রিডিংয়ের ওপর। সঠিক আবহে এ হতে পারে শরীর অথবা মনের নয়া স্বাধীনতা, যদিও এ জন্য বিনিময়ে অনেক কিছু দিতে হয়।'

'আপনি যা বলছেন তা কি মন থেকে বিশ্বাস করে বলছেন?'

হাসল পিটার। 'নট রিয়েলি, তবে ব্যাখ্যার একটা সুযোগ তো সবসময়ই থাকে। এ জন্যেই তো আমি আছি।'

'ঠিক আছে,' বলল সাবরিনা, 'যা করছিলেন করুন।'

'আচ্ছা,' টেবিলে কার্ডগুলো ছড়িয়ে দিল পিটার। 'প্রথমে এমন একটি কার্ড খুঁজে পেতে হবে যা আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করবে।' সে একটি কার্ড তুলে নিল। কার্ডের ছবিতে এক সুন্দরী মহিলা বসে আছে সিংহাসনে, হাতে রত্নখচিত পানপাত্র।

'কুইন অব কাপস কেমন?'

'মন্দ নয়।'

পিটার কুইন অব কাপস-এর কার্ডটি টেবিলের মাঝখানে রাখল। তারপর বাকি তাসগুলো গুছিয়ে নিয়ে সাবরিনার হাতে দিল। 'আপনি কার্ডগুলো শাফল করুন।'

'কতক্ষণ শাফল করব?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'যতক্ষণ মন চায়। শাফল করার সময় এমন কিছু মনে মনে চিন্তা করবেন যে প্রশ্নের জবাব আপনি কার্ডের কাছ থেকে জানতে চান।'

ট্যারট কার্ডগুলো সাধারণ খেলার কার্ডের চেয়ে আকারে বড়। এগুলো শাফল করতে সমস্যাই হচ্ছিল সাবরিনার। তবু সে একটা কার্ডের সঙ্গে আরেকটি মেশাতে লাগল। সে সঙ্গে কী প্রশ্ন করা যায় ভাবতে থাকল। তার এখনও মনে হচ্ছে এখানে আসাটা বোকামি হয়ে গেছে। কিন্তু যতক্ষণ এখানে আছে খেলাটা খেলে যাবে সাবরিনা।

প্রশ্ন। কী প্রশ্ন করবে সে ট্যারটের কাছে? তার মনে তো শুধু ওই একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে– অন্ধকার টানেলে তার ভূতুড়ে অভিজ্ঞতা এবং তার আগের ও পরের ঘটনাবলী। সেই অনুভূতিগুলো এখনও মনের মধ্যে রয়ে গেছে বলেই চিন্তামুক্ত হতে পারছে না সাবরিনা। সে প্রশ্নের ব্যাপারে মনোসংযোগ করল *কীভাবে এসবের অবসান ঘটবে?*

কার্ড শাফল শেষ করে তাসের তাড়া টেবিলে দু'জনের মাঝখানে রাখল সাবরিনা। 'এখন কী?'

'তাসের তাড়াটি তিনটি স্তূপ করুন, ডান থেকে বামে, আপনার বাম হাত দিয়ে।'

নির্দেশ মাফিক কাজ করল সাবরিনা, শিরশিরে একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর।

বাম হাত দিয়ে স্তূপ তিনটা উল্টো করে রাখল পিটার। 'ট্যারট সাজানোর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে,' বলল সে, 'তবে আমরা সবচেয়ে কমন পদ্ধতিটা ব্যবহার করব– প্রাচীন কেলটিক পদ্ধতি।'

'প্রাচীন কেল্টদের যদি এটা কাজে লেগে থাকে তাহলে হয়তো আমারও কাজে লেগে যাবে,' বলল সাবরিনা। মুডটাকে হালকা করার চেষ্টা করছে সে, বড়বড় এই তাসের স্তূপ সত্যি ওকে কিছু বলতে পারবে এই অবিশ্বাসটা করতে চাইছে না।

পিটার শুধু হাসল, টেনে নিল প্রথম কার্ড, ওটা সে টেবিলের মাঝখানে কুইন অব কাপস-এর ওপর রাখল। কার্ডটি রাখার সময় বলল, 'এটা আপনাকে কাভার দেবে।' পরের কার্ডটি সে প্রথমটির সঙ্গে অনুভূমিকভাবে রেখে মন্তব্য করল,' 'এটা আপনাকে

বিপদ থেকে রক্ষা করবে।' সে আরও চারটে তাস দিয়ে একটা ক্রশের মতো করল। প্রতিটি কার্ড সাবধানে টেবিলের মাঝখানে রাখার সময় নানান মন্তব্য করে যেতে লাগল।

সবশেষে আরও চারটে কার্ড ক্রশের ডানে নিচ থেকে ওপরে খাড়া করে সারিবদ্ধভাবে রাখল। বলল, 'এবারে আপনার প্রশ্নের চূড়ান্ত জবাব আমরা পেয়ে যাব।'

সে টান মেরে দশম ও শেষ কার্ডটি তুলে নিল। চমকে গেল সাবরিনা। কার্ডের ছবিতে দেখা যাচ্ছে আগুন চোখের একটি সাদা ঘোড়ার পিঠে কালো বর্ম পরে বসে আছে একটি কংকাল। ঘোড়ার খুড়ের নিচে পড়ে রয়েছে একজন মৃত রাজা। ওটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছে এক মহিলা এবং একটি শিশু। কার্ডটির নিচে লেখা **মৃত্যু।**

সাবরিনা হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে টোকা মারল কার্ডে।

'মাই গড, এটার মানে কী?'

পিটার যেন একটু চমকে গেল। 'ওটা? ওহ্, ওটার প্রসঙ্গ পরে আসছি। ওতে যা লেখা আছে তা-ই যে সত্যি হবে এমন কিছু নয়।'

'আমিও তাই আশা করি,' বলল সাবরিনা।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে নিজের পেশাদারী চেহারায় ফিরে গেল পিটার। 'প্রথমে এ কার্ডটি নিয়ে কথা বলি যে কার্ডটি আপনার কুইন অব কাপসকে ঢেকে রেখেছে, এটি আপনার কর্মক্ষেত্র এবং সাধারণ পরিবেশের প্রস্তাবকে উপস্থাপন করছে। দেখতেই পাচ্ছেন এটি হলো থ্রি অব সোর্ডস। এখানে তরবারিগুলো একটি হৃদয়কে বিদ্ধ করছে। আর সেটি আপনার হৃদয়। নিজের রোমান্টিক লাইফ নিয়ে ঝামেলায় আছেন আপনি। ঝগড়াঝাটি কিংবা সেপারেশন ধরনের সমস্যা।'

ঝট করে একবার পিটারের দিকে তাকাল সাবরিনা, মনে পড়ে গেল আজ সকালে রবার্টের সঙ্গে ওর কথা কাটাকাটি হয়েছিল, সকালে পার্কিংলটে পিটারের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় সে কি এ বিষয়ে পিটারকে কিছু বলেছিল? হয়তো বলেছিল। সে কথা থেকে পিটার এখন এসব অনুমান করে নিচ্ছে।

পিটার ক্রশের ডানদিকের কার্ডটির দিকে ইঙ্গিত করল– মাথায় সুচালো হেলমেট পরা এক বলিষ্ঠ যুবক হাতে একটি কাপ ধরে আছে দৃঢ় মুষ্ঠিতে। 'তবে ভালো খবরও আছে। খবরটা হলো খুব নিকট ভবিষ্যতে আমরা নতুন এক প্রেমিককে দেখতে পাব। তরুণ, সংবেদনশীল, কুশলী। সে আপনার জন্য একটি মেসেজ নিয়ে আসবে। সম্ভবত কোনো আমন্ত্রণ।'

'নাকি কোনো প্রস্তাব?' জানতে চাইল সাবরিনা।

'হতে পারে, হতে পারে।' পিটার এরপর একে একে সাধারণ টার্মগুলো বলে

যেতে লাগল, জানালো একেকটি কার্ড কীসের প্রতিভূ হয়ে কাজ করছে। সে কার্ডে যা পড়ল বা বলল সে পড়েছে, সাবরিনার জীবনের অনেক ঘটনার সঙ্গেই তা মিলে যায়। অবশ্য পিটার লানডাউর মতো চতুর মানুষ সাবরিনা সম্পর্কে ইতিমধ্যে যা জেনেছে তা দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য একটি গল্প তৈরি করা তার জন্য কোনো ব্যাপারই নয়।

পিটার কথা বলছে তবে সাবরিনা লক্ষ করল বারবারই তার চোখ চলে যাচ্ছে সারির চতুর্থ কার্ডটির দিকে। ওটি ডেথ কার্ড।

'কোনো সমস্যা?'

'সমস্যা?' খুব দ্রুত বলে উঠল পিটার। 'আরে না, সমস্যা কীসের? হয়তো ট্যারট আপনার জন্য সঠিক পছন্দ ছিল না। আচ্ছা, আপনার রাশি যেন কী বললেন? তুলা, তাই না?'

'আমি মেষ রাশির জাতিকা,' বলল সাবরিনা। 'তবে প্রসঙ্গ ঘোরাবেন না, প্লিজ। সে ঘোড়ার পিঠের কংকালটির দিকে ইঙ্গিত করল। 'আমি এটার অর্থ জানতে চাই।'

'অন্যগুলোর অবস্থান না জেনে এবং একটির সঙ্গে অপরটির সম্পর্কের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে এ কথা বলা অসম্ভব যে–'

'ফালতু বাত ছাড়ুন, পিটার।' বলল সাবরিনা। 'এর অর্থটা কী আমাকে বলুন?'

আবার খুক খুক কেশে নিল পিটার। 'ওয়েল, এই পজিশনটি হলো কেলটিক লে আউটের দশ নাম্বার। এটি আমাদেরকে ফাইনাল ফলাফল বলে দেবে। অন্যান্য সমস্ত কার্ডের তথ্যের সারাংশের চূড়ান্ত জবাব।

'মৃত্যু?'

হাসার চেষ্টা করল পিটার কিন্তু মুখে হাসি এল না। একদিন সবাইকে তো মৃত্যুর কাছেই যেতে হবে, তাই না?'

সাবরিনা জবাবে কিছু বলল না। তার দৃষ্টি ফিরে গেল কালোবর্ম পরা ভয়ংকর চেহারাটির দিকে।

পিটার হঠাৎ সবগুলো কার্ড মিলিয়ে ফেলে একটা স্তূপ তৈরি করে ফেলল। 'মাঝে মাঝে সত্যিকারের রিডিং কিন্তু আসে না।' বলল সে। 'আর এরকম হামেশাই ঘটছে। আসুন, আবার নতুন করে শুরু করি?'

'না, ধন্যবাদ।' বলল সাবরিনা।

'আপনাকে আরেক গ্লাস ওয়াইন দিই? অন্য কোনো মিউজিক চালু করি। তারপর দু'জনে মিলে একটু গল্পটল্প করব।'

'আমার এখন যেতে হবে,' বলল সাবরিনা। 'আমি জামাকাপড় বদলাতে এখন পর্যন্ত বাড়িও যাইনি।'

সিধে হলো ও, সাথে সাথে পিটারও দাঁড়িয়ে গেল। 'আবার কি দেখা হচ্ছে?'

'কেন?'

'একজন পুরুষ একটি মেয়ের সঙ্গে কেন দেখা করতে চায়? ডেটিংয়ের জন্য, জানেনই তো।'

'আমি এ মুহূর্তে একজনের সঙ্গে জড়িত, পিটার।'

'রবার্ট ডানের সঙ্গে?'

'উমম।'

'ওর সঙ্গে কি আপনার এনগেজড হয়ে গেছে?'

'না, তা হয়নি।'

'তাহলে?'

'আমার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হলে ফোন দেবেন,' বলল সাবরিনা। 'ফোন বুকে আমার বাড়ির নাম্বার পাবেন। এস. স্টুয়ার্ট, বিচউড ড্রাইভ।'

'আমি ফোন করব,' বলল পিটার। বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিল সে সাবরিনাকে। সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে গেল ও।

ডাটসানে উঠে বসল সাবরিনা। অনেকক্ষণ হুইলের পেছনে বসে থাকার পরে স্টার্ট দিল ইঞ্জিন। এখানে আসাটা সত্যি নির্বোধের মতো কাজ হয়েছে, মনে মনে বলল ও। ট্যারট কার্ড! এসব সেই মানুষদের জন্য যারা ক্রিস্টাল বল এবং হাবিজাবি সব অপ্রাকৃতিক ব্যাপারে বিশ্বাস করে। পিটার লানডাউ আসলে কোনো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নয়, আর দশজনের মতোই সাধারণ মানুষ। আর সাবরিনা স্থির মস্তিষ্কের বুদ্ধিমতী এক যুবতী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোনো মহিলা নয়।

তবু সে কালো বর্ম পরা সাদা ঘোড়ার পিঠে বসা মৃত্যুর চেহারাটা ভুলতে পারছে না। ওটা যেন ফাঁকা চোখে তাকিয়ে ছিল সাবরিনার দিকে। কী ভয়ানক চাউনি! খুলি মুখটা চোখের সামনে ভাসছে ওর, ওটা ঝাপসা হয়ে মুছে গিয়ে ওখানে ফুটে উঠল স্টেশন ওয়াগনের সেই মহিলা চালকের ভীষণ মুখচ্ছবি।

মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাগুলো দূর করে দিতে চাইল সাবরিনা। গাড়িতে স্টার্ট দিল।

পিটার লানডাউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল মোড় ঘুরেছে সাবরিনার ডাটসান গাড়ি, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। সে বাড়িতে ঢুকল। সাগর থেকে কালো মেঘ ভেসে আসছে। ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে।

পিটার লাভসিটে গিয়ে বসল। যে টেবিলে সাবরিনার জন্য ট্যারট কার্ড রেখেছিল সেদিকে অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে রইল। জীবনে এই প্রথম এরকম কিছু ঘটল তার জীবনে, এই প্রথম রিডিং করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে সে।

ওর প্ল্যান ছিল সাবরিনাকে খুশি করার জন্য কিছু রিডিং দেবে, সূক্ষ্ম একটা পরামর্শ থাকবে তার জীবনে নতুন প্রেম আসছে। এ পরিকল্পনা অতীতে বহুবার

কাজে লেগেছে, অনেক মেয়ের সঙ্গে এভাবে বিছানায় গেছে পিটার। তবে সাবরিনার ব্যাপার ছিল ভিন্ন। শুরু থেকেই পরিচিত রুটিন মাফিক কাজ শুরু করা নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিল পিটার। যদ্দুর মনে পড়ে এই প্রথমবার কার্ডগুলো সত্যি তাকে কোনো ভবিষ্যদ্বানী করল। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বানী সে জানতে চায়নি।

আগে পিটার আটাত্তরটি কার্ডের মন গড়া সব ব্যাখ্যা দিত। যেসব ব্যাখ্যা শুনলে তার মক্কেলরা খুশি হয়।

আজ সে কোনোভাবেই কোনো দুসংবাদ দিতে চায়নি সাবরিনাকে। কিন্তু হাতে উঠে এল ওই মৃত্যু-কার্ড। যীশাস, সে কি এসব আজগুবি ব্যাপার বিশ্বাস করতে শুরু করেছে?

অলস ভঙ্গিতে সে তাসের তাড়াটি নিয়ে শাফল করল, তিনটে স্তূপ বানাল সে। বরাবরের মতো ম্যাজিশিয়ানের কার্ডটি বাছাই করল সে। এ কার্ডটি তাকে রিপ্রেজেন্ট করে। তারপর কেলটিক ক্রশ সাজাতে শুরু করল। কার্ডের অর্থ অনুসারে কাল্পনিক সব দারুণ গল্প রচনা করে সর্বদাই রিল্যাক্স বোধ করে পিটার।

ক্রশ থেকে ছয়টি কার্ড নিল সে। কপালে ভাঁজ পড়ল পিটারের। অনেকগুলো তরবারি, দ্বন্দ্বের সংকেত। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ কার্ড হলো নয়, দশ এবং পেজ অব সোর্ডস। এগুলো দুঃখ, বিষণ্নতা, দুর্ভাগ্য, যাতনা ইত্যাদির ইঙ্গিত বহন করে। এ থেকে সে ভালো কিছু গল্প তৈরি করবে কীভাবে?

পিটারের ইচ্ছে করছিল কার্ডগুলো সব ছুড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু মনের ভেতর থেকে কী যেন একটা বাধ্য করল ওকে কাজটা চালিয়ে যেতে। সে ভার্টিকাল রোতে রাখল সপ্তম, অষ্টম এবং নবম কার্ডটি।

প্রথমে এল দ্য ফুল, খাড়া পাহাড়ি খাদের কিনারা থেকে লাফ দেয়ার জন্য প্রস্তুত এক তরুণ। তারপর দ্য টাওয়ার। এ কার্ডের ছবিতে রয়েছে চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎসহ বজ্রপাত এবং বজ্রপাতের আঘাতে মৃত মানুষ। এরপর দ্য হ্যাঙ্গড ম্যান, একটি গাছে ঝুলছে ফাঁসির আসামী। ট্যারট তাসের তাড়ার সবচেয়ে অনিশ্চিত কার্ড। তবে এগুলো সবই অশুভ সংবাদ বহন করছে।

কিন্তু এসব কী করছে পিটার? এটা তো একটা খেলা, তাই না? সে কার্ডগুলোকে দিয়ে যা খুশি বলাতে পারে, নয় কি?'

আর মাত্র একটি কার্ড বাকি। দশম কার্ডখানা। অনেকক্ষণ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগল পিটার। নীরবে নিজেকে বলছে *ওটা তুমি তুলো না।* ওটা তুলে না দেখলে তো আর ওটার অস্তিত্ব থাকে না।

কিন্তু ওর আঙুলগুলো এগিয়ে গেল কার্ডটার দিকে। তাসের তাড়ার ওপর থেকে তুলে নিল ওটা। উল্টে দেখল। এবং অবাক হলো না। এটা ডেথ কার্ড।

চৌদ্দ

ওয়েস্ট লস এঞ্জেলেসে রিসিভিং হসপিটাল এর বেসমেন্টে ডা. অশোক চৌধুরীকে নিয়ে নেমে আসছে লিফট। যত নিচে নামছে ততই লিফটের ভেতরটা শীতলতর হয়ে উঠছে। অবশেষে থামল কার। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। টাইল বসানো হলওয়েতে পা দিতেই ঠান্ডায় কেঁপে উঠলেন ডা. চৌধুরী। শক্তিশালী ফ্লুরোসেন্ট বাতির উজ্জ্বলতায় নীলচে-সাদা দেখাচ্ছে বেসমেন্টের দেয়াল।

ডা. চৌধুরী দ্রুত দেয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে এগোলেন। দেয়ালে সারি সারি ভারি ড্রয়ার। একটি ড্রয়ার খোলা। ওতে সবুজ চাদর মোড়া একটি লাশ দেখা যাচ্ছে। চাদরের আড়াল থেকে বেরিয়ে রয়েছে একটি নগ্ন পা। বুড়ো আঙুলে ঝুলছে কার্ডবোর্ডের ট্যাগ।

হলওয়ের শেষ মাথায় পৌঁছে গেলেন ডাক্তার। এখানে একটি দরজা রয়েছে, ফ্রস্টেড গ্লাসের মাথায় লেখা প্যাথলজি ল্যাব। ভেতরে ঢুকতেই জীবাণু নিরোধক কড়া ওষুধের গন্ধ ঝাপটা মারল নাকে। ঘরে চারটে টেবিল। টেবিলগুলোর মাথায় ধাতব গ্রিলওয়ার্ক, নিচে দীর্ঘ, খোলা বাক্স, কাটাছেঁড়া করা লাশের শরীর থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্ত এতে ধরে রাখা হয়। প্রতিটা টেবিলের শেষে রয়েছে স্টেনলেস স্টিলের একটি সিঙ্ক, অপর প্রান্তে রয়েছে একটি ঝুলন্ত স্কেল, লাশের শরীর থেকে কেটে নেয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখানে ওজন করা হয়। তিনটে টেবিল খালি। চতুর্থ টেবিলে শুইয়ে রাখা হয়েছে মিসেস ইভন কার্লসনের নগ্ন দেহ।

চিফ প্যাথলজিস্ট ড. কারমিট ব্রিডলাভ রোগা পাতলা এবং হ্যাংলা, মাথা ভর্তি এলোমেলো চুল, দু'হাতে বুক বেঁধে লাশের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তার মুখের একপাশ দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে কাঠের একটি টুথপিক। লোকটিকে দেখলেই ডা. চৌধুরীর মনে হয় একে লাশ কাটাকাটির চেয়ে কোনো সেলুনে বসে পিয়ানো বাদকের ভূমিকাতেই মানাতো বেশি।

'হ্যালো, চৌডরি,' বললেন ব্লিডলাভ। 'এই বরফের বাক্সে তোমার আগমনের হেতু কী? ওপরের কাজকাম কি কমে গেছে?'

'কিছুক্ষণের জন্য,' হেঁটে প্যাথলজিস্টের পাশে চলে এলেন ডা. অশোক, তাকালেন মিসেস কার্লসনের লাশের দিকে।

‘এ লাশটি সম্পর্কে আমার বিশেষ কৌতূহল রয়েছে।’

কাঁধ ঝাঁকালেন ব্রিডলাভ। ‘এ মহিলা জাতিতে ককেশিয়ান, বয়স পঞ্চান্ন থেকে ষাট। পুরানো অস্ত্রপচারের চিহ্ন আছে শরীরে, সম্প্রতি গল ব্লাডার অপারেশন করা হয়েছে।’

‘তুমি কি অটোপসি করছ?’

‘করব,’ জবাব দিলেন ব্রিডলাভ। ‘কাগজ অনুসারে মৃত্যুর সময় মহিলার কাছে কোনো ডাক্তার ছিলনা।’

‘জানি আমি। মহিলা ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।’

‘তাই নাকি? দেখে তো মনে হয় না।’

‘হার্ট অ্যাটাক বা এরকম কিছু একটা হয়েছিল শুনলাম।’

‘পরীক্ষা করার সময়ই সব জানা যাবে,’ বললেন ব্রিডলাভ।

‘এ কাজ করোনারের না?’

‘সাধারণত তাই। তবে এ মুহূর্তে হাসপাতালে করোনার সংকট চলছে। অবশ্যি সময় এবং উপযুক্ত সম্মানী পেলে মাঝে মাঝে লাশ কাটা ছেঁড়া করতে আমার কোনো সমস্যা নেই।’

ম্যানিলা খামটির কথা মনে পড়ল ডা. অশোকের। তিনি ওটা ব্রিডলাভকে দিলেন। ‘এখানে পুলিশ রিপোর্ট আছে।’

‘ধন্যবাদ,’ টাইপ করা কাগজ দুটোয় চোখ বুলিয়ে অসন্তুষ্ট একটা ধ্বনি মুখ থেকে বেরিয়ে এল ব্রিডলাভের।

‘কী হলো?’ জিজ্ঞেস করলেন অশোক।

‘আরেকটা L.A.P.D কেস। অর্ডিনারি কিছু নয়।’

‘মানে?’

‘এ লাশের সঙ্গে এ রিপোর্টটি মিলছে না।’

ঘাড়ের পেছনে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো ড. চৌধুরীর।

‘এ কথা কেন বললে, কারমিট?’

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ফোল্ডারে একটা বাড়ি দিলেন প্যাথলজিস্ট। ‘রিপোর্ট অনুযায়ী মৃত মহিলা ওয়েস্টউডে একটি গাড়ি চালাচ্ছিল’– তাকালেন ইলেকট্রিক ওয়াল ব্লকের দিকে– ‘মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে।’

‘তো?’

‘তো, টেবিলে শোয়ানো মহিলা মারা গেছে কমপক্ষে বারো কিংবা চব্বিশ ঘণ্টা আগে।’

‘আর ইউ শিওর?’

'দিস ইজ মাই স্পেশালিটি, চৌডরি, ভুলে যেয়ো না। আমি মহিলার লাশ কাটার পরে এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত বলতে পারব। তবে একে দেখে মনে হচ্ছে আজ দুপুরে এর মৃত্যু ঘটেনি। মারা গেছে সে আরও আগে। ওর ত্বক পরীক্ষা করে দেখো।'

ডা. অশোক মহিলার বিবর্ণ বাহু স্পর্শ করলেন। মাংসটা রবারের মতো শক্ত এবং ঠান্ডা।

'স্বাভাবিক অবস্থায়,' বললেন ব্রিডলাভ, 'লাশের শরীরে খানিকটা তাপ থাকে বিশেষ করে দিনটি যদি হয় আজকের মতো উষ্ণ এবং এ মহিলার মতো কাপড় দিয়ে ঢাকা। এ উষ্ণতা বজায় থাকে ছয় থেকে বারো ঘণ্টা। কিন্তু এতো ম্যাকারেল মাছের মতো ঠাণ্ডা।' তিনি বুড়ো আঙুল দিয়ে লাশের একটি চোখের পাতা খুললেন। 'দ্যাখো একবার।'

মহিলার চোখ শুকনো এবং জ্যোতিহীন, কর্ণিয়ায় অস্বচ্ছ একটা আবরণ।

'যদি সত্যি ঘণ্টাখানেক আগে মারা যেত মহিলা, চোখের তারায় এখনও ফ্লুইড থাকত, চকচক করত চোখ।' বললেন ব্রিডলাভ।

'অন্য কোনো কারণে এরকম হতে পারে না?'

'হয়তো পারে তবে একে পরীক্ষা না করা পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না। এর বিষয়ে আরেকটি মজার তথ্য দিই তোমাকে। মহিলার পায়ের দিকে তাকাও।'

ডা. চৌধুরী প্যাথলজিস্টের আঙুল অনুসরণ করে ইভোন কার্লসনের পায়ের দিকে তাকালেন। মহিলার পায়ের পাতা এবং পায়ের নিচের অংশ গাঢ় বেগুনী-লাল রঙ ধারণ করেছে। ব্রিডলাভ লাশের শরীরের নিচে হাত ঢুকিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপুড় করে শোয়ালেন।

'এখন ওর পিঠটা দেখো।'

মহিলার পিঠ থেকে শুরু করে পায়ের গুল পর্যন্ত চামড়া অস্বাভাবিক বিবর্ণ।

'পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী মহিলার মৃত্যু ঘটেছে সম্ভবত: চিৎ হয়ে থাকা অবস্থায়।' বললেন ব্রিডলাভ।

'ঠিকই বলেছ। গাড়ি থেমে যাওয়ার পরে সে দরজা খুলে নেমে আসে, কয়েক কদম এগোবার পরে মাটিতে পড়ে যায়। কেউ তার লাশ স্পর্শ করেনি। অ্যাম্বুলেন্স আসা পর্যন্ত লাশটা চিৎ হয়ে পড়ে ছিল।'

'অ্যাম্বুলেন্সে ওরা লাশটাকে চিৎ করে শুইয়েই এনেছে।'

'সেটাই নিয়ম।'

'এবং তুমি এখানে এসে তাকে চিৎ হওয়া অবস্থাতেই দেখেছ।'

'তুমি আসলে কী বলতে চাইছ?'

'যদি সত্যি ওরকম ঘটনা ঘটে থাকে, যখন মহিলার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, থেমে যায় সার্কুলেশন, রক্ত তখন শরীরের নিচের অংশে নেমে আসার কথা। চিৎ হয়ে থাকা অবস্থায় ঘাড়ের পেছনের নিম্নস্থ ত্বকে প্রথমে, পরে কাঁধে এবং সবশেষে পিঠে রক্ত ছড়িয়ে পড়বে। শোল্ডার ব্লেড এবং নিতম্ব, যেখানে সাপোর্টিং সারফেসের দ্বারা চাপ খেয়ে আছে চামড়া, সেখানে রক্ত চলাচল থাকবে না। নিশ্চল রক্ত এখানে জমাট বেঁধে রইবে, ত্বকের রঙ হয়ে যাবে বর্ণহীন। তুমি দেখতেই পাচ্ছ, মহিলার পিঠে পোস্টমর্টেম লিভিডিটির (Postmortem lividity) কোনো চিহ্ন নেই তবে পায়ের পাতা এবং পায়ের নিচের অংশে অ্যাডভান্সড লিভিডিটির চিহ্ন রয়েছে।'

'লেকচারের জন্য ধন্যবাদ,' শুকনো গলায় বললেন ডা. চৌধুরী। 'কিন্তু এ দিয়ে তুমি কী বোঝাতে চাইছ আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

প্যাথলস্টি একটা আঙুল তুললেন। এর মানে বোঝাতে চাইছি মহিলার সম্ভবতঃ গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যু হয়েছে। যদিও তার গলায় রশির ফাঁসের কোনো চিহ্ন নেই।'

'কিন্তু আমরা জানি সে গলায় দড়ি দিয়ে মরেনি,' অধৈর্য কণ্ঠে বললেন ডা. চৌধুরী।'

ব্রিডলাভ দ্বিতীয় আঙুলটি তুললেন, 'তাহলে আমরা দ্বিতীয় সম্ভাবনার দিকে যেতে পারি।' চোখ টিপলেন তিনি।

'বলে ফেলো, কারমিট।'

'এ মহিলা মৃত্যুর পরেও কয়েক ঘণ্টা চলে ফিরে বেড়িয়েছে।'

প্যাথলজিস্টের হাসি প্রতিধ্বনি তুলল ল্যাবরেটরির দেয়ালে। তাঁর দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন ডা. চৌধুরী।

'ঠাট্টা করছিলাম,' বললেন ব্রিডলাভ।

'বাহ্, চমৎকার ঠাট্টা। বেড়ে ঠাট্টারে ভাই, তা তুমি অটোপসি করবে কখন?'

'মহিলার স্বামী I.D তে হাজির হলেই।'

'আচ্ছা। ফলাফল শোনার জন্য অপেক্ষায় রইলাম।'

'নিশ্চয়। আমাকে ফোন দিও।'

ল্যাবরেটরি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ডা. চৌধুরী। রেফ্রিজারেটেড ড্রয়ারগুলোর পাশ কাটালেন। ওগুলো এখন সব বন্ধ। তিনি লিফটে চড়লেন। লিফট ওপরে উঠছে, তাপমাত্রা ততই বাড়ছে। ডা. চৌধুরীর মনে হলো তিনি যেন জীবিত মানুষের পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন।

ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড এখনও সুনসান। তরুণ রেসিডেন্ট একটি বাচ্চা মেয়ের পা থেকে স্প্লিন্টার তুলছে। মেয়েটি তার দিকে ভয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

হাতটাত ধুয়ে মেশিনে একটা মুদ্রা ফেললেন ডাক্তার কফি পান করার জন্য।

তেতো স্বাদের কফি নিয়ে ফিরে এলেন অফিস কিউবিকলে। ডেস্কে বসে ভাবতে লাগলেন মৃত মিসেস ইভন কার্লসনের কথা। মহিলা নিচে লাশ হয়ে অটোপসি টেবিলে পড়ে আছে। মহিলা নাকি বহুক্ষণ আগে মারা গেছে। তাহলে সে কী করে সাবরিনা স্টুয়ার্টকে গাড়ি চাপা দিতে যাচ্ছিল?

একটা সিগারেট ধরালেন ডাক্তার, অভ্যাসবশত জানালার নিচে বসে ধূমপান করতে লাগলেন যাতে কেউ দেখে না ফেলে। আজ সকালে সাবরিনা তাঁকে পানিতে ডুবে যাওয়ার পরে হ্যালুসিনেশনের অভিজ্ঞতার যে বয়ান দিয়েছিল তার সঙ্গে এই অদ্ভুত গাড়ি দুর্ঘটনার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা ভেবে দেখতে চাইলেন। ওই মৃত্যু অভিজ্ঞতা হ্যালুসিনেশন ছাড়া আর কী? দুটোর মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র রয়েছে? সাবরিনা তাঁকে ঠিক কী বলেছিল তা স্মরণ করতে মনোসংযোগের চেষ্টা করলেন অশোক চৌধুরী।

অ্যালার্ম বেলের কর্কশ আওয়াজে ছিঁড়ে গেল চিন্তার সুতো। সাইরেনের বিলাপ করতে করতে হাসপাতালের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে দুটো অ্যাম্বুলেন্স। সানডিয়েগো ফ্রিওয়েতে গ্যাসোলিন ট্যাঙ্ক ট্রাক বিস্ফোরণে আহতদের নিয়ে এসেছে। পরবর্তী কয়েকঘণ্টা অগ্নিদগ্ধ মানুষগুলোকে নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ডা. চৌধুরী যে সাবরিনা এবং নিচতলার মৃত মহিলার কথা তাঁর মনেই থাকল না।

পনের

শুক্রবার সকালে ঝিমঝিমে একটা অনুভূতি নিয়ে ঘুম থেকে জাগল সাবরিনা স্টুয়ার্ট। গত রাতে বিশ্রী সব দু:স্বপ্ন দেখেছে। তবে স্বপ্নগুলোর কথা মনে করতে গিয়েও পারল না। সবগুলো যেন পিছলে বেরিয়ে গেছে মস্তিষ্ক থেকে। মাথার ভেতরের মাকড়সার জালটা কিছুক্ষণের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল, মনে পড়ে গেল গত দুই দিনের অস্থির অভিজ্ঞতাগুলোর কথা। সে জোর করে ছবিগুলো মন থেকে বের করে দিয়ে এখনকার করণীয় কাজগুলোর দিকে মনোযোগ দিল।

অভ্যাসবশত: একটা গড়ান দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল সাবরিনা। সোয়া সাতটা বাজে। পাঁচ মিনিট পরেই বিপবিপ শব্দে বেজে উঠবে অ্যালার্ম। সাবরিনা বোতাম টিপে বন্ধ করে দিল অ্যালার্ম, চালু করল রেডিও। একজন ডিস্ক জকি বকবক শুরু করে দিল। তবে তার কথায় মনোযোগ দিল না সাবরিনা। সে হাত বাড়িয়ে বেডরুমের জানালাগুলোর পর্দা টেনে দিল। মলিন আকাশ। জুন মাসের আকাশ তো মেঘাচ্ছন্ন থাকবেই। সাবরিনা আরও পাঁচ মিনিট চাদরের তলায় আরাম করে শুয়ে রইল, তারপর নেমে পড়ল বিছানা থেকে।

গায়ে রোব জড়িয়ে দরজা খুলে বাইরে এল। সুতো দিয়ে বাঁধা ভোরের *টাইমস* পত্রিকাটি তুলে নিল। খবরের কাগজটি নিয়ে ঘরে চলে এল ও, চোখ বুলাল হেডলাইনগুলোয়। তেলআবিবে সন্ত্রাসী বোমা হামলা হয়েছে, মেক্সিকো সিটিতে ছাত্রদের বিক্ষোভ এবং ওয়াশিংটনে একজন কংগ্রেসম্যানকে তিরস্কার করা হয়েছে। গতানুগতিকতার বাইরে কোন খবর নেই।

কিচেনে ঢুকল সাবরিনা। ইলেকট্রিক কফিপট চালিয়ে দিল, আগের রাতেই পটে কফি আর পানি মিশিয়ে রেখেছিল ও। বেডরুমে ফিরে এল সাবরিনা, রোব আর পাজামা খুলে শাওয়ারের নিচে মেলে দিল নিজেকে।

প্রতিদিনের রুটিনে ফিরে এসে ভালো লাগছে ওর। গত আটচল্লিশ ঘণ্টার ভয়ংকর অভিজ্ঞতা শেষে নিত্যদিনের পরিচিত কর্মকাণ্ড ওকে স্বস্তি দিচ্ছে। আজ ও কাজে যোগ দেবে। সে আনন্দে শাওয়ারের নিচে ভিজতে ভিজতে গুণগুণ করছে সাবরিনা। ওর কাজটা মজার এবং চ্যালেঞ্জিং এবং সাবরিনা নিজের কাজে বেশ দক্ষতার পরিচয়ও দিয়ে আসছে। যখন ওর বস ট্রান্সফার হবে, এবং সেটা দু'তিন

বছরের মধ্যেই সম্ভবত ঘটবে তখন সাবরিনার অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারের পদটা পাবার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।

শাওয়ার বন্ধ করে তোয়ালে দিয়ে গা মুছে নিল সাবরিনা। ক্লজিট খুলে বের করল পশমি স্কার্ট এবং ভেস্ট। খবরের কাগজটি নিয়ে কিচেনে পা বাড়াল, চলার পথে ঘরের ছোট ছোট জিনিসগুলো ছুঁয়ে দেখছে, ওগুলোর পরশ তাকে আনন্দ দিচ্ছে।

হলিউডের বিচউড ড্রাইভে কোলাহলমুক্ত একটি এলাকায় ছোট্ট একটি বাড়িতে বাস করে সাবরিনা। এটি মূলত একটি বৃহদায়তন এস্টেটের গেস্ট কটেজ ছিল। মূল বাড়িটি কয়েক বছর আগে ভেঙে ফেলে অ্যাপার্টমেন্ট ভবন তৈরি করা হয়েছে, এরপরে গেস্ট হাউজটির পালা। এখানে পুরো একটি বাড়িতে বাস করার স্ফূর্তি নিয়ে আছে সাবরিনা। বাড়িটি আসলে একটি বিশাল কক্ষ বিশিষ্ট। তবে ট্রেনের বগির মতো খুপরি তৈরি করা হয়েছে: লিভিং রুম, ডেন, বেডরুম, কিচেন ইত্যাদি। এ বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা খুবই কঠিন কাজ আর শীতের সময় সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম চালু রাখা বেশ ব্যয়বহুল, এছাড়া মুষলধারে বর্ষণে ছাদের ফুটো থেকে পানিও পড়ে, তবে কারও সঙ্গে ঘর ভাগাভাগি করতে হচ্ছে না এটাই যা শান্তি। তাছাড়া, সামনেই একটি ফুলের বাগান আছে। সেখানে নানান ফুল ফুটে থাকে। রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ফুলের বাগানটির যত্ন নেয়।

দু'স্লাইস টোস্ট তৈরি করে কফি ঢেলে নিল সাবরিনা, বসল *টাইমস* নিয়ে। দুসংবাদগুলো এড়িয়ে গিয়ে খেলার খবরের পাতায় চলে গেল। খেলার খবর পড়তে পড়তে আরেক কাপ কফি পান করল ও। তারপর ধরাল দিনের প্রথম সিগারেট। এমন সময় কিচেন ডোরে মৃদু খসখস শব্দ হলো। উঠল সাবরিনা, খুলল দরজা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এক কান ছেঁড়া স্থূলকায় এক কালো বেড়াল। যখন ছানা ছিল, ওর মা ওকে ফেলে রেখে গিয়েছিল বারান্দায় তবে নরম হৃদয়ের পড়শীদের ফেলে দেয়া খাদ্য খেয়ে আর বুদ্ধির জোরে জীবন সংগ্রামে ভালোভাবেই টিকে গেছে সে।

'দুঃখিত, বানডিডো। আজ তোর জন্য কিছু নেই রে,' বলল সাবরিনা।

জ্বলজ্বলে সবুঝ চোখ তুলে সাবরিনার দিকে তাকাল কালো বেড়াল। ওর কথা যেন বিশ্বাস করতে পারেনি।

'আচ্ছা, দাঁড়া একটু। দেখি উচ্ছিষ্ট কিছু আছে কিনা।' কিচেন ডোরের পর্দা সরিয়ে দিতেই লাফ মেরে ভেতরে প্রবেশ করল বেড়াল। রেফ্রিজারেটর খুঁজে এক টুকরো পনির পেল সাবরিনা। ওটাকে ছুরি দিয়ে টুকরো করে একটা পিরিচে সাজিয়ে বেড়ালটার সামনে রাখল। কালো বেড়াল আগে পনিরের গন্ধ শুঁকল, তারপর একটা থাবা বাড়িয়ে খাবারের গায়ে মৃদু ঠেলা দিল, শেষে গলাধকরণ করল খাদ্য।

'যাক তুই এসেছিস খুব খুশি হয়েছি,' বলল সাবরিনা।

সে বাথরুমে ঢুকে মুখে মেকআপ চড়াল, তারপর বেরিয়ে এসে বেড়ালটাকে বিছানা থেকে তাড়িয়ে দিল। আরাম পেয়ে ঘুমের ভান করছিল মার্জার। এরপর সাবরিনা রওনা হলো অফিসে।

এ বাড়িটি সাবরিনার পছন্দ হওয়ার অন্যতম কারণ এখান থেকে খুব সহজে ওর অফিসে যাওয়া যায়। ভাইন স্ট্রিট থেকে সান্তামোনিকায় চলে এল ও, তারপর বেভারলি হিলস হয়ে পশ্চিমে সেঞ্চুরি সিটির দিকে চলল। এখানে টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের অফিস। সে সঙ্গে আকাশছোঁয়া অসংখ্য ভবন। এরকম একটি ভবনে সাবরিনার অফিস। নিজ অফিস ভবনের দিকে গাড়ি নিয়ে বাড়ল সাবরিনা। রাস্তার অন্যান্য গাড়িগুলো ভূগর্ভস্থ পার্কিং এরিয়ার দিকে এগুচ্ছে। ট্রাফিক জ্যামের কারণে সাবরিনা গাড়ি থামিয়েছে, স্কেটবোর্ড রোলারে চেপে একটি ছেলে এসে দাঁড়াল পাশে। হাতে ফুলের স্তবক– লাল গোলাপ এবং গোলাপি কার্নেশন। প্রতিটি তোড়ায় বারোটি করে ফুল টিসু পেপার দিয়ে মোড়ানো।

'হাই সাবরিনা,' বলল ছেলেটি। 'কাল যে তোমাকে দেখলাম না। অসুস্থ ছিলে?'

'হ্যালো, ডেভি। না, অসুস্থ ছিলাম না। ছুটি নিয়েছিলাম।'

'ভালো,' সাবরিনার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল ছেলেটি। ওর বয়স চোদ্দ বছর হলেও মনটা এখনও শিশুর মতোই রয়ে গেছে।

'তোমাকে দেখে খুব ভাল্লাগছে আমার,' বলল ডেভি। তোড়া থেকে একটি গোলাপ নিয়ে সাবরিনাকে দিল। 'এটা তোমার জন্য।'

পার্সে খুচরো পয়সা খুঁজতে খুঁজতে সাবরিনা লক্ষ করে ওর সামনের গাড়িটি স্টার্ট নিতে শুরু করেছে।

'ওটার জন্য তোমাকে পয়সা দিতে হবে না,' বলল ছেলেটি। এমনিই দিলাম।'

'অনেক ধন্যবাদ, ডেভি।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

একটা প্যানেল ট্রাক সাঁই করে ট্রাফিক লেন পার হয়ে গেল ছেলেটার পেছন দিয়ে। আঁতকে উঠল সাবরিনা।

'তোমার জন্য আমার দুশ্চিন্তা হয়, ডেভি। এমন ব্যস্ত রাস্তার মধ্যে রোলার নিয়ে ছোটাছুটি করো।'

'আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। আমি অ্যাক্সিডেন্ট করব না।'

'তবু সাবধানের মার নেই।'

'আচ্ছা, সাবধানে থাকব।'

সারিবদ্ধ গাড়িগুলো চলা শুরু করল, আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিংয়ের গুহার মতো এন্ট্রান্সের দিকে এগুলো সাবরিনা। সে একটি স্লটে তার কোডেড পার্কিং পাস

ঢোকাতেই ক্রস আর্ম ব্যারিয়ারটি উঠে গিয়ে ওর গাড়ি প্রবেশের সুযোগ করে দিল। সাবরিনা ঢাল বেয়ে দ্বিতীয় সাবলেভেলে চলে এল, এখানে তার কোম্পানি তাদের কর্মচারীদের গাড়ি পার্ক করার জন্য জায়গা সংরক্ষিত করে রেখেছে। গাড়ি থেকে নামল সাবরিনা, ডেভির দেয়া গোলাপটি নাকে নিয়ে শুঁকল। রাতে, বাড়ি ফেরার পথে একটি তোড়া কিনবে ঠিক করল।

লিফটে চেপে নিজের ফ্লোরে চলে এল সাবরিনা। সবাই ওকে সোল্লাসে স্বাগত জানাল যদিও মাত্র একদিন অফিস কামাই করেছে সে। অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার কিছু লেআউট রেখে দিয়েছিল সাবরিনাকে দেখানোর জন্য। কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাবরিনা।

ষোলো

দ্রুত কেটে যেতে লাগল সময়। কাজ করতে ভালোই লাগছিল সাবরিনার কিন্তু একই সঙ্গে কী যেন একটা উদ্বেগ ওকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। হঠাৎ উদ্বেগের কারণটা ধরতে পারল ও। রবার্ট। গতকাল সকালে ওর বাড়ি থেকে চলে আসার পরে আর ওর সঙ্গে কথা হয়নি সাবরিনার। আর রবার্টের সঙ্গে কথা কাটাকাটিটাও খুব একটা মনোরম ছিল না। কিন্তু রবার্ট কেন ওকে ফোন করল না?

গতকাল অবশ্য খুবই ঝামেলার একটা দিন গেছে, রবার্ট ওকে ফোন করে থাকলেও সাবরিনা তখন তো বাসায় ছিল না। রবার্টকে গতরাতে ফোন করতে পারত সাবরিনা, কিন্তু ডা. চৌধুরীর কাছে পরীক্ষার জন্য যাওয়া, সেই উন্মাদ মহিলার গাড়ির তলে প্রায় চাপা পড়া, পিটার লানডাউর সঙ্গে ট্যারট কার্ড নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি নানান কারণে ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গিয়েছিল সাবরিনা। তাই রাতে বাড়ি ফেরার পরে আর কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয়নি।

বেলা তিনটার সময় কাজে বিরতি দিল সাবরিনা। ফোন তুলে টরেন্সে, রবার্টের কোম্পানি ডাটাট্রনের নাম্বারে ডায়াল করল। এমনিতে কাজের সময় রবার্টকে বিরক্ত করা মোটেই পছন্দ করে না সাবরিনা তবে রবার্ট ওকে কখন ফোন করবে সে আশায় বোকার মতো বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

ফোন ধরল রবার্টের সেক্রেটারি। লাল চুলের সুশ্রী চেহারার মেয়েটিকে সাবরিনা চেনে। দু'একবার মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়েছে। 'হাই, ভিকি, সাবরিনা স্টুয়ার্ট বলছি। রবার্ট আছে?'

'আজ সারাদিন উনি অফিসে আসেননি। সাবকন্ট্রাক্টরদের নিয়ে বাইরে ব্যস্ত আছেন।'

'ওহ্। ওর সঙ্গে দেখা হলে আমাকে একটা ফোন করতে বলবে?'

'বলব। তবে আজ উনি না-ও ফিরতে পারেন।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

অফিস ছুটির প্রহর কাছিয়ে আসছিল বলে শনিবার উইকএন্ড। খুব হতাশ বোধ করছিল সাবরিনা। রবার্ট ওকে ফোন করেনি। যদিও ওদের মধ্যে কোনো ফরমাল অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই তবু উইকএন্ডের দুটো দিন দু'জনে মিলে কাটানো একটা নিয়মিত রুটিনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ও আশা করল গতকালকের ছোট্ট ঝগড়াটি শেষতক বেলুনের মতো ফুলে গিয়ে ওদের সম্পর্কের কোনো ছন্দপতন ঘটাবে না।

সাবরিনার ভেবে একটু অবাকই লাগছিল রবার্ট ডানকে নিয়ে এত চিন্তা করছিল বলে। স্বাধীনচেতা সাবরিনা ভালো চাকরি করে, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল তবু তার মনে

হয় এ সাফল্য যদি কোনো পুরুষের সঙ্গে শেয়ার করা না যায় তাহলে তা অর্থহীন। আর সে মানুষটি যদি হয় রবার্টের মতো ভদ্র, পরিশীলিত, মহৎ হৃদয়ের কেউ তবে তো কথাই নেই।

পাঁচটা বেজে গেল তবু ফোন এল না।

আর্ট ডিপার্টমেন্টের একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল সাবরিনার ডেস্কের সামনে।

'মার্গারিটি খেতে আমরা ক'জন মিলে সিনর পিকোতে যাচ্ছি।' বলল সে। 'তুমি যাবে?'

'না, ধন্যবাদ,' বলল সাবরিনা। 'সোমবার সকালের মধ্যে কতগুলো কপি রেডি করতে হবে প্রিন্টারের জন্য। কাজেই আর কিছুক্ষণ অফিসে থাকতে হচ্ছে আমাকে।'

'তবু আগে ভাগে কাজ শেষ হলে চলে এসো কেমন?

হাসল সাবরিনা। তার মানে সে যেতে পারে আবার না-ও যেতে পারে। শুক্রবার কাজ শেষে কোম্পানির সবাই মিলে একটু স্ফূর্তিটুর্তি করে। এসব পার্টিতে যেতে পছন্দই করে সাবরিনা। তবে আজ পার্টিতে যাওয়ার মুড নেই ওর।

যে কপি ওকে লিখতে হবে সেটা খুব কঠিন কিছু নয়। আধঘণ্টার মধ্যে কাজ সেরে ফেলল ও। OUT লেখা বাক্সে রেখে দিল কপি। প্রকাণ্ড খালি অফিসটি যেন ওকে চারপাশ থেকে চেপে ধরছিল। এখন সে পালাতে পারলেই বাঁচে। সিকিউরিটি গার্ডকে শুভরাত্রি বলে এলিভেটরে ঢুকল সাবরিনা। নেমে এল সাব-বেজমেন্টে।

এ ভবনে যারা কাজ করে তাদের বেশিরভাগ চলে গেছে। এখনও ডিনার করার সময় হয়নি। সাবরিনা কংক্রিটের গুহায় জুতোর শব্দ তুলে নিজের গাড়ির দিকে কদম বাড়ল।

চাবি বের করে ডোর লকে ঢুকিয়েছে, পেছনে ছুটন্ত পদ শব্দে জমে গেল। পাঁই করে ঘুরল সাবরিনা। আইল ধরে একজন লোক ছুটে আসছে ওর দিকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে এল রবার্ট ডান। ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল সাবরিনার সামনে। ছোটার ক্লান্তিতে লাল হয়ে গেছে মুখ।

'ভয় পাচ্ছিলাম তোমাকে বোধহয় পাবোই না,' বলল সে। তোমার অফিসে গিয়েছিলাম। সিকিউরিটির লোকটা বলল তুমি এইমাত্র বেরিয়ে গেছ।'

'কী ব্যাপার, রবার্ট? জরুরি কিছু?'

'অবশ্যই জরুরী,' সে টান মেরে বুকে নিয়ে এল সাবরিনাকে, পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল। সাবরিনার শরীরও সাড়া দিল। যখন বিচ্ছিন্ন হলো দু'জনে, সাবরিনার চোখে জল এসে গেছে।

'আই লাভ ইউ, লেডি,' বলল রবার্ট। 'এভরি আওয়ার মিসড য়ু।'

'মাত্র তো একটা দিন।'

'তাতে কী? কালকের ঘটনার পরে আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল, জানো? ভাবছিলাম তোমাকে তো বলা হয়নি আমার জীবনে তুমি কতটা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ।'

'তুমিও,' হেসে উঠে ওকে জড়িয়ে ধরল সাবরিনা। 'ডাউনটাউনে তোমাকে ফোন করেছিলাম।'

'আমি আজ সারাদিন অফিসের বাইরে ছিলাম। নানান মিটিং ছিল। আর ফোন করার কোনো সুযোগও পাইনি। যাক বাবা, তোমাকে শেষ পর্যন্ত পেলাম তো! খুব ভাল্লাগছে আমার।

'আমারও।'

'উইকএন্ডের জন্য কোনো প্ল্যান আছে?'

'থাউজেন্ড পিসের নতুন একটি জিগস্ পাজল রহস্যের মীমাংসা করব ভাবছিলাম। তবে এরচেয়ে ভালো কোনো প্রস্তাব পেলে ভেবে দেখতে পারি।'

'পাহাড়ে যাবে?'

'তুমি আর আমি? পুরো উইকএন্ড?

'ইয়াহ। বিগবিয়ারে একটা কেবিন ভাড়া করব দু'জনে মিলে। সেখানে কোনো পার্টি, ডিস্কো কিংবা সুইমিং পুল থাকবে না শুধু তুমি আর আমি ছাড়া।'

'বাহ্, দারুণ মজা হবে।'

'হ্যাঁ। আমার গাড়িটা বাইরে আছে। আমি তোমার পিছু পিছু আসছি। তুমি বাড়ি ফিরে একটা ব্যাগ গুছিয়ে নাও। তারপর দু'জনে মিলে ভোঁ।'

সাবরিনা ওর গাড়িতে তুলে নিল রবার্টকে। রাস্তায় নামিয়ে দিল। রবার্ট গেল নিজের গাড়ি নিয়ে আসতে। কিশোর ফুল বিক্রেতা ডেভি এসে হাজির হলো তার স্কেটবোর্ডে চড়ে, দাঁড়াল সাবরিনার গাড়ির পাশে।

'তুমি আজ সবার শেষে অফিস থেকে বেরিয়েছ, সাবরিনা।'

'তুমি সবসময় আমাদের বিল্ডিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাক নাকি কে আসে যায় দেখতে?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'শুধু যাদেরকে পছন্দ করি তাদের জন্য তাকিয়ে থাকি। তোমাকে খুব খুশিখুশি লাগছে।'

'আচ্ছা? হ্যাঁ, এই মুহূর্তে আমি খুব ভালো আছি, ডেভি।

তোমার কাছে কয়টা ফুলের তোড়া আছে?'

'মাত্র দুটো- একটা গোলাপ ফুলের অন্যটি কার্নেশনের।'

'আমাকে দুটোই দাও।'

জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ফুলের তোড়া দুটো নিল সাবরিনা। দাম শোধ করে দিল ডেভিকে। রবার্ট এসে পড়েছে তার কামারো গাড়ি নিয়ে। সাবরিনার গাড়ির পেছন থেকে হর্ন দিচ্ছে। সাবরিনা আগ বাড়ল। হলিউডকে ওর খুব উষ্ণ এবং প্রাণবন্ত লাগছে। সামনের সাপ্তাহিক ছুটিটা অকস্মাৎ ওর কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, দূর হয়ে গেল মনের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কালো মেঘগুলো।

সতের

শনিবারের সকালে, অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে টেনিস বলের ঠকঠক শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ডা. অশোক চৌধুরীর। তিনি রাতের বেলা স্লাইডিং গ্লাস ডোরটা খুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তাজা বাতাসের জন্য। তাঁর স্ত্রী তাঁকে জানালা খোলা রেখে ঘুমানোর অভ্যাসটা করিয়েছে। শীত এবং গ্রীষ্ম দু'ঋতুতেই বাড়ির জানালা খোলা রেখে ঘুমান ডা. চৌধুরী। নইলে তাঁর কাছে সহজে ধরা দিতে চায় না নিদ্রাদেবী।

একটা গড়ান দিয়ে বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা অ্যালার্ম ক্লকের দিকে চোখ কুঁচকে তাকালেন তিনি। সাড়ে আটটা বাজে। সামনে সম্পূর্ণ বেকার একটি দিন পড়ে রয়েছে। তবে স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির আগে বাচ্চাগুলো যখন ছোট ছিল শনিবারটি সবসময়ই 'ফ্যামিলি ডে' ছিল ডা. চৌধুরীর কাছে।

তিনি আর ক্যারোলিনা বাচ্চাদেরকে নিয়ে পিকনিকে যেতেন কিংবা ঘুরে আসতেন সাগর সৈকত থেকে অথবা ঢুঁ মারতেন ডিজনিল্যান্ডে। তবে বাচ্চারা বড় হওয়ার পরে নিজেদের বন্ধুবান্ধব খুঁজে নেয়, আনন্দ করার উৎসগুলোও নিজেরাই সন্ধান করে নিত। তখন স্ত্রীকে নিয়ে লসএঞ্জেলেস শহরের অলি গলিতে ঘুরে বেড়াতেন ডা. চৌধুরী। একবার ছুটিতে সবাইকে নিয়ে বাংলাদেশ থেকেও ঘুরে এসেছিলেন। তখন তাঁর মা বেঁচে ছিলেন।

এসব স্মৃতি এখনও দোলা দেয় মন। তবে স্মৃতিচারণ করে কী লাভ? মনকে তিরস্কার করেন ডা. চৌধুরী। স্মৃতি সর্বদাই বেদনাদায়ক। তিনি বিছানা থেকে নেমে পড়লেন। মিনিট পনেরো কিছু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করলেন তারপর স্নান সেরে নিলেন। গলফ খেলার জন্য আজকের দিনটি খুবই উপযুক্ত কিন্তু ক্যারোলিনার কাছ থেকে চলে আসার পরে তিনি আর ক্লাবমুখো হননি। যদিও লোকে এ বিষয়ে তাঁকে কখনও প্রশ্ন করেনি তবু তাদের চোখমুখ দেখে বোঝা যায় দু'জনের ছাড়াছাড়ির কারণ জানতে তারা খুবই আগ্রহী। আর তাদেরকে এসব বিষয় ব্যাখ্যা দিতে মোটেই আগ্রহী নন ডা. চৌধুরী।

গতরাতে ভালো ঘুম হয়নি তাঁর। দু:স্বপ্ন দেখেছেন। দাড়ি কামাতে কামাতে স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। স্বপ্নে ইভন কার্লসনকে দেখেছিলেন তিনি। জেগে থাকেন কিংবা ঘুমিয়ে, যে মহিলার মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে দশ/বারো ঘণ্টা আগে, সে কী করে গাড়ি চালায় এবং হার্ট অ্যাটাক করে আবার মারা যায়, এ অদ্ভুত ব্যাপারটা

কিছুতেই মাথা থেকে দূর করতে পারছেন না ডা. অশোক।

রেফ্রিজারেটরে নাশতা খাওয়ার মতো কিছুই নেই দেখে তিনি কাছের এক রেস্টুরেন্ট স্যাম্বোতে ঢুকলেন। এক কপি টাইমস কিনে নিয়েছিলেন রাস্তায়, সসেজ আর ডিম সহযোগে ব্রেকফাস্ট সারতে সারতে পত্রিকাটির পাতায় চোখ বুলাতে লাগলেন। ইভন কার্লসন কিংবা অ্যাক্সিডেন্ট বিষয়ে কোনো খবর নেই। অবশ্য লস এঞ্জেলেসের রাস্তায় এ ধরনের সাধারণ মৃত্যু সংবাদ খবরের কাগজে খুব কমই ছাপা হয়।

নাশতা সেরে স্কাই হাইতে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলেন ডা. চৌধুরী। টগবগে তরুণদের দেখে আজ সকালে কেন জানি তিনি একটু হতাশই বোধ করছেন। এদের ভাবচক্কর দেখে মনে হয় এরা নিজেদেরকে নিয়ে খুব সন্তুষ্ট, তাদের জীবন কোন পথে চলেছে সে ব্যাপারে সকলেই বড্ড আত্মবিশ্বাসী। ডা. চৌধুরী ঘরে ঢুকে মেডিকেল জার্নাল নিয়ে বসলেন।

তবে চিকিৎসা সাময়িকীগুলোতে বেশিক্ষণ মন বসাতে পারলেন না তিনি। ওয়েস্ট লস এঞ্জেলেস রিসিভিং হসপিটালে ফোন করলেন। সুইচ বোর্ড অপারেটরকে বললেন ডা. ব্রিডলাভের লাইন দিতে। কিছুক্ষণ খুটখাট শব্দ আর গুঞ্জনধ্বনি শেষে প্যাথলজিস্টের সাড়া মিলল।

'হ্যালো, কারমিট। আমি অশোক চৌধুরী বলছি।'

'হ্যাঁ, চৌডরি বলো, তোমার জন্য কী করতে পারি?'

'গতকাল বিকেলের দিকে ইভন কার্লসন নামে এক মহিলার লাশ এসেছিল, মনে আছে?'

'মহিলা ককেশিয়ান, বয়স সাতান্ন।'

'হ্যাঁ, সে-ই। তুমি ওর অটোপসি করেছ?'

'গত রাতেই করেছি।'

'কী পেলে?'

'একটু ধরো। কাগজটা নিয়ে আসি।'

শক্ত কিছুর ওপর রিসিভার রাখলেন ব্রিডলাভ, শব্দ হলো ঠন্ করে। জানালা দিয়ে টেনিস খেলোয়াড়দের দেখতে দেখতে ডা. ব্রিডলাভের ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন অশোক।

'এইতো পেয়েছি,' একটু পরেই প্যাথলজিস্টের কণ্ঠ শোনা গেল আবার। 'মৃত্যুর কারণ হলো ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন। শরীরে লো-টেনশন কারেন্ট বয়ে যাওয়ার সময় তাৎক্ষণিক কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের শিকার হয় মহিলা।'

'তার মানে মহিলা বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছে?'

'ঠিক তাই?'

'আর মৃত্যুর সময়?'

'বুধবার মাঝরাতে।'

'কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট তো তা বলছে না। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে বহু মানুষ মহিলাকে জীবিত দেখেছে।'

'আমার মনে হয় অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্টে কোনো গড়বড় আছে। এরকম ভুল রিপোর্ট এটাই প্রথম নয়, আগেও অনেকের ক্ষেত্রে এসেছে। অটোপসি কখনও মিথ্যা বলে না।'

'লাশ সনাক্ত করেছিল কে?'

'দাঁড়াও দেখি...' লাইনের অপর প্রান্তে কাগজ ওল্টানোর খসখস শব্দ। 'হুঁ, পেয়েছি। মহিলার স্বামী, অ্যাভেরি কার্লসন। বিকেল চারটায় তিনি আসেন এবং লাশ সনাক্ত করেন।'

'ভদ্রলোকের বাড়ির ঠিকানা আছে তোমার কাছে?'

'আছে,' ব্রিডলাভ গ্লেনডেলের একটি রাস্তার নাম এবং বাড়ির নাম্বার বললেন। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিলেন ডা. চৌধুরী।

এর মানে কী? পুরো ব্যাপারটাই তাঁর মধ্যে একটা প্রবল অস্বস্তি তৈরি করেছে। অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট, ইভন কার্লসনের মৃত্যুর কারণ এবং সময় বিষয়ক অটোপসি রিপোর্ট, সাবরিনা স্টুয়ার্টের পানিতে ডুবে প্রায় মৃত্যু অভিজ্ঞতা, এর সঙ্গে ওই মহিলার কী সম্পর্ক থাকতে পারে? ডাক্তার একটা প্রহেলিকায় পড়ে গেছেন। বড়ই রহস্যময় মনে হচ্ছে গোটা বিষয়। এ রহস্যের জট না খোলা পর্যন্ত এ অস্বস্তি থেকে তিনি রেহাই পাবেন না। সিদ্ধান্ত নিলেন মৃত মহিলার স্বামীর সঙ্গে দেখা করবেন। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি গ্লেনডেলের উদ্দেশে।

আঠারো

লস এঞ্জেলেসের ঠিক উত্তরে, বুরব্যাংক আর পাসাডোনার মাঝখানে যেন ঠেসে ঢোকানো হয়েছে সিটি অব গ্লেনডেলকে। স্যান গেব্রিয়েল মাউন্টেনস এর পাদদেশে শুয়ে আছে শহরটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ শহরের পরিবর্তন হয়েছে সামান্যই।

লম্বা লম্বা পাম গাছের সারিতে সজ্জিত সুনসান রাস্তার এক ধারে, কার্লসনদের সাদা কাঠের বাংলোটি। সদ্যই রঙ করা হয়েছে বাড়িটি, জানালায় আপেল-সবুজ রঙা শাটার। বাড়ির সামনের বাগান আর ফুটপাতের যে যত্ন নেয়া হয় একনজর দেখেই বোঝা যায়। ডা. চৌধুরী পাথর বসানো পথ ধরে হেঁটে সদর দরজায় চলে এলেন, বাজালেন কলিংবেল।

তামাটে ত্বকের, একহারা গড়নের, মধ্য পঁয়ত্রিশের এক মহিলা খুলে দিল দরজা।

'কাকে চাই?'

'আমি মি. অ্যাভেরি কার্লসনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'জানতে পারি কেন?'

'মিসেস কার্লসনের বিষয়ে কথা বলতে। আমি ডা. অশোক চৌধুরী।' ডা. চৌধুরী অভিজ্ঞতা থেকে জানেন 'ডাক্তার' পরিচয় শুনলে বেশিরভাগ মানুষই সম্মান করে।

'এক মিনিট, প্লিজ।'

মহিলা দরজা ভেজিয়ে রেখে চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে। ছোট হলওয়ে সংলগ্ন একটি কক্ষে কারও সঙ্গে কথা বলতে শুনলেন ডাক্তার তাকে।

'কে?' নিচু স্বরে জানতে চাইল কেউ।

'বলছে ডাক্তার। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, বাবা।'

'খুব জরুরী না হলে আমি কারও সঙ্গে দেখা করতে চাই না।'

'বললেন মা'র ব্যাপারে কথা বলবেন।'

'কী নাম ডাক্তারের?'

'ডা. চৌধুরী না কী যেন।'

এক মুহূর্ত বিরতি, তারপর। 'ডা. চৌধুরী নামে আমি কাউকে চিনি না। ঠিক আছে, আমি কথা বলছি।'

বছর ষাটেকের এক ভদ্রলোক হাজির হলেন দোরগোড়ায়। তার মুখের চামড়া ঝুলে গেছে, অনিদ্রাজনিত কারণে চোখের নিচে কালি।

'আমি অ্যাভেরি কার্লসন,' নিজের পরিচয় দিলেন তিনি।

'মি. কার্লসন, আপনার স্ত্রীর মৃত্যুতে আমি আপনাকে গভীর শোক জানাচ্ছি। এরকম একটা সময়ে আপনাকে বিরক্ত করছি বলে ক্ষমা করবেন।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ,' অন্যমনস্ক গলায় বললেন তিনি। 'কী জন্য এসেছেন?'

'গতকাল আপনার স্ত্রীকে যখন নিয়ে আসা হয় সেই সময় আমি হাসপাতালে ছিলাম। তাঁর কিছু ব্যাপার আমাকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছে। আপনি যদি বিভ্রান্তি গুলো দূর করে দেন তো খুব ভালো হয়।'

'খেজুরে আলাপ করতে আসেননি তো, ডাক্তার?'

'একদমই না। দেখুন, আপনার স্ত্রীর অ্যাক্সিডেন্টের সঙ্গে আমার এক রোগী পরোক্ষভাবে জড়িয়ে গেছে। আপনার কাছে কিছু তথ্য পেলে আমার এবং আমার রোগীর বড্ড উপকার হয়।'

ডাক্তারের চেহারা খানিক পরখ করে সিদ্ধান্ত নিলেন অ্যাভেরি সাহেব। 'আচ্ছা, ভেতরে আসুন।'

ছোট্ট, সাজানো গোছানো লিভিংরুমে প্রবেশ করলেন ডা. অশোক চৌধুরী। আসবাবগুলো পুরনো এবং মজবুত, গায়ে উজ্জ্বল রঙের পরিষ্কার কাভার পরানো।

দরজা খুলে দিয়েছিল যে মহিলা তাকে ইশারায় দেখিয়ে অ্যাভেরি বললেন, 'এ আমার মেয়ে নাডিন। ও আমার সঙ্গে.. কয়েকদিন ধরে থাকছে।'

'হাউ ডু ইউ ডু?' বললেন ডা. চৌধুরী।

'নাইস টু মিট ইউ, ডক্টর। কফি খাবেন?'

'না, না। আমার জন্য কোনো ঝামেলা করতে হবে না।'

'কোনো ঝামেলা করব না। কফি রেডিই আছে।'

ঘুরপথে ডাইনিং রুমে গেল নাডিন, তারপর সুইসিং ডোর ঠেলে ঢুকল কিচেনে।

'বসুন, ডাক্তার।' বললেন কার্লসন। 'আমার অভব্য আচরণে কিছু মনে করবেন না। এখনও শোক সামলে উঠতে পারিনি।'

সোফায় বসলেন ডা. চৌধুরী। কার্লসন তাঁর মুখোমুখি একটি চেয়ার দখল করলেন। নাদিন ফিরে এল ট্রে ভর্তি কফি, ক্রিম, চিনি আর এক প্লেট বিস্কিট নিয়ে। কফি টেবিলের ওপর ট্রেটি রাখল সে, একটা কাপ দিল ডাক্তারকে, অপর কাপটি তার বাবাকে।

ডা. চৌধুরী তাঁর কাপে ক্রিম মিশিয়ে হাসিমুখে ধন্যবাদ জানালেন নাদিনকে। কার্লসন নিজের কাপটা চেয়ারের পাশে মেঝেতে নামিয়ে রেখে পরমুহূর্তে ওটার কথা বিস্মৃত হলেন।

'হ্যাঁ, বলুন, ডাক্তার। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

ডা. চৌধুরী উষ্ণ ও আরামদায়ক ঘরটিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। ম্যান্টলের ওপর একটি পেন্ডুলাম ঘড়ি রাখা, ফটো ফ্রেমে বাঁধানো গ্রাজুয়েশনের ছবি, বিয়ের ছবি, বেবী পিকচার। চিনা মাটি এবং কাচের তৈরি ছোট ছোট কিছু মূর্তি রয়েছে ঘরের এক কোণে, তিন কোণা-শেলফের ওপর। ফায়ার প্লেসের ওপর শোভা পাচ্ছে মরুভূমিতে অস্তগামী সূর্যের বাঁধানো ফটোগ্রাফ। যে মানুষটি পুরানো ফ্যাশনের একটি বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ জীবনযাপন করে আসছেন, তাঁকে কী করে বলা যায় যে আপনার স্ত্রীকে তার মৃত্যুর পরে রাস্তায় হাঁটতে দেখা গেছে? কী বলবেন ভেবে নিলেন ডাক্তার। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, মি. কার্লসন, অ্যাক্সিডেন্টের আগের দিন আপনার স্ত্রীর কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল?'

'অস্বাভাবিক ঘটনা মানে?'

'মানে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মেলে না এমন কোনো ঘটনা। এরকম কোনো আচরণ কি তিনি করেছিলেন কিংবা অস্বাভাবিক কোনো কথা বলেছিলেন?'

ডাক্তারের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন কার্লসন। এই প্রথম ব্যথাতুর, ক্লান্ত চোখে ঝিলিক দিল কৌতূহল।

'সত্যি বলতে কী, তার আচরণ পুরোটাই অস্বাভাবিক ছিল।'

'কী রকম?'

'আগে বলুন এরকম একটি প্রশ্ন করার কারণ কী?'

'কারণ মেডিকেল রিপোর্ট। কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন পেলে আমাদের রিপোর্টটি সম্পূর্ণ করতে সহায়তা হবে।'

কার্লসন নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কী যেন ভাবলেন। শেষে বললেন, 'ঠিক আছে। এতে যদি কারও উপকার হয় তো আমার বলতে আপত্তি নেই।' তিনি তাঁর মেয়ের দিকে তাকালেন।

'আমাকে তোমায় এ মুহূর্তে দরকার না হলে আমি একটু দোকান থেকে ঘুরে আসি,' বলল নাদিন। 'ডিনারের জন্য কিছু সদায়পাতি কিনতে হবে।' সে ডাক্তারের উদ্দেশ্যে নড করে সদর দরজায় পা বাড়াল।

'ঘটনার শুরু বুধবার রাতে,' বললেন কার্লসন, 'মাঝরাতের দিকে।'

উনিশ

'মাঝরাত?' লাফিয়ে উঠলেন ডা. চৌধুরী, মনে পড়ে গেছে প্যাথলজিস্ট মিসেস কার্লসনের মৃত্যুর সময়টা কখন বলেছিল।

উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন কার্লসন। 'ঠিক তাই। আমি সান্তা বারবারায় একটি কনস্ট্রাকশন সাইটে কাজ করছিলাম। আমার পেশা ওটা, কনস্ট্রাকশন। বুধবার কাজ শেষ করতে করতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, অন্যান্য দিনের মতো রাতটা মোটেলে কাটানোর বদলে আমি বাড়ি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিই। ফোন করে ইভোনকে বলেছিলাম আমি আসছি। আমি কখন বাড়ি ফিরব তা ও জানতে চায়... জানতে চাইত।

'আমি রাত সাড়ে এগারোটার দিকে বাড়ি ফিরে আসি। ও তখন বাথটাবে শুয়ে গোসল করছিল। তখন কিন্তু ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিকই দেখাচ্ছিল। আমি বেডরুমে ঢুকে কাপড় পাল্টাচ্ছি, এমন সময় ওর চিৎকার শুনতে পাই। তারপর বাথরুমে দড়াম করে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ। কেউ যেন মেঝেয় পা পিছলে পড়েছে। আমি দৌড়ে যাই। দেখি হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেয় পড়ে আছে ইভোন, মুখটা খোলা এবং... আ, ইয়ে, ওর চেহারাটা মোটেই ভালো দেখাচ্ছিল না। ওর হাতে একটা হেয়ার ড্রায়ার ছিল এবং সেটা তখনও চলছিল। কী ঘটছে তখুনি বুঝতে পারি আমি এবং দেয়াল থেকে টান মেরে খুলে ফেলি কর্ড। কিন্তু ইভোন তখনও নিশ্চল শুয়ে ছিল।'

কার্লসনের গলা বুজে এল, তিনি কোলের ওপর রাখা হাত দুটো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন ওগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে।

মানুষটাকে একটু সামলে উঠতে সময় দিয়ে ডা. চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি একবার আপনাদের বাথরুমটা দেখতে পারি?'

হাতের ওপর থেকে মুখ না তুলেই অ্যাভোরি কার্লসন জবাব দিলেন, 'ওটা হলওয়ের শেষ মাথায়।'

ডা. চৌধুরী ছোট্ট হলওয়ে পার হয়ে বাথরুমে ঢুকলেন। বাড়ির মতো বাথরুমটিও ঝকঝকে তকতকে। টয়লেট ট্যাঙ্কের ওপরে, একটি কাচের তাকে হেয়ার ড্রয়ারটি চোখে পড়ল। পুরানো মডেলের বড়সড় জিনিস। তবে এগুলোতে

সম্প্রতি নতুন কিছু প্রযুক্তি যোগ করা হয়েছে। দেয়ালে কর্ড লাগনো নেই।

হেয়ার ড্রয়ারটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করলেন ডা. চৌধুরী। হাতলের নিচে, যেখানে ভারী প্লাস্টিকের ভেতর দিয়ে ডাবল তার ঢুকে গেছে ওখানকার রবারের ইনস্যুলেশন বেশ খানিকটা ছেঁড়া। ফলে যন্ত্র চালু করার পরে নগ্ন তামার তারে লেগে যে কেউ বৈদ্যুতিক শক খেতেই পারে।

ড্রায়ারটি জায়গায় রেখে দেয়ার পরে গোলাপি রঙের একটি বাথম্যাটে চোখ আটকে গেল ডা. চৌধুরীর। সিঙ্কের পাশে, আবর্জনার ঝুড়িতে জিনিসটা গোল করে মুড়ে রাখা। বাথম্যাটটা তুলে নিয়ে পাক খুলে ফেললেন তিনি। ওটার মাঝখানে দুটো পোড়া দাগ, মাঝখানে দেড় ফুট দূরত্ব, প্রতিটি দাগের সাইজ মুদ্রার সমান।

তাঁর পেছন থেকে একটি কণ্ঠ বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ওখানেই ও দাঁড়িয়ে ছিল।'

ঘুরলেন ডাক্তার, দোরগোড়ায় অ্যাভোরি কার্লসনকে দেখে বিস্মিত হলেন।

'ও শাওয়ার থেকে নেমে ওই কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, ওটা ছিল পানিতে ভেজা। আর তখনই বিদ্যুতের শকটা খায় ও, আমার ধারণা।'

কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকালেন ডা. চৌধুরী।

'প্রথমে ভেবেছিলাম ও মারা গেছে,' ভাবলেশশূন্য গলায় বলে চললেন কার্লসন। 'শ্বাস করছিল না ও, আমি কোন হার্টবিটও খুঁজে পাইনি। কী করব বুঝতে পারছিলাম না, ছুটে চলে আসি লিভিংরুমে, তুলে নিই ফোন। অপারেটরকে সাহায্যের কথা বলতে মাত্র ডায়াল করেছি, এমন সময় আমার পেছনে ওর গলা শুনতে পাই।'

'আপনি মিসেস কার্লসনের গলা শুনতে পেয়েছিলেন?' সাবধানে জিজ্ঞেস করলেন ডা. চৌধুরী।

ডাক্তারের হাত থেকে পোড়া বাথ ম্যাটটি নিয়ে গোল করে মুড়লেন কার্লসন, আবার রেখে দিলেন আবর্জনার ঝুড়িতে। ঘুরলেন তিনি, হাঁটা দিলেন লিভিং রুমে। তাঁকে অনুসরণ করলেন ডা. চৌধুরী।

'হ্যাঁ, ওটা ইভোনের গলাই ছিল,' আবার আসন গ্রহণ করার পরে বললেন মি. কার্লসন। 'আমি মুখ ফিরিয়ে দেখি ইভোন ঠিক ওখানটায় দাঁড়িয়ে আছে যেখান থেকে আমরা দু'জন এইমাত্র চলে এলাম। ও... ওর গায়ে কোনো কাপড় ছিল না। আর ওকে কেমন জানি অদ্ভুত লাগছিল।'

'কী রকম লাগছিল?' প্রশ্ন করলেন ডাক্তার।

'ম্লান এবং বিমর্ষ। ওর গোটা শরীর ছিল ফ্যাকাসে। চোখ দুটো চকচক করছিল তবে তাতে কোনো প্রাণের পরশ ছিল না। আমি ভেবেছিলাম ইলেকট্রিক শক খাওয়ার কারণে ও ওরকম হয়ে গেছে। তবে ও বেঁচে আছে দেখে আমি ভীষণ খুশি হই।'

'তারপর কী হলো?' নরম গলায় জানতে চাইলেন অশোক।

'আমি ওকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঝট করে পিছিয়ে গেল। আমি ডাক্তার ডাকতে চেয়েছিলাম। কারণ ওর চেহারা এবং আচরণ দুটোই আমার কাছে অদ্ভুত লাগছিল।'

চুপ হয়ে গেলেন কার্লসন যেন চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলেছেন।

'ডাক্তার ডেকেছিলেন?' জিজ্ঞেস্ করলেন অশোক চৌধুরী।

'ইভোন আমাকে সে সুযোগ দেয়নি। আমি ফোন করতে গেলে ভীষণ জোরে কব্জি চেপে ধরেছিলাম। কী জোর হাতে! ওর গায়ে এত শক্তি কোত্থেকে এসেছিল কে জানে!

'ও ডাক্তার দেখাতে চাইছিল না বলে আমিও আর জোর করিনি। বলেছিলাম, 'চলো, শুতে যাবে,' কিন্তু বলল ওর নাকি ঘুম পায়নি। আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আমি তাহলে তোমার সঙ্গে বসে থাকি।' কিন্তু আমার সঙ্গে বসে থাকতেও রাজি হচ্ছিল না ইভোন। ও হাঁটছিল। হ্যাঁ, ও শুধু হাঁটাহাঁটি করছিল। সারা ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। একবার কিচেনে ঢুকেছিল, একবার এখানে আসছিল, হেঁটে যাচ্ছিল বেডরুমে, তারপর আবার কিচেনে। আমি চেষ্টা করেও ওকে একদণ্ড স্থির রাখতে পারিনি। ও নার্ভাস ভঙ্গিতে মেঝেতে পায়চারি করছিল যেন কিছুর জন্য অপেক্ষা করছিল।'

'এরকম কতক্ষণ চলেছে?'

'সারা রাত। শেষে আমি সোফায় বসে থাকতে থাকতেই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভেঙে দেখি তখনও হাঁটাহাঁটি চলছে ওর। একটু পরপর জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাচ্ছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়ার পরে কোনো একসময় ও কাপড় পরে নিয়েছিল তবে চুল আঁচড়ায়নি। চুলগুলো ছিল আলুথালু।'

'এ সময়ে উনি কি কিছু বলেছিলেন?'

'তেমন কিছু না। দু'একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিল কেবল। তবে ওর গলার স্বর কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। ফাঁকাফাঁকা। প্রাণহীন।'

'উনি একটুও ঘুমাননি?'

'যদ্দুর জানি– না। কিছু খায়ওনি। ঘুম ভেঙে ওর উদভ্রান্ত চেহারা দেখে আমি অফিসে ফোন করে বলে দিয়েছিলাম কাজে যেতে দেরি হবে আমার। কিচেনে গিয়ে নাশতা বানাই আমি। নাশতার আয়োজন বেশ জম্পেশই ছিল। রোববারের সকালগুলোতেই সাধারণত: আমি নাশতার আয়োজনটা ভালোভাবে করে থাকি। কিন্তু ভন্নি কিছুই খায়নি।' গলা বুঝে এল কার্লসনের, তিনি আবার নীরব হয়ে হাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

'পুরোটা সময় ও হাঁটাহাঁটি আর জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকানো ছাড়া আর কিছুই করেনি। তারপর হঠাৎ, আনুমানিক তখন সকাল এগারোটা বাজে, ম্যান্টেল থেকে গাড়ির চাবিটি খপ করে তুলে নিয়ে স্টেশন ওয়াগনটির দিকে এগিয়ে যায় ও। আমি ওর পেছন পেছন ছুটে যাই। 'কী করছ তুমি' বলতে বলতে।

'ও আমার দিকে তাকায়নি পর্যন্ত। শুধু বলে 'আমার একটা কাজ আছে।' তারপর সে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। ব্যস, ও-ই ওকে শেষ দেখা আমার। তারপর বেলা তিনটার দিকে পুলিশ আমাকে ফোন করেছিল। এরপরের ঘটনা আপনি তো জানেনেই।'

অ্যাভোরি কার্লসন আর কিছু বলবেন না বুঝতে পেরে আসন ত্যাগ করলেন ডাক্তার। পা বাড়ালেন দরজায়। কার্লসনও উঠে দাঁড়ালেন।

'আমাকে এতটা সময় দেয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ,' বললেন ডাক্তার। 'এবং আবারও আপনাকে আমি সমবেদনা জানাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ,' বললেন কার্লসন।

কার্লসন সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে লস এঞ্জেলেস অভিমুখে চললেন ডা. চৌধুরী। কার্লসন যে গল্প শুনিয়েছেন তা রাতের ঘুম হারাম করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

ইভোন কার্লসনের যা ঘটেছে তার কোনো স্বাভাবিক ব্যাখ্যা নেই। মেডিকেল লাইব্রেরিগুলো যতই গবেষণা করুক না কেন ইভোনের মৃত্যু নিয়ে যে ভীতিকর প্রশ্নগুলো উঠবে তার কোনো জবাব তারা দিতে পারবে না। কোনো সন্দেহই নেই বুধবার মধ্যরাতেই মারা গিয়েছিল মহিলা। অটোপসিতে তাই দেখা গেছে, মহিলার স্বামীও এ মৃত্যুর একজন সাক্ষী যদিও তিনি তা জানেন না। ইভোন যখন বাথরুমে মেঝেয় পড়ে ছিলেন এবং তার শরীরের মাঝ দিয়ে ১১০ ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছিল, ততক্ষণে তিনি মারা গেছেন। অথচ ওই ঘটনার তেরো ঘণ্টা পরে তাঁকে দেখা যায় স্টেশন ওয়াগন চালাতে এবং তিনি সাবরিনাকে প্রায় গাড়ি চাপা দিতে যাচ্ছিলেন। আর এই সাবরিনাই আবার কার অ্যাক্সিডেন্টের আগের রাতে সুইমিং পুলে ডুবে মরতে বসেছিল এবং তার বিদঘুটে 'মৃত্যু' অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এগুলো কি কাকতালীয়? ডা. অশোক চৌধুরী এ ঘটনা দুটির মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে বিশ্বাস করতে চান না কিন্তু তাঁর মন যে মানে না। তাঁর বারবারই মনে হচ্ছে সামনে সাবরিনার আরও বিপদ হবে।

তিনি স্কাই হাইর অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে প্রথমেই নোটবুক খুলে সাবরিনার বাসার নম্বর বের করে ফোন করলেন। সাবরিনাকে সাবধান করে দেবেন। কিন্তু বারবার রিং হলো। ধরল না কেউ। দশবার চেষ্টার পরে ক্ষান্ত দিলেন ডাক্তার। বাড়ি নেই সাবরিনা। তিনি নিজের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সুইমিং পুলের ধার

ঘেঁষে এগোলেন রবার্ট ডানের বাসায়। পুলে নারী-পুরুষরা মিলে গোসল করছে। তাদের কলহাস্যে মুখরিত সুইমিং পুল। মাত্র তিনদিন আগে এখানেই শুরু হয়েছিল দু:স্বপ্নটি। ওদের দিকে নজর দিলেন না ডাক্তার। তিনি রবার্টের বাড়িতে চলে এলেন। বাযার টিপলেন বারকয়েক। কোনো সাড়া নেই।

ঠিক আছে, তাঁর পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব তিনি করেছেন। এখন থেকে যদি কিছু ঘটেও তাঁর আর অপারাধবোধে ভোগার অবকাশ নেই। তিনি ধীর পায়ে ফিরে এলেন নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। স্লাইডিং গ্লাস ডোর টেনে দিয়ে ফেলে দিলেন পর্দা।

চেয়ারে বসে মেডিকেল জার্নালে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলেন ডা. অশোক চৌধুরী। কিন্তু লাভ হলো না কোনো। ছাপা অক্ষরগুলো কোনো প্রাঞ্জল বাক্য তৈরি করতে পারল না। ওগুলো তাঁর চোখের সামনে যেন সাঁতার কাটতে লাগল আর তিনি মনের চোখে দেখতে পেলেন ইভোন কার্লসনকে। ফ্যাকাসে চেহারা, জ্বলজ্বলে চোখ। মহিলা হাঁটছে... আর হাঁটছে।

বিশ

বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিচ্ছবি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে পিটার ল্যানডাউ। শনিবার রাত। ক্লিনশেভ করেছে পিটার, মুখে মেখেছে সুগন্ধী কোলন। তার দাঁতগুলো মসৃণ এবং ঝকঝকে, ব্লো ড্রায়ারের গরম বাতাসে শুকিয়েছে চুল, শরীরের প্রয়োজনীয় স্থানগুলোত অকৃপণ হস্তে বিলিয়েছে পারফিউম। তাকে অত্যন্ত সুদর্শন লাগছে। তবু কেন চোখের নিচে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার ভাঁজগুলো রয়ে গেছে?

লিভিংরুমে ফিরে এল পিটার, কৃত্রিম তন্তু দিয়ে তৈরি সোফায় গা এলিয়ে দিল। ওহ, কেন, আবার নিজেকে প্রশ্ন করল সে, কেন সে সাবরিনা স্টুয়ার্ট আর তার আজগুবি গল্পের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে গেল? ও শুধু সাবরিনার সঙ্গে একটু মজা করতে চেয়েছিল। বদলে বিশ্রি রকম একটা ঝামেলায় আটকে গেছে পিটার।

বৃহস্পতিবারের পরে, যেদিন সাবরিনা এসেছিল এখানে, তারপর থেকে পিটারের দিনগুলো মোটেই ভাল যায়নি। তার নিয়মিত মক্কেলরা এসেছে, তাদেরকে সাদামাটা কিছু ভবিষ্যদ্বানী করে বিদায় করেছে পিটার, সরস আড্ডা দেবার উৎসাহ বোধ করেনি। যা নিয়েই কাজ করেছে– অ্যাস্ট্রলজি, পামিস্ট্রি, ক্রিস্টাল, ট্যারট– সবকিছুর মধ্যেই একটা অশুভ আবহ খুঁজে পেয়েছে পিটার, সবচেয়ে বাজে ভবিষ্যৎদ্বানী এসেছে ট্যারট কার্ড থেকে। তার নিয়মিত মহিলা খদ্দেররা ইতিমধ্যেই অভিযোগ করেছে তারা তাদের পরিচিত হাসিখুশি পিটারকে খুঁজে পাচ্ছে না, সে কেমন নিস্প্রাণ হয়ে গেছে। ফ্লু হয়েছে বলে তাদের অভিযোগ পাশ কাটানো গেলেও যদি এ ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারে পিটার, ব্যবসায় তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে বাধ্য।

অশুভ চিন্তার ছায়া প্রভাবিত করেছে পিটারের ব্যক্তিজীবনও। আজ রাতে *প্লেবয়* পত্রিকার সেন্টার ফোল্ড মডেল সুসুর সঙ্গে ডেট আছে। হল্বি হিলস পত্রিকাটির মালিক হিউ হেফনারের পার্টিতে যাবে ওরা। অন্য কোনো দিন হলে এমন একটি পার্টিতে দাওয়াত পেলে মাটির ছয় ইঞ্চি উপর দিয়ে হাঁটত পিটার। কিন্তু আজ তার পার্টিতেই যেতে ইচ্ছা করছে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোফা ছাড়ল পিটার। ট্যারট কার্ডের তোড়া রাখা টেবিলটির দিকে এগোল। কার্ডগুলো শাফল করল সে, বিন্যাস্ত করল তারপর নিজের

জন্য কেলটিক ক্রস তৈরি করল। সাবরিনা বৃহস্পতিবার চলে যাওয়ার পরে এ নিয়ে কমপক্ষে কুড়িবার ট্যারট সাজিয়েছে পিটার। আগে কাজটা করতে যেরকম আনন্দ পেত এখন আর তা পাচ্ছে না। আগে মেন্টাল এক্সারসাইজ হিসেবে খেলাটা খেলত সে। এখন ওটা খেলা নয়, পরিণত হয়েছে বাস্তবে এবং ব্যাপারটা তার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। কার্ডগুলোর মধ্যে তার জন্য মেসেজ রয়েছে।

ওল্টানো দশটি কার্ডের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পিটার। ওই কার্ডগুলো তার নিজের কার্ডের সঙ্গে যাবে। ওর নিজের কার্ড উঠেছে ম্যাজিশিয়ান। এর আগে উঠেছিল কুইন অব কাপস, দ্য টাওয়ার, দ্যা হ্যাংগড ম্যান এবং দ্য ডেথ। তবে সবগুলো সবসময় একইরকম পজিশনে ছিল না এবং মাঝে মাঝে একটি বা দুটি কার্ড ওর হাতেই ওঠেনি। তবে যে কার্ডটি বারবার হাতে উঠে এসেছে তা হলো ডেথ–মৃত্যু।'

নিচের রাস্তায় ঘনঘন হর্ন বাজাচ্ছে একটি গাড়ি। গাড়িটির হর্নের আওয়াজ উপেক্ষা করে কার্ডের দিকে থমথমে চেহারা নিয়ে তাকিয়ে রইল পিটার।

আচ্ছা, আবার একবার ব্যাখ্যা করা যাক। কুইন অব কাপস ধরা যাক সাবরিনা। মেয়েটি যে কোনোভাবেই হোক নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছে। তারপর দ্য টাওয়ার। এটি দুসংবাদ বয়ে নিয়ে আসবেই। তারপর দ্য হ্যাংগড ম্যান, এ কার্ডের মানে বলা মুশকিল, তবে এটি মানুষের স্নায়ুকে উত্তেজিতই করে তোলে শুধু। সর্বশেষে ডেথ। কিন্তু মৃত্যুটা কার হবে? এবং কখন?

কাঠের সিড়িতে হাইহিলের খটখট আওয়াজ শুনতে পেল পিটার। তারপরই বেজে উঠল বাযার।

'দরজা খোলা আছে,' কার্ড থেকে মুখ না তুলেই হাঁক ছাড়ল পিটার।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা, ভেতরে প্রবেশ করল চোখ ধাঁধানো এক রূপসী।

'হ্যালো, সুসু।' বলল পিটার।

চমৎকার গোল নিতম্বে হাত রেখে পোজ মেরে দাঁড়াল মেয়েটি। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে ক্লাসিক মডেলদের সহজাত ছন্দ। যে ইলেকট্রিক-ব্লু রঙের ড্রেসটি সে পরেছে তা উরুর কাছে অনেকটাই চেরা, ফলে ধবধবে, সুঠাম লম্বা পায়ের অনেকখানি দৃশ্যমান। তার বক্ষজোড়া সুউন্নত এবং ভরাট, হাঁটলেই যেন কাপড় ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে।

'আমার হর্নের আওয়াজ শোনোনি?' অভিযোগ করল সে।

'শুনেছি,' মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল পিটার। সুসুর সোনালি চুল যেন অগ্নিশিখা, দুর্ধর্ষ শরীরের সাথে চায়না-ব্লু ডাগর আঁখি জোড়া যে কোনো পুরুষের হৃদস্পন্দন বন্ধ করে দেবে। কিন্তু এই অসম্ভব রূপবতীটির প্রতি এ মুহূর্তে কোনোই আগ্রহ বোধ করছে না পিটার।

'আমরা কি আজ রাতে বেরুচ্ছি নাকি বেরুচ্ছি না?

'গত ক'টা দিন ধরে আমার ওপর দিয়ে খুব ধকল যাচ্ছে, সুসু। আজ রাতে না হয় দু'জনে বাড়িতে থাকলাম? আমি ফোন করে পিজ্জা আনিয়ে নেব, গান শুনব, টিভি দেখব। জেড চ্যানেলে ভালো অনুষ্ঠান আছে।'

'তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করছ। ছোট্ট সুসুকে নিয়ে মজা করতে চাইছ।'

'না, না। তা কেন হবে। আজ সত্যি পার্টিতে যেতে ইচ্ছে করছে না। গোলমাল, হৈ হল্লা আজ ভাল্লাগবে না আমার।'

বিপজ্জনক ভঙ্গিতে বিস্ফারিত হলো সুদূর নীল চোখ। 'অথচ আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে কতবার তুমি আমাকে অনুরোধ করেছ। আমাকে হেফনারের পার্টিতে নিয়ে চলো।' আজ সুযোগ এসেছে অথচ তুমি যেতে চাইছ না। হেফ হেঁজিপেঁজিদের তার পার্টিতে ঢুকতে দেন না তুমি জানো।'

'জানি আমি,' বলল পিটার। 'তুমি আমার জন্য যে কাজটা করেছ সে জন্য ধন্যবাদ।'

ওর কথা যেন শুনতে পায়নি এমনভাবে বলে চলল সুসু, 'হেফ যখন কোনো মেয়েকে নেমন্তন্ন করেন তখন শুধু ওই মেয়েটিই তাঁর নেমন্তন্নে যেতে পারে। কিন্তু আমি বারবার তাঁর কাছে ঘ্যানঘ্যান করছিলাম। শেষে তিনি অনুমতি দিয়ে বলেন আমি একজন ছেলে বন্ধু নিয়ে আসতে পারব। এত কষ্ট করে দাওয়াতটি আদায় করলাম অথচ এখন কী শুনছি?' গলার স্বর নিচে নামাল সে, কণ্ঠে পরিষ্কার বিরক্তি।

'তুমি কিনা ঘরে বসে পিজ্জা খেতে খেতে টিভি দেখার প্রস্তাব দিচ্ছ। এসব ফাজলামির মানে কী?'

স্ট্রাটোলাউঞ্জারে বসা পিটার সরাসরি তাকাল সুসুর দিকে। 'তোমাকে তো বললামই, সুসু, আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। আর কী ব্যাখ্যা দেব তোমাকে?'

'অথচ তোমাকে কিনা ভেবেছিলাম একজন সুইঙ্গার। দুরো! তুমি আসলে টিভি দেখা ছাড়া আর কিছুই পারো না। তোমার দৌড় ওটুকুই।'

'শোনো, সুইটি, তুমি আমাকে বকাবকি না করে বরং একাই চলে যাও পার্টিতে।'

'আমি একজন বন্ধু নিয়ে আসছি সে অনুমতি পাবার পরেও হিউ হেফনারের পার্টিতে আমাকে একা একা যেতে বলছ?'

'উনি তোমাকে নিশ্চয় ঢুকতে দেবেন।'

'অবশ্যই উনি আমাকে পার্টিতে ঢুকতে দেবেন। তবে কথা তা নয়।'

'নইলে কাউকে সঙ্গী হিসেবে জোগাড় করে নাও।'

'আমি বোধহয় তাই করব, মি. সুইংগার।'

'গুডবাই, সুসু।'

জ্বলন্ত চোখে পিটারের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সুসু, তার টসটসে মুখখানা রাগে বিকৃত দেখাচ্ছে। তারপর সে পাঁই করে ঘুরল এবং গটগট করে

বেরিয়ে গেল ঘর থেকে নিতম্বে আটলান্টিকের ঢেউ তুলে।

সুসু ঠকাশ ঠকাশ শব্দ তুলে কাঠের সিড়ি বেয়ে নেমে গেল নিচে। চেয়ার ছাড়ল পিটার, হেঁটে গেল জানালার সামনে। নিচের রাস্তা অন্ধকার, শুধু লরেল বেনিয়ন বুলেভার্ডের মোড় থেকে ভেসে আসা স্ট্রিট লাইটের ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে। সুসুর গাড়ির ট্রেইল লাইট অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সে ফিরে এল কার্ড টেবিলে।

নিচু টেবিলের ওপর এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ট্যারট কার্ড। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেবিলে বসল পিটার। কার্ডগুলো নিয়ে শাফল করতে লাগল। তারপর থেমে গেল। ঘরের কোণে, একটা বুক শেলফের ওপর রাখা ওইজা বোর্ডের দিকে আটকে গেছে নজর। মক্কেলদের সঙ্গে বোর্ড ব্যবহার করতে খুব পছন্দ করে পিটার কারণ এটি ব্যবহার করা খুব সহজ। বেশিরভাগ সময় সে প্ল্যানচেটের ওপর হাত রেখে বসে থাকে এবং ক্লায়েন্ট যে মেসেজ শুনতে চায় সেদিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার হাত। মক্কেল নিজে থেকে হাত না নড়ালে পিটার নিজেই হৃদপিণ্ড আকারের টেবিলটি ঘুরিয়ে মক্কেলের প্রশ্নের 'সঠিক' জবাব দিয়ে দেয়। এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোনো রহস্যময় শক্তির যোগাযোগ থাকতে পারে তা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবেনি পিটার। তবে সে তো এর আগে ট্যারট কার্ডগুলোকেও অর্থহীন কতগুলো ছবি বলে ভেবে এসেছিল।

ট্যারট কার্ডের তাড়াটি নিয়ে ওটাকে সিল্ক স্কার্ফ দিয়ে মুড়ল পিটার তারপর জায়গায় রেখে দিল। সে শেলফ থেকে ওইজা বোর্ডটি নামিয়ে আনল এবং লাভ সিটের সামনের টেবিলে ওটা রাখল, তিনঠেঙা প্ল্যানচেটটা বোর্ডের ওপর বসাল সে। তারপর লাভসিটে বসে ওটার দিকে তাকাল।

আমি কি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি? ভাবছে পিটার। আমি কি সত্যি আশা করছি যে কতগুলো অক্ষর এবং সংখ্যা লেখা এই স্টুপিড বোর্ডটা আমাকে কিছু বলবে?

তারপর পিটার সেই একই প্রশ্ন নিজেকে করল যে প্রশ্নটি দুইদিন আগে করেছিল সাবরিনা স্টুয়ার্টের তোমার হারাবার কী আছে? কিন্তু পিটারের মনে আশংকা জাগছিল ও যা জানতে চায় তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু ও হয়তো হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু এতদূর আসার পরে ওর আর ফেরার রাস্তা নেই।

বেশ কয়েকবার গভীর দম নিল পিটার এবং দম ফেলল। তারপর আলতো করে আঙুলের ডগা রাখল প্ল্যানচেটের ওপর। অপ্রয়োজনীয় সমস্ত চিন্তা মন থেকে দূর করে দিল সে। চোখ বুজে একটি উজ্জ্বল শক্তির কথা চিন্তা করতে লাগল। তার মনে এখন কেবল একটিই প্রশ্ন *এখানে কেউ আছেন?*

কিছুই ঘটল না।

দীর্ঘদিন নড়াচড়া না করার কারণে এবং একইভাবে বসে ছিল বলে ওর হাতের পেশীতে ব্যথা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু চোখ খুলল না পিটার। বৈদ্যুতিক আইনের মতো প্রশ্নটি তার মনে জ্বলতে আর নিভতে লাগল, এখানে কেউ আছেন?

একুশ

প্রায় সোয়া ঘণ্টা বসে থাকার পরে পিটারের আঙুলের নিচে নড়ে উঠল প্ল্যানচেট। স্রেফ ছোট্ট একটি খিঁচুনি, আধ ইঞ্চিরও কম জায়গায় নড়েছে আঙুল, তবে নিঃসন্দেহে ওটা নড়াচড়া করেছে।

ঝট করে খুলে গেল পিটারের চোখ। প্ল্যানচেটের দিকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকাল। ওটা আবার নিশ্চল হয়ে পড়েছে। মনোযোগ ফিরিয়ে আনল সে এবং আবারও জিজ্ঞেস করল প্রশ্নটি   এখানে কেউ আছেন?

আবার নড়ে উঠল প্ল্যানচেট। প্রথমে খুবই মৃদু, একবারে বড়জোর এক মিলিমিটার জায়গা সরেছে, তারপর আকস্মিক শক্তির স্ফূরণ ঘটল যেন ওটাতে, সবে এগোতে শুরু করল তবে বোর্ডের চারপাশে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পিটারের কপালে ঘাম ফুটল। ওর অনুভূতিহীন আঙুলের নিচে তিনঠেঙ্গা ছোট টেবিলটির দিকে বড়বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। দেখছে ওটা নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে বোর্ডে। ওটার কিন্দ্রবিন্দুতে থাকা ছোট্ট কাঁটাসহ স্বচ্ছ প্লাস্টিকের জানালাটি কী যেন খুঁজছে আর খুঁজছে।

যদিও দাঁতে দাঁত চেপে এক ঘণ্টারও বেশি সময় বসেছিল পিটার এ আশায় যে তার নির্দেশে সবকিছু ঘটবে, কিন্তু এ মুহূর্তে যা ঘটছে তা ওর বিশ্বাসই হতে চাইছে না। এতদিন মহিলাদেরকে কত বানিয়ে বানিয়ে কথা বলেছে ও, কত ভুয়া ভবিষ্যৎদ্বানী করেছে, তারা এ জন্য ওকে অনেক টাকাও দিয়েছে, কিন্তু আজ হঠাৎ পুরো ব্যাপারটাই শীতল একটা বাতাসের মতো ওকে ধাক্কা দিল।

এখানে কেউ আছেন? এ প্রশ্নে মনোনিবেশ করতে গিয়ে ব্যথায় দপদপ করতে লাগল পিটারের মাথা।

প্ল্যানচেট বোর্ডে তার উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরির গতি হ্রাস করনের উদ্দেশ্য নিয়ে বাম দিকে ধাবিত হলো। অকস্মাৎ থেমে গেল yes লেখা অক্ষরটির ওপর, প্লাস্টিকের জানালা সটান ওদিকে নির্দেশ করছে।

অন্য সময় হলে আত্মার পরিচয় জানতে চাইত পিটার, মক্কেলদের বিমোহিত করার জন্য উদ্ভট কিছু মন্ত্রোচ্চারণ করত। কিন্তু আজ সে ওসবের ধারেকাছেও গেল

না। তার আঙুলের নিচে, প্ল্যানচেটে কোন শক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে তা নিয়ে পিটারের কোনো মাথাব্যথা নেই, এটা যে নড়াচড়া করেছে সেটাই এখন তার কাছে মুখ্য। এখন প্রশ্ন করতে হবে, নষ্ট করার মতো সময় হাতে একদমই নেই।

উচ্চস্বরে পিটার বলল, 'আমি সাবরিনা স্টুয়ার্ট সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করতে চাই।'

নড়ল না টেবিল। ওটাকে সম্মতি ধরে নিয়ে প্রশ্ন চালিয়ে গেল সে।

'সাবরিনা স্টুয়ার্ট কি বিপদের মধ্যে আছে?'

সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল প্ল্যানচেট, দ্রুত ঘুরছে বোর্ডে, ফিরে এল যেখান থেকে শুরু করেছিল যাত্রা সেখানে yes

'আমি কি বিপদের মধ্যে আছি?'

'আবার দ্রুত বোর্ড ঘোরা শেষ করে বামদিকে, সূর্যের ছবির কাছে ফিরে এল প্ল্যানচেট yes

পিটারের গলা শুকিয়ে গেল। তবু জোর করে ঢোক গিলল।

'আমার বিপদ কি সাবরিনার মতো?'

'আবার yes

'সাবরিনার 'মৃত্যু' অভিজ্ঞতার সঙ্গে কি এসবের কোনো সম্পর্ক রয়েছে?'

yes

পিটার দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল ঘরে। তার গা ছমছম করছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি ছায়া থেকে বেরিয়ে কিছু একটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর গায়ে।

জলদি ও জিজ্ঞেস করল, 'এ মুহূর্তে বিপদ হতে পারে?

প্ল্যানচেট বোর্ডের ডানদিকে চলে গেল। থামল । No.

যথেষ্ট হয়েছে, এবারে এসব বন্ধ কর, নিজেকে বলল পিটার। তুমি তো হিস্টিরিয়া রোগীর মতো করছ। সে আবার চোখ বুজে মনকে কাজে লাগাতে স্থির করল। তার শরীর ব্যথা করছে, ঘামে ভিজে গেছে গা, যেন এক মাইল উৎরাই ঠেলে পাহাড়ে উঠেছে। টের পাচ্ছে ওর দেহের শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, জানে বাকি প্রশ্নগুলো খুব সাবধানে করতে হবে।

'বিপদের প্রকৃতি কী?'

প্ল্যানচেট সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডের মাঝখানে লেখা দু'সারি অক্ষরের দিকে এগিয়ে গেল। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ওটা ওপরের সারিতে চলে এল এবং এক সেকেন্ডের জন্য থামল D অক্ষরটির ওপর। তারপর মসৃণ গতিতে, একটা অভীষ্ট লক্ষ্য নিয়ে যেন এগিয়ে গেল বাকি অক্ষরগুলোর দিকে D...E...A...T...H

DEATH

ওহ, যীশাস, নিজেকে গালমন্দ করল পিটার, সে কেন এসব শুরু করতে

গিয়েছিল, নাহ্, বড্ড বোকার মতো হয়ে গেছে কাজটা। অবশ্য এটাকে এড়ানোর কোনো উপায়ও ছিল না। জবাবটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই পিটারের মনে। ইংরেজি বড় বড় অক্ষরে পরিষ্কার লেখা DEATH

'কোথেকে ' না, ওভাবে প্রশ্ন করে লাভ নেই। খুক খুক কাশল পিটার, ঢোক গিলে ফের জিজ্ঞেস করল, 'কোনো আকার বা আকৃতিতে বিপদটা আসবে?'

প্ল্যানচেটটা ওর আঙুলের নিচ থেকে প্রায় লাফ মেরে বেরিয়ে গেল। ধাবিত হলো দ্বিতীয় সারির অক্ষরের দিকে এবং W অক্ষরটির ওপর এক মুহূর্তের জন্য থেমে দাঁড়াল। এরপর গোটা বোর্ডে ঘুরল এবং বানান করে দ্রুত দিয়ে দিল জবাব WALKERS.

অপেক্ষা করছে পিটার কিন্তু প্ল্যানচেট আর নড়াচড়া করল না। আঙুলের নিচে ওটা যেন লাফাচ্ছে, টের পেল সে, যেন ছোট একট মোটর গুনগুন শব্দ করছে ওটার ভেতরে।

'ঠিক বুঝলাম না। এ কথার অর্থ কী? এটা কি কোনো নাম?'

আবার WALKERS. ব্যস, আর কিছু নয়।

এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না পিটার। প্ল্যানচেটের ওপর আঙুল রেখে কাঁধের কাছে শার্টে মাথা ঘষে কপালের ঘাম মুছল সে। একই প্রশ্ন করার জন্য আরেকটা রাস্তা বের করল।

'আমার আর সাবরিনার এই যে বিপদ,' ধীরে ধীরে বলল পিটার, 'এই... মৃত্যু। এটা কোনোদিক বা কোথেকে আসছে?'

BEYOND.

ধ্যাত্তেরি! এখনও কিছুই বোঝা গেল না। আবার চেষ্টা করা যাক।

'কে বা কী মানে কাদের বিরুদ্ধে আমরা সাবধান থাকব?'

WALKERS.

কষে একটা গালি দিতে যাচ্ছিল পিটার, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। কারণ প্ল্যানচেট আবার ওর আঙুলের নিচে নড়তে শুরু করেছে। ওটা দুই সারি অক্ষর ছাড়িয়ে এবারে সংখ্যার দিকে এগোচ্ছে। ৪ লেখা সংখ্যাটির ওপর যাত্রা বিরতি দিল। ওখানেই থেমে রইল। 'ওয়াকার্স? গুয়াকার্স ?

'ঠিক বুঝলাম না। এর মানে কী?'

কেঁপে উঠল প্ল্যানচেট কিন্তু নড়ল না।

আরেকটি প্রশ্ন। অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে। পিটারের মাথা তীব্র ব্যথা করছে। ঠোঁট কামড়ে বের করে ফেলেছে রক্ত। কী জিজ্ঞেস করবে? কখন, হ্যাঁ, এ প্রশ্নটি করা যায়। সাবধানে করতে হবে প্রশ্নটি। চোখ বুজল পিটার, গাল বেয়ে নামল অশ্রু।

'এই বিপদটা, এটা কখন হবে?'

ওর আঙুলের নিচে মৃদু কেঁপে উঠল প্ল্যানচেট তবে নড়াচড়া করল না।

'কখন, আরে শালা বল, কখন বিপদ ঘটবে?' চিৎকার দিল পিটার।

প্ল্যানচেটকে মনে হলো ওর কাছ থেকে এক ইঞ্চি দূরে নিজেকে গুটিয়ে নিল।

'না, শোনো, গালাগালির জন্য আমি দুঃখিত,' ঈশ্বর আমি আসলেই পাগল হয়ে গেছি, নইলে ওইজা বোর্ডের কাছে ক্ষমা চাই! মানে আমি জানতে চাইছি এটার কি কোনো ডেডলাইন বা নির্দিষ্ট দিন তারিখ আছে? আমার জন্য খুব বিপদের কোনো সময় রয়েছে? কিংবা সাবরিনা স্টুয়ার্টের জন্য?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্ল্যানচেটটা ছোট ছোট নক্ষত্র আর যাত্রা বিরতি চিহ্নের মাঝ দিয়ে আবার এগুতে শুরু করল। ফিরে এল অক্ষরগুলোর কাছে। S-A-I-N-T, বিরতি, J-O-H-N.

'সেইন্ট জন? ওটা কী জিনিস?' জোরে জোরে চিৎকার করছে এখন পিটার, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। 'ড্যাম ইট, আমি ধাঁধা চাই না। আমি জিজ্ঞেস করেছি কখন! বিপদ... মৃত্যু... ডেডলাইনটা কবে বা কখন?'

WALKERS 4 SAINT JOHN.

'কিছুই বুঝলাম না!' ষাঁড়ের মতো গর্জন করছে পিটার, নিজেকে সামাল দিতে চাইছে। ওটাকে অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে। জবাবগুলো এখুনি পেতে হবে। এটাই হয়তো শেষ সুযোগ।

ধীর গতিতে সে প্রশ্ন করল, 'এই বিপদ আমরা কীভাবে এড়াতে পারি? কীভাবে আমরা মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেতে পারি?'

যেন বৈদ্যুতিক চার্জ বয়ে গেছে শরীরের ভেতরে, এমনভাবে একটা ঝাঁকি খেল ওইজা বোর্ড, তারপর বোর্ডের একদম নিচে চলে এল। পয়েন্টার বা কাঁটাটি Goodbye শব্দের ওপর বসে রইল।

'না!' আর্তনাদ করে উঠল পিটার। 'থেমো না। আমার কথা শেষ হয়নি। আমি মেসেজটি বুঝতে পারিনি। আমার আরও কিছু তথ্য দরকার।'

বেনিয়নের কোথাও থেকে একটি গির্জার ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল।

পিটারের ব্যথায় টনটনে আঙুলের নিচে প্ল্যানচেট মৃতবৎ পড়ে রয়েছে। দেখে মনে হয় এর মধ্যে রহস্যময় কিছুই নেই। এটা তিনটি ঠ্যাঙ আর একটা পয়েন্টারসহ স্রেফ একটা হালকা কাঠের প্ল্যানচেট। একে আর কোনো প্রশ্ন করে লাভ নেই। এ আর নড়বে না, জানে পিটার।

লাভসিটে নেতিয়ে পড়ল ও। মুখটা শুকনো, আঙুলগুলো আবার থাবার মতো বেঁকে রয়েছে। সে কুশনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে অনেকক্ষণ থেমে থেমে শ্বাস

করল।

WALKERS 4? SAINT JOHN? এর মানে কী? এর রহস্য নিশ্চয় অন্য কোথাও সন্নিহিত, পিটারকে খুঁজে বের করতেই হবে। দাঁতে দাঁত ঘষল সে, মনের ওপর চাপ দিল কিন্তু দুর্বোধ্য মেসেজটির কোনোই অর্থ উদ্ধার করতে পারল না।

আঙুল দিয়ে চোখ ডলল পিটাল। চোখ মেলে চাইল। পিটপিট করছে। জানালা দিয়ে দেখা যচ্ছে পাহাড়ের কালো কাঁধের ওপর ঝুলে রয়েছে শেলেটরঙা ধূসর আকাশ। ভোর হয়ে আসছে। একটা গালি দিল পিটার। সারা রাত সে এই ফালতু ওইজা বোর্ড নিয়ে বসে থেকেও কিছুই জানতে পারেনি।

এখন ওর একটাই করণীয়, নিজেকে শোনাল পিটার, বিছানায় গিয়ে সটান হওয়া। ঘুম, ঘুমালে বিশ্রাম পাবে শরীর এবং মস্তিষ্ক। ঘুম ভেঙে তাজা দেহ মন নিয়ে চিন্তা করা যাবে WALKERS 4 SAINT JOHN এর মানে কী।

আড়ষ্ট শরীর নিয়ে সিধে হলো পিটার, ওইজা বোর্ড আর প্ল্যানচেট তুলে নিয়ে বুক শেলফের ওপর রাখল। লেখার টেবিল থেকে ট্যারট কার্ডের তাড়াটি নিল। সিল্ক স্কার্ফটি খুলে ওটা ফেলে দিল মেঝেতে। তাসের তাড়া নিয়ে ফিরে এল টেবিলে। দুম করে বসল লাভ সিটে, কার্ডগুলো শাফল করল, তারপর কেলটিক ক্রস তৈরির জন্য ওগুলো আবার বিছাতে শুরু করল।

বাইশ

খোলা জানালা দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া আসছে। বাতাসের সঙ্গে মিশে গেছে কেবিনের কাঁচা কাঠের গন্ধ। সাবরিনা ওদের সরু বিছানায় একটা গড়ান দিয়ে রবার্ট ডানের নগ্ন কাঁধে নাক গুঁজল।

ওর মাথায় চুমু খেল রবার্ট। 'আরাম লাগছে?'

'এমন আরাম লাগছে যে এ ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'কিন্তু পরবর্তী ভাড়াটিয়ারা এলে কেবিনটা ছেড়ে দিতে হবে।'

'জানি আমি। ক'টা বাজে?'

বিছানার পাশে, মেঝেতে হাতড়ে নিজের হাতঘড়িটি পেল রবার্ট। তুলে আনল চোখের সামনে।

'ছ'টা।'

'সকাল না সন্ধ্যা?'

'সন্ধ্যা।'

'ধুত, তার মানে আমাদের উইকএন্ড প্রায় শেষ হতে চলল।'

'প্রায়।'

'তুমি কি জানো আমরা গত আটচল্লিশ ঘণ্টার পুরোটাই এ বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছি?'

'পুরোটা নয়,' বলল রবার্ট। 'শনিবার আমরা ছোট্ট দোকানটা থেকে খাবার আর বিয়ার কিনেছি এবং আজ সকালেই লেকের ধারের ট্রেইলে হাইকিং করেছি।'

'তা ঠিক,' সায় দিল সাবরিনা, 'ওগুলোর কথা ভুলেই গেছিলাম।' সে রবার্টের খোলা উর্ধ্বাংশে হাত ঘষল। রবার্টের বুক রোমশ, পেটটা সমতল, চমৎকার সুগঠিত সরু নিতম্ব আর...

'তোমার কোনো মতলব আছে মনে হচ্ছে,' বলল ও।

'উঁ, আদুরে বেড়ালের মতো শব্দ করল সাবরিনা।

ওর দিকে ফিরে শুলো রবার্ট। প্রেমিকের চোখে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল সাবরিনা। ওকে চুমু খেল রবার্ট, সাবরিনা ফিরিয়ে দিল চুম্বন। ওর মুখ খোলা এবং প্রত্যাশায় ব্যাকুল। রবার্ট সাবরিনার মসৃণ পিঠে হাত বুলাচ্ছে। হাতটা নেমে এল নিতম্বে। রবার্টের দৃঢ় পৌরুষের খোঁচা খাচ্ছে সাবরিনা ওর উরুতে। দুই উরু মেলে ধরল সে।

রবার্ট তার হাতের দুটো আঙুল প্রবেশ করিয়ে দিল সাবরিনার ভেজা গহ্বরে।

শিৎকার দিল সাবরিনা রবার্টের আঙুলগুলোর ঘনঘন আন্দোলনে। হিসহিস করে উঠল সে। 'আমি তোমার জন্য সবসময় প্রস্তুত।'

গায়ের ওপর থেকে চাদর ফেলে দিল রবার্ট, বদল করল পজিশন। ওকে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করার সুযোগ দিল সাবরিনা। প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে আছে রবার্ট। ভীষণ শক্ত পুরুষাঙ্গের গায়ে শিরাগুলো যেন দপদপ করছে।

রবার্ট ওর বুকে উঠে এল, সাবরিনার নরম স্তন জোড়া পিষ্ট হলো রবার্টের পেশী-বহুল বক্ষে। প্রথমে মন্থর গতিতে শুরু করল রবার্ট, তারপর দ্রুততর থেকে উন্মত্ত হয়ে উঠল সে। অবশেষে ঘটল বিস্ফোরণ। সাবরিনা টের পেল রবার্ট গরম রস ঢালতে শুরু করেছে, একই সঙ্গে রেত:পাত ঘটল ওর-ও। দুটো শরীর এক হয়ে রইল, থরথর করে কাঁপছে তারপর আস্তে আস্তে কম্পনের মাত্রা কমে এল। রবার্টকে দুই পা দিয়ে চেপে ধরে শুয়ে থাকল সাবরিনা, বিযুক্ত হতে দিল না।

'আই লাভ য়্যু, সাবরিনা,' বলল রবার্ট।

'আমিও তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি।'

'আমরা বিয়ে করছি না কেন?'

মাথা তুলল সাবরিনা। তাকাল রবার্টের দিকে। 'আমি এইমাত্র কী যেন শুনলাম?'

'তুমি যদি আমাকে বিয়ে করার কথা শুনে থাক, ঠিকই শুনেছ।'

'তুমি ঠাট্টা করছ।'

'আমি কি এরকম অবস্থায় ঠাট্টা করতে পারি?' 'বিশেষ করে এরকম অবস্থায়?'

'ওয়েল, আই মিন ইট। তুমি কী বলো?'

সাবরিনার সারা শরীরে সঞ্চারিত হলো বিদ্যুৎ প্রবাহ। টের পেল আবারও শরীর জেগে উঠছে তার।

'রোমান্টিক কথা বলার কত কায়দা কানুন আছে,' রবার্টের মুখে মুখ রেখে বলল সাবরিনা।

'তুমি যদি চাও আমি কবিতার ছন্দে কথাগুলো বলতে পারি কিংবা তোমার সামনে হাঁটু মুড়েও বসতে পারি।'

'বাহ্, তাহলে তো দারুণ হয়!'

'সিরিয়াসলি বলছি, সাবরিনা, আমি সত্যি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। একসঙ্গে উইকএন্ড কাটানো কিংবা সপ্তাহে যখনই সুযোগ পাই তোমার সঙ্গে মিলিত হতে পারি, সেসব ঠিক আছে। কিন্তু বাকি দিনগুলো যে আমার কাটতে চায় না। আমি তোমাকে হারানোর ঝুঁকি কোনোভাবেই নিতে পারব না।'

'তুমি কথাগুলো নিশ্চয় মন থেকে বলছ না।'

'একশোবার মন থেকে বলছি।'

'আমরা লিভ টুগেদার করতে পারি।'

'আমি সে কথাও ভেবেছি। কিন্তু সত্যি বলছি আইডিয়াটা আমার পছন্দ হয়নি। আমি একদম টিপিকাল মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। মিডলক্লাস ধ্যান ধারণা নিয়ে বড় হয়েছি। লিভ টুগেদারের ভাবনাটি আমার কাছে বড্ড অস্বস্তিকর। তাই আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

'ওহ, মাই রবার্ট, আই ডু লাভ ইউ।'

'তাহলে তোমার মতামত কী?'

'আমি রাজি।'

এই নতুন প্রতিশ্রুতি ওদের দু'জনের মধ্যে যেন সৃষ্টি করল নব কাম-উদ্দীপনা। ওরা আবার প্রেম করল। একঘণ্টা পরে বিছানা ছেড়ে একসঙ্গে গোসল সেরে নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য রেডি হলো।

তেইশ

পাহাড়ের অন্ধকার রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে সাবরিনার সঙ্গে মৃদু স্বরে বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগল রবার্ট। দু'জনেই একমত হলো ওদের বিয়েতে কোনো ধুমধাম করবে না, শুধু ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুকে দাওয়াত দেবে। বিয়ের জন্য অক্টোবর মাসটাই প্রকৃষ্ট সময়, ওয়ার্ল্ড সিরিজটা তখন শেষ হয়ে যাবে।

পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসার পরে রাস্তা সোজা চলে গেছে, সান বারবার ডিনো ফ্রিওয়ে ধরে ওরা ছুটে চলল। ওদের প্রাণবন্ত আলোচনা এ পর্যায়ে এসে একটা ধাক্কা খেল। কারণ গত কয়েকদিনের স্মৃতি আবার মনে পড়ে গেছে সাবরিনার।

উইকএন্ডের বেশিরভাগ সময় সাবরিনা ভান করেছে সুইমিং পুলে তার জীবনে কোনো ভয়ংকর ঘটনা ঘটেনি। এরপরের ঘটনাগুলোও ও জোর করে মন থেকে দূরে রেখেছে। কিন্তু খোলা আকাশের নিচের কেবিন থেকে বাস্তব জগতে ফেরার পরে মনে হচ্ছে এ ভুবনের কোথাও নামহীন ভয়ংকর কিছু একটা ওর জন্য ওঁৎ পেতে রয়েছে। সে রবার্টের উরুতে একটা হাত রাখল। রবার্টও ওকে হাত দিয়ে এক মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করে হাসল। কামারো গাড়িটার বাকেট সিটের কারণে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও রবার্টের শরীর ঘেঁষে বসতে পারেনি সাবরিনা।

সাপ্তাহিক ছুটি কাটিয়ে মানুষজন লস এঞ্জেলেসে ফিরছে। রাস্তায় তাই গাড়ির মিছিল। গাড়ি চালানোয় পুরো মনোযোগ দিল রবার্ট। পথে আর কথা হলো না দু'জনের। সাবরিনারও কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। সে রেডিওতে একটি এফএম স্টেশন চালিয়ে দিল। রক মিউজিক হচ্ছে। চোখ বুজে ক্রিস ক্রিস্টোফারসন আর লিন্ডা রনস্টাডের গান শুনতে লাগল ও।

বিচউড ড্রাইভে, সাবরিনার বাসায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত দশটা বেজে গেল। রবার্ট তার গাড়িটি সাবরিনার ডাটসানের পেছনে দাঁড়া করাল। দু'জনে নামল গাড়ি থেকে। দু'পাশে ঝোপঝাড়, মাঝখানে পথ। এ রাস্তা ধরে সাবরিনা রবার্টকে নিয়ে হেঁটে এগোল নিজের বাসার উদ্দেশে।

ফ্রন্ট ডোরের সামনে এসে রবার্ট হাত থেকে সাবরিনার ব্যাগ নামিয়ে রাখল। ওকে চুম্বন করল। ওকে জড়িয়ে ধরল সাবরিনা। জানে না কেন, হঠাৎ ওর কান্না পাচ্ছে।

'রবার্ট?'

'উ?'

'কাজটা আমাদের না করলেও চলে, তুমি জানো।'

'কী কাজ না করলে চলে?'

'বিয়ে।'

রবার্ট ওর দিকে তাকাল। রবার্টের চোখে গভীর এবং সিরিয়াস দৃষ্টি। 'না, কাজটা না করলে চলে না। তুমি কি অন্যকিছু ভাবছ?'

'না, তা ভাবছি না। শুধু চিন্তা করছিলাম গাছপালা, চাঁদ, কেবিনের রোমান্টিক পরিবেশে হয়তো তুমি আবেগের বশে কথাগুলো বলেছিলে আমাকে।'

দুই হাতের চেটোয় সাবরিনার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা বন্দী করল রবার্ট।

'সাবরিনা, শোনো। আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভীষণ ভীষণ ভালোবাসি। এবং আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমার জীবনে তোমার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আর কেউ নেই।'

ওর হাতে চাপ দিল সাবরিনা। 'কিন্তু তোমার কি ভয় করছে না? মানে বিয়ে করতে?'

'অবশ্যই ভয় করছে। কোন্ বোকা পুরুষের বিয়ে করতে ভয় লাগে না? তোমার ভয় লাগছে না?

'আমারও ভয় লাগছে। তবে তোমাকে না বলতে আরও বেশি ভয় লাগবে। মিস্টার, তুমি আমার ফাঁদে আটকে গেছ।'

রবার্ট ওর চিবুক তুলে ধরে চুমু খেতে যাবে, বাদ সাধল বাড়ির ভেতরে টেলিফোন বেজে ওঠার তীব্র ঝনঝন।

ভুরু কোঁচকাল সাবরিনা। 'অসময়ে কে আবার ফোন করল,' দরজার তালা খুলল ও। 'একটু ভেতরে এসে বসো, রবার্ট। দেখি কে ফোন করল। তারপর তোমাকে বিদায় দেব।'

সাবরিনার পেছন পেছন ঘরে ঢুকল রবার্ট। বন্ধ করে দিল দরজা।

ফোন বাজা বন্ধ হওয়ার আগেই দ্রুত রিসিভার তুলে নিল সাবরিনা। উত্তেজিত এবং তীক্ষ্ণ নিনাদে কথা বলে উঠল ও প্রান্ত থেকে।

'সাবরিনা, থ্যাংক গড, অবশেষে আপনাকে পেলাম। আপনি এ দু'দিন কোথায় ছিলেন?'

'বাইরে ছিলাম। আপনি কে বলছেন?'

'পিটার। পিটার লানডাউ। শুনুন, আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। আমার মনে হয় আমি রহস্য ভেদ করে ফেলেছি।'

'রহস্য ভেদ? কীসের রহস্য ভেদের কথা বলছেন আপনি?'

মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে রবার্টকে সাবরিনা বলল, 'পিটার লানডাউ ফোন করেছে।'

'কী চায় সে?'

'জানি না। ওঁর কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।'

'সাবরিনা, আপনি আছেন তো?'

'হ্যাঁ, আছি, পিটার। ঘটনা কী?'

'সব কথা ফোনে বলা যাবে না,' বলল পিটার।

'কেন বলা যাবে না? অসুবিধা কী?'

'অসুবিধা আছে। আপনি এখানে আসতে পারবেন?'

'সম্ভব না।' দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিল সাবরিনা। 'মাত্রই বাড়ি ফিরলাম। ঘটনার সারমর্ম না জেনে আমি কোথাও বেরুচ্ছি না।'

'তাহলে আমি আপনার বাসায় চলে আসি?'

'পিটার, এখন কারও সঙ্গে আমার দেখা করতে ইচ্ছে করছে না।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে।'

'তাছাড়া, রবার্ট আছে আমার সঙ্গে।'

'যে ইচ্ছা থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না। ড্যাম ইট, সাবরিনা। আমি খোশগল্প করতে আসব না। খুব জরুরি একটা বিষয় আবিষ্কার করেছি। জরুরি এ বিষয়টি আপনার এক্ষুনি জানা উচিত।'

পিটারের কণ্ঠের ব্যাকুল সুর শুনে মনে হলো মানুষটা সত্যি খুব সিরিয়াস।

'ঠিক আছে,' বলল সাবরিনা, 'তাহলে চলে আসুন। তবে দেরি করবেন না। আমি সত্যি খুব টায়ার্ড।'

'পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি।'

লাইন কেটে গেল। রিসিভারের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ওটা যথাস্থানে রেখে দিল সাবরিনা।

'ও জোর করে আসতে চাইছে,' রবার্টকে বলল সাবরিনা। 'বলল খুব জরুরি কী একটা ব্যাপার নাকি আবিষ্কার করেছে আমার জানা খুব দরকার। কেমন অস্থির মনে হলো লোকটাকে। ও আসা পর্যন্ত তুমি থাকতে পারবে?'

'আমাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলেও এ মুহূর্তে নড়ছি না,' বলল রবার্ট।

চুল্লিতে কফির পট চড়িয়ে দিল সাবরিনা তারপর লিভিংরুমে রবার্টের সঙ্গে অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল পিটার লানডাউর জন্য।

বেশ কয়েক ব্লক দূরে, হলিউড অভিমুখী পাহাড়ের নিচে, শক্তিশালী কাঁধের, প্রকাণ্ডদেহী একটি লোক নিঃশব্দে হেঁটে আসছিল সাবরিনার বাড়ির দিকে। লোকটির মুখের চামড়া অস্বাভাবিক কালো এবং স্ফীত। শরীরের দু'পাশে খাড়া হয়ে ঝুলছে হাত জোড়া। লোকটির চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ এবং নিষ্প্রাণ।

চব্বিশ

সাবরিনার সঙ্গে কথা শেষ করে স্ট্রাটোলাউঞ্জারে ধপাশ করে বসে পড়ল পিটার লানডাউ। হাতে তখনও রিসিভার ধরা।

'আমি কেন মরতে এ ঝামেলায় জড়াতে গেলাম?' শূন্য ঘরকে প্রশ্ন করল পিটার।

কোনো জবাব এল না।

জীবনে কখনও কোনো উটকো ঝামেলায় জড়ায়নি পিটার, সব সময় পাশ কাটিয়ে গেছে। কোনোদিন অন্যের ব্যক্তিগত সমস্যায় নাক গলাতে যায়নি। বিশেষ করে সাবরিনা স্টুয়ার্টের মতো ভীতিকর কোনো সমস্যার সঙ্গে।

'ওহ্ শিট, ফাক, গডড্যাম!' জোরে বলল পিটার। চেয়ারের রোমশ হাতলে দুম করে ঘুসি বসিয়ে দিল। তারপর ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে শরীরটা টেনে তুলল সে, বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

ঘণ্টা দশেক আগে পিটার প্রথমবার ফোন করেছিল সাবরিনার নাম্বারে। শনিবার রাতটা নির্ঘুম কেটেছে তার ট্যারট কার্ডের দেয়া মেসেজের অর্থ পুনরুদ্ধারের চেষ্টায়। ওইজা বোর্ডের কাছ থেকেও সে আর সাড়া পায়নি। অবশেষে নিজের সংগ্রহে রাখা অকাল্ট বিষয়ক বইপত্র ঘেঁটে দেখেছে।

গত কয়েক বছরে পিটার এসব বই কিনেছে স্রেফ বুক শেলফে সাজিয়ে রাখার জন্য। চামড়ায় বাঁধানো বইগুলো দেখতেও বেশ সুন্দর। তার মক্কেলরা বইগুলো দেখে মুগ্ধ হয়।

এর আগে অকাল্ট বিষয়ক কোনো বইই খুব একটা মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেনি পিটার। মক্কেলদের কাছে অতি প্রাকৃত কিছু জারগন বমি করার জন্য দু'এক পাতা উল্টে দেখেছে মাত্র। অবশ্য এর আগে বইগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ার বিশেষ কোনো কারণও ঘটেনি। কিন্তু রোববার সকালে বইগুলো এক এক করে পড়েছে সে, যে জবাব পেতে তার ভয় করছিল সেটাই সে বইয়ের পাতায় খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

ওইজা বোর্ডের মেসেজটা লিখে রেখেছিল পিটার। একটা কাগজে বড় বড় অক্ষরে সে লিখেছিল WALKERS 4 SAINT JOHN. অকাল্ট বইগুলোর ধুলো ভরা পৃষ্ঠা সে উল্টে যাচ্ছিল যদি এ মেসেজের সঙ্গে কোনো রেফারেন্স মিলে যায়।

পুরানো বইগুলোর মধ্যেই মেসেজের অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল পিটার।

বইয়ের পাতায় মনোযোগ থাকলেও ওর মনে পড়ছিল সাবরিনা স্টুয়ার্টের বলা মৃত্যু গুহার অভিজ্ঞতার কথা। পিটারের আফসোস হচ্ছিল ভেবে তখন কেন ওর কথাগুলো নোট করে রাখেনি কিংবা মনোযোগ দিয়ে বক্তব্যটাও শোনেনি। ওইসময় আসলে তার মাথায় শুধু মতলব খেলা করছিল কীভাবে সাবরিনাকে বিছানায় নেয়া যায়।

সাবরিনাকে একটি কণ্ঠ ভীত করে তুলছিল। এ কণ্ঠ এখন পিটারের অনুসন্ধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাবরিনা সেন্টজনের নাম বলেছিল, ৪ সংখ্যাটির কথাও উল্লেখ করেছিল। এছাড়াও আর কী কী বলেছে মনে করতে পারছিল না পিটার।

ওইজা বোর্ডের মেসেজ আর সাবরিনার অভিজ্ঞতার মাঝে যে একটা সম্পর্ক আছে সে বিষয়ে এখন সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত পিটার। ট্যারট কার্ড দেখিয়েছে তার নিয়তি সাবরিনার নিয়তির সঙ্গে বাঁধা।

দুপুরের খানিক আগে মেসেজের জবাব উদ্ধার করে ফেলে পিটার। দুটি বই এ রহস্যের মীমাংসায় ভূমিকা রেখেছে। বই দুটো হলো– The Symobolisim of Paranormal Experience এবং Significant Dates in Witchcrat and Demonology.

পিটার বই দুটি বারবার উল্টেপাল্টে দেখছিল এ আশা নিয়ে যে সে হয়তো ভুল করেছে। কিন্তু ভয়ংকর জবাবটা অস্বীকার করার শেষতক কোনো জো ছিল না। এখন কাজে নামতে হবে। প্রথম কাজ হলো সে যা জানতে পেরেছে তা সাবরিনাকে বলা। তারপর দু'জনে মিলে প্ল্যান করবে যে আতংক ওদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তা কীভাবে প্রতিহত করা যায়।

সাবরিনার নাম্বারে বারবার ফোন করেও ওকে না পাওয়ার কারণে হতাশায় কেঁদে ফেলার দশা হয়েছিল পিটারের। সারারাত ট্যারট কার্ড আর ওইজা বোর্ডের সঙ্গে যুদ্ধ, পরদিন সকালে অকাল্ট বইপত্র নিয়ে নাকমুখ গুঁজে পড়ে থাকার পরে সাবরিনার সঙ্গে সত্বর দেখা করাটা তার জন্য খুবই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সাবরিনাকে না পেয়ে রবার্টের বাড়িতেও ফোন করেছিল পিটার। কিন্তু সেখান থেকেও কোনো সাড়া মিলল না। সন্দেহ নেই সাবরিনা আর রবার্ট মিলে কোথাও গেছে। পিটার প্রার্থনা করছিল সাবরিনা যেন যথাসময়ে ফিরে আসে যাতে দেরি না হওয়ার আগেই সে ওর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

গোটা বিকেল তার কেটেছে ওদের দু'জনের নম্বরে পালাক্রমে ফোন করে।

মাঝখানে জোর করে পনেরো মিনিটের একটা বিরতি নিয়েছে। খানিক কালো কফি পান করেছে কিন্তু মুখে কিছু দেয়নি। তার খিদে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

রাতের বেলা ভীষণ মাথা ধরল পিটারের, চোখে জ্বালা করছে খুব। ঘাড় আর পিঠের ওপরের একাধারে পেশীগুলো ইস্পাতের তারের মতো শক্ত হয়ে আছে। বার ছয় ফোনের কাছ থেকে জোর করে সরে এসেছে পিটার, মনোনিবেশ করেছে বইতে। যা খুঁজে পেয়েছে তাতে ভুলত্রুটির অনুসন্ধান করছিল, কিন্তু তার মন জানত তার পাওয়া তথ্যে কোথাও কোনো গলদ নেই। লেখাগুলো যতবার পড়েছে পিটার ততবারই সাবরিনার আসন্ন বিপদ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে সে।

রাত যত বাড়ছিল ততই মনের ভেতর ভয়টা বেড়ে চলছিল পিটারের। কোনো কিছুর ওপরেই বেশিক্ষণ মনোযোগ দিতে পারছিল না। জানত সাবরিনা যেখানেই যাক, ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে সতর্ক থাকতে হবে।

যাতে ঘুম না আসে সেজন্য ঘুম তাড়ানোর দুটো ওষুধ খেয়ে নিল পিটার। কাল সে সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করে দেবে এবং টানা ঘুমাবে। কিন্তু আজ রাতটা ওকে জেগে থাকতে হবে।

রাত দশটার দিকে অবশেষে সাবরিনার সাড়া মিলল। তবে ফোনে সব কথা বলা সম্ভব নয় জেনেই পিটার সাবরিনার বাসায় যেতে চাইছিল। মেয়েটার মুখোমুখি হলে ভয়ংকর বিপদটা সম্পর্কে তাকে সাবধান করে দেয়া যাবে। আর রবার্ট ডান একটা কেন, দশটা রবার্টও এ মুহূর্তে সাবরিনার বাসায় থাকলে পিটারের কিছু এসে যায় না। তাছাড়া রবার্টেরও কথাগুলো জানা দরকার। তাতে ওর ভালো বই মন্দ হবে না। সে যদি প্রাকটিক্যাল মাইন্ডের ইঞ্জিনিয়ারটিকে বোঝাতে পারে বিপদটা বাস্তবিক এবং আসন্ন, রবার্ট হয়তো ওদের দলে চলে আসবে।

ঘরের বাতি না নিভিয়েই বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ল পিটার। লাফাতে লাফাতে নেমে এল সিড়ি বেয়ে। একবার প্রায় উল্টে পড়ে যাচ্ছিল ভাঙা কাঠের সিড়িতে পা বেঁধে। রেইলিং ধরে শেষ মুহূর্তে রক্ষা পেয়েছে। দ্রুত পায়ে রাস্তা পার হয়ে গ্যারেজে চলে এল সে। গ্যারেজটা ওদের বাড়ির নীচে পাহাড়ের পাশে। গ্যারেজের ভেতরে ওর চকচকে, শক্তিশালী করভেট গাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে। লাফ মেরে গাড়িতে উঠে বসল পিটার, চাবি দিয়ে চালু করল ইঞ্জিন, তারপর গর্জন তুলে বেরিয়ে পড়ল আঁধার রাতে।

লরেন কেনিয়ন বুলেভার্ড ধরে সাঁ সাঁ করে ছুটে চলল করভেট। প্রতিটি মোড় ঘোরার সময় পিচের সঙ্গে টায়ারের ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ ক্রিইইচ শব্দ উঠল।

এ যাত্রার যেন শেষ নেই, কেনিয়নের পাদদেশে, হলিউড বুলেভার্ডে পৌঁছে গেল পিটার। বামে বনবন করে ঘোরাল হুইল, পা দিয়ে চেপে ধরল গ্যাস পেডাল। আর

দেড় মাইল পথ বাকি।

রিচউডে চলে এল পিটার, আবছা আলোয় বাড়ির নাম্বারগুলো চোখ কুঁচকে দেখছে। ফুটপাত ঘেঁষে রাখা সাবরিনার ডাটসান গাড়িটি চোখে পড়তে অজান্তে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ত্যাগ করল সে সশব্দে। ওটার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একটি কামারো, সম্ভবতঃ রবার্ট ডানের গাড়ি।

পিটার ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল, লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। ঘন ঝোপঝাড়ে ভরা একটি রাস্তা সোজা গিয়ে ঠেকেছে সাবরিনার বাড়ির সদর দরজায়। পিটার লম্বা কদমে চলল বাড়িটির দিকে।

এমন সময় পেছনে হুড়মুড় করে একটা শব্দ হলো। পাঁই করে ঘুরল পিটার। বিরাট একটা ঝোপ ভেঙে মাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে এক লোক। লোকটা ছয় ফুটের ওপর লম্বা, তেমনই চওড়া। পেশীবহুল কাঁধ, বুকটা ফুলে আছে ড্রামের মতো। তার হাতজোড়া অদ্ভুতভাবে সামনের দিকে বাড়ানো। এক হাতের মুঠোয় রশির মতো কী যেন ঝুলছে।

লোকটা পিটারকে লক্ষ করেছে বলে মনে হলো না। সে বিরাট বিরাট পা ফেলে এগিয়ে চলল সাবরিনার বাড়ির দিকে। পিটার বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে।

'অ্যাই–' বলতে গেল সে, আর ঠিক তখন লোকটার মুখটা দেখতে পেল পিটার। চামড়া কালো, যেন পঁচে গেছে। ঠোঁট জোড়া দু'দিকে বেঁকে গিয়ে এবড়োখেবড়ো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। আর তার চোখ! ও চোখে কোনো আলো নেই। মাছের মতো নিষ্প্রাণ চোখ। একমাত্র মৃত মানুষের চোখ ওরকম হয়।

ঈশ্বর, আঁতকে উঠল পিটার। এ তো ওদেরই একজন।

নড়ার আগেই লোকটা প্রায় পিটারের গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কালো প্রকান্ড মুখটা হিংস্র অভিব্যক্তিতে ভরা। প্রাণহীন চোখের দৃষ্টি সাবরিনার বাড়ির ওপর।

কী করছে বুঝে ওঠার আগেই, পিটার লোকটাকে হাত তুলে বাধা দিতে গেল। বিশালদেহী ঘুসি মেরে পিটারের হাত সরিয়ে দিল। পিটার লোকটাকে লক্ষ্য করে এবারে লাফ দিল, মুখ খুলল চিৎকার করে সাবরিনাকে সাবধান করে দেবে।

কিন্তু পিটারের মুখ থেকে চিৎকারটা আর বেরুতে পারল না। দানব লোকটার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেছে। সে হাতের রশির মতো জিনিসটা চোখের পলকে পিটারের গলায় পরিয়ে দিল এক হ্যাঁচকা টান।

গলার কাছে হাত চলে এল পিটারের, নখগুলো থাবা মারছে শূন্যে বাতাসের জন্য। স্পর্শ পেয়ে বুঝতে পেরেছে ওটা রশি নয়, সিল্কের নেকটাই। ও যত ধস্তাধস্তি

করল ততই গলায় এঁটে বসল ফাঁস।

বিশালদেহীর মুখটা পিটারের চোখের সামনে দুলছে। আলোর রেখাগুলো নাচছে। গলার চাপটা অসহ্য যন্ত্রণাময়। শেষ মুহূর্তে সেই ট্যারট কার্ডটির কথা মনে পড়ে গেল ওর– দ্য হ্যাংগড ম্যান। জল্লাদ। ঝট করে একটা শব্দ হলো। ঘাড়ের হাড় ভেঙে গেছে পিটারের। সে নেতিয়ে পড়ল।

দানবসম লোকটা, তখনও হাতে ধরে আছে নেকটাই, পিটারের লাশ টানতে টানতে ফার্নের একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে এল। ঝোপটা বাড়ি বা রাস্তা থেকে দেখা যায় না। হতভাগ্য পিটারের অনড় দেহ ওখানে ফেলে রেখে ঘুরল প্রকাণ্ডদেহী। তারপর থপথপ করে এগোতে লাগল সাবরিনার বাড়ি অভিমুখে।

পঁচিশ

বাড়ির ভেতরে পিটারের জন্য অপেক্ষা করছিল সাবরিনা এবং রবার্ট। পুরানো ফার্নিচারের দোকান থেকে কেনা একটি নীচু সোফায় গা ঘেঁষাঘেষি করে বসে আছে দু'জনে। ফায়ারপ্লেসে লাকড়ি জ্বলছে বটে তবে তেমন একটা উত্তাপ ছড়াতে পারছে না। ওরা মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলছে আর ঘনঘন তাকাচ্ছে সদর দরজার দিকে।

'পিটার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে কেন?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

'জানি না,' জবাব দিল সাবরিনা। 'তবে কারণ যা-ই হোক, ওর কণ্ঠ শুনে মনে হলো খুব সিরিয়াস কিছু।'

ওদের কথা ফুরিয়ে গেল, নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল দুই যুবক-যুবতী।

হঠাৎ বাড়ির সামনে একটা শেরগোলের আওয়াজ শুনে চমকে উঠল দু'জনেই। প্রথম ধুপ করে একটা শব্দ হলো, তারপর অস্ফুট পা টেনে টেনে চলার আওয়াজ। ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। হাসার চেষ্টা করল রবার্ট কিন্তু হাসি এলো না।

'নিশ্চয় পিটার,' মন্তব্য করল সাবরিনা।

'নিশ্চয়।'

সোফা ছেড়ে দরজায় পা বাড়াল সাবরিনা। খুলল। উঁকি দিল অন্ধকারে। প্রথমে কিছুই ঠাহর হলো না। তারপর লন ধরে এগিয়ে আসা একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল। পুরুষ মানুষ।

'পিটার? ইজ দ্যাট ইউ?' ডাকল বটে সাবরিনা তবে যে এগিয়ে আসছে তাকে দেখেই বোঝা যায় এ পিটার নয়। কারণ এ লোক পিটার ল্যানডাউ'র চেয়ে অনেক বেশি লম্বা-চওড়া, বৃষস্কন্ধ। হতভম্ব হয়ে গেল সাবরিনা।

'পিটার না?' লিভিং রুম থেকে জানতে চাইল রবার্ট।

'মনে হয় না।'

গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল সাবরিনার। বাইরের বাতির কথা মনে পড়তে এক ঝটকায় লাইটের সুইচ অন করে দিল। জ্বলে উঠল বিদ্যুৎ বাতি। আলোয় ওর দিকে এগিয়ে আসা বিশালদেহীকে এবার পরিষ্কার দেখতে পেল সাবরিনা। মুখটা

কালো এবং ফোলা। চোখজোড়া ভাষাহীন, আলো পড়েও চকচক করছে না।

ডোরবেলে হাত রেখে এক কদম পিছিয়ে গেল সাবরিনা।

'কী ব্যাপার?' বলল ও।' 'আপনি কী চান?'

লোকটা জবাব দিল না। সে এক লাফে চলে এল দরজার সামনে, দড়াম করে ঘুসি মেরে বসল প্যানেলে। সাবরিনার হাত থেকে ছুটে গেল ডোর নব, দরজাটা ভেঙে দেয়ালে উড়ে গিয়ে পড়েছে। ধাক্কার চোটে লিভিংরুমের দিকে পিছিয়ে গেল সাবরিনা।

লাফ মেরে খাড়া হলো রবার্ট, দোরগোড়ার লোকটার দিকে কটমট করে তাকাল। 'এই যে! এসব কী হচ্ছে?

লোকটা রবার্টের দিকে ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। মরা মাছের মতো চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে সাবরিনার ওপর। পিছু হটল সাবরিনা, অজান্তেই আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত জোড়া উঠে গেছে সামনের দিকে।

'ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো,' বলল রবার্ট। সে এক লাফে চলে এল লোকটার সামনে।

অনুপ্রবেশকারী তার একটা হাত ঠেকাল রবার্টের বুকে, ধাক্কা মারল। খুব একটা জোরে আঘাত করেনি সে কিন্তু ওই ধাক্কার চোটেই ডিগবাজি খেয়ে একটা কফি টেবিলের ওপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল রবার্ট। লোকটা ওকে অগ্রাহ্য করে এগোতে লাগল সাবরিনার দিকে। লোকটা মোটা, ধ্যাবড়া আঙুলের দুটো হাত বাড়িয়ে রেখেছে সামনে ওকে ধরার জন্য।

সাবরিনা পিছু হটতে হটতে দেয়ালে ঠেকে গেল পিঠ।

'না।' চিৎকার দিল ও।' আমার কাছে আসবে না!'

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল রবার্ট। ক্রুদ্ধ চিৎকার ছেড়ে ধাবিত হলো অনুপ্রবেশকারীর দিকে। মুঠো পাকিয়ে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে দড়াম করে মেরে বসল লোকটার চোয়ালে। যেন গদার বাড়ি পড়ল গায়ে কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা আঘাতটা টেরই পেল না! সে সাবরিনার দিকে এগিয়েই চলেছে। আবার সামনে বাড়ল রবার্ট এবং দ্বিতীয় ঘুসিতে লোকটার ওপরের ঠোঁট ফাটিয়ে দিল। ঠোঁট কেটে বেরিয়ে পড়ল দাঁত এবং মাড়ি।

সাবরিনাকে ধাওয়ায় বিরতি দিল বিশালদেহী, বিরাট একটা হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল রবার্টের বাহু। তারপর যেন কোনো শিশুকে তুলে নিচ্ছে, এক ঝটকায় ওকে শূন্যে তুলে নিয়েই ছুড়ে মারল দেয়ালে। কাঠের শক্ত বীমে ঠকাশ করে বাড়ি খেল রবার্টের মাথা। হাত-পা ভাঙা পুতুলের মতো পড়ে গেল মেঝেয়। আর নড়ল না।

এ সুযোগটা কাজে লাগাল সাবরিনা। সরে গেল দেয়ালের সামনে থেকে।

প্রকাণ্ডদেহী এখন তার ফ্রন্ট ডোরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওই পথে সাবরিনার পালাবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে। লোকটার অসম্ভব ক্ষিপ্র গতি লক্ষ করেছে সাবরিনা। কাজেই ডজ দিয়ে এর পাশ দিয়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা বাতুলতা। সে কিচেনের দিকে দৌড়াল। পেছনে শুনতে পেল লোকটার থপথপ পা ফেলার শব্দ। এগিয়ে আসছে ওর দিকেই।

রান্নাঘরের খিড়কির দোর বন্ধ। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল সাবরিনার। লোকটা ওর পিছু নিয়ে কিচেনে ঢুকে পড়েছে। ডরের চোটে পেছন ফিরে দেখার সাহস হলো না সাবরিনার। তবে লোকটার গলা দিয়ে ঘরঘর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

খিড়কির দুয়ারের ছিটকিনি নিয়ে টানাটানি করছে সাবরিনা। খুলতে পারছে না। আতংকে আর ভয়ে কেঁদে ফেলল ও। অকস্মাৎ খুলে গেল ছিটকিনি, খোলা দরজা দিয়ে বাতাসের বেগে বেরিয়ে গেল সাবরিনা।

কিচেন ডোর থেকে শুরু হওয়া সরু পেভমেন্টের ওপর দিয়ে ছুটছে ও, হঠাৎ অন্ধকারের চেয়েও কালো কী যেন একটা ওর পায়ের নীচে চাপা পড়ল। হোঁচট খেল সাবরিনা, তাল সামলাতে না পেরে দড়াম করে পড়ে গেল ঘাসের ওপর। ম্যাওও চিৎকার দিয়ে কালো বেড়ালটা বাড়ির কিনারে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বিশালদেহী। এগিয়ে গেল সাবরিনার কাছে। সাবরিনার গায়ের ওপর ঝুঁকেছে সে, তার কালো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঝিলিক দিল সাদা দাঁত। হাত বাড়িয়ে দিল সে সাবরিনাকে ধরার জন্য।

ছাব্বিশ

ঘাসের ওপর ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে সরে গেল সাবরিনা, কোনোমতে খাড়া হলো। বাড়ির সামনের দিক দিয়ে পালাবার উপায় নেই। কারণ অনুপ্রবেশকারী ওখানটায় পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। তাই বামে, বাড়ির পিছন দিক লক্ষ্য করে ছুট দিল সাবরিনা।

বাড়ির সামনের চেয়ে পেছনের অংশে ঘাস ঘন এবং লম্বা হয়ে জমেছে। আগাছা আর কাঁটা ঝোপঝাড় সাবরিনার চলার পথে বাধার সৃষ্টি করল, ওকে খামচে ধরতে চাইছে। সাবরিনার অনুসরণকারী এসব কাঁটা ঝোপের তোয়াক্কা না করে লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে।

দৌড়াতে দৌড়াতে ঘাড় ঘুরিয়ে দানবটাকে দেখতে গিয়েছিল সাবরিনা, দুম করে কীসের সঙ্গে যেন বাড়ি খেল। তবে জিনিসটা সরে গেল না সামনে থেকে। সাবরিনার বুক হিম হয়ে গেল বুঝতে পেরে যে সে আইভি লতায় মোড়ানো সাতফুট লম্বা বেড়াটির সঙ্গে বাড়ি খেয়েছে। তার বাড়ি আর নতুন অ্যাপার্টমেন্ট ভবনকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এটি। বেড়ার মাথায় তীক্ষ্ণধার তাঁরকাটা বসানো। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই এ বেড়া বেয়ে ওঠা সাবরিনার জন্য কষ্টকর আর এ মুহূর্তে এক ম্যানিয়াকের ধাওয়া খেয়ে এরকম কিছু চিন্তাই তো অকল্পনীয়।

বেড়ার পাশ ঘেঁষে ছুটতে লাগল সাবরিনা, কয়েক কদম পরপরই হোঁচট খাচ্ছে। সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে লাগল ও। কিন্তু ওর চারপাশে কেবলই অন্ধকার। অনুসরণকারী মাঝে মাঝেই থেমে যাচ্ছে ওকে খোঁজার জন্য। আঁধারে সাবরিনার চেয়ে সে-ও খুব একটা ভালো দেখতে পাচ্ছে না।

অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের জানালাগুলোর বাতি জ্বলে উঠতে শুরু করল। কয়েকটি মাথা উঁকি দিল। ভেসে এল নানাজনের কণ্ঠস্বর।

'ওখানে হচ্ছেটা কি?'

'কে ও?'

'তোমার সাহায্য দরকার?'

'ঘটনা কি?'

সাবরিনা আঙুল দিয়ে খামচে ধরল বেড়া। আইভি লতার ফাঁক দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের দিকে তাকাল। মাত্র কয়েক গজ দূরে ভবনটি অথচ মনে

হচ্ছে যোজন মাইল দূর।

'বাঁচাও!' গলা ফাটাল সাবরিনা। 'আমাকে বাঁচাও।'

সাবরিনা জানে ওর চিৎকার শুনলেও অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে লোকজনের নেমে আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। বেড়াটির কারণেই ওখানে পৌঁছাতে তাদের দেরি হবে।

সাবরিনার পেছনে ঝোপঝাড় ভাঙার শব্দ হলো, বেরিয়ে এল লোকটা। শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, হাত জোড়া থাবার মতো বাড়ানো। থাবা মারল সে সাবরিনাকে। বাউলি কেটে তার থাবার হামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করল সাবরিনা। ওর ফুসফুস বাতাসের অভাবে দপদপ করছে, চিৎকার করার কারণে জ্বলছে গলা। ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ছুটল ও। ধারালো ডালের আঘাতে ছিঁড়ে গেল জামাকাপড়। প্রচণ্ড অসহায়বোধ করছে সাবরিনা।

হঠাৎ একটা গাছের শিকড়ের সঙ্গে পা বেঁধে দড়াম করে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল ও। হুশ করে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে গেল বাতাস। মাটিতে মোচড় খেল সাবরিনা, একটু বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে। ঝোপটা দু'ভাগ হয়ে গেল। আত্মপ্রকাশ করল বিশালদেহী। সে শূন্য, খোলা চোখ মেলে এক মুহূর্ত দেখল সাবরিনাকে। ফাঁক হওয়া ঠোঁট ভয়ংকর বিদ্রুপের ভঙ্গিতে বেঁকে আছে। তার সামনে অসহায়ভাবে শুয়ে থাকল সাবরিনা। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে শরীর। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। লোকটা হাত বাড়িয়ে দিল ওর গলা লক্ষ্য করে।

'ইয়ায়ায়ায়াহ্!' সাবরিনার হামলাকারীর পেছনের কোথাও থেকে তীব্র, তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ভেসে এল। ইতস্তত: করল দানব, মাথাটা একদিকে কাত হয়ে গেল। শুনছে। ঝোপঝাড়ে তীব্র আন্দোলনের শব্দ। ঘুরল সে।

শুয়ে থেকেই সাবরিনা দেখতে পেল ছুটে আসছে রবার্ট, হামলা করতে যাচ্ছে প্রকাণ্ডদেহীকে। ওর একটা হাত ওপর দিকে উঁচু হয়ে আছে। মুঠোতে কী যেন একটা ধরে রেখেছে। ও কাছে আসতেই জিনিসটা চিনতে পারল সাবরিনা। ফায়ারপ্লেসে আগুন উস্কে দেয়ার পোকার বা লৌহ শলাকা। হামলাকারী সাবরিনাকে ছেড়ে দিয়ে রবার্টের মুখোমুখি হলো।

'ওর সামনে থেকে সরে যাও,' হুকুম দিল রবার্ট। লোকটার ছয় হাত দূরে এসে থামল। হাতের লৌহশলাকাটি দোলাল।

'সরে যা। পিছিয়ে যা।'

বিরাট শরীরের মানুষটার গলা দিয়ে নিচু স্বরে জান্তব একটা আওয়াজ বেরুল, পরক্ষণে সে ঝাঁপ দিল রবার্টকে লক্ষ্য করে। তার লাফটা আকস্মিক হলেও রবার্ট রেডিই ছিল। হাতুড়ির বাড়ি মারার মতো পোকারটা বিদ্যুৎ গতিতে নেমে এল

লোকটার মাথার ওপর। বিশালদেহী আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা পর্যন্ত করল না। ভারী লৌহশলাকা ভয়ানক জোরে আছড়ে পড়ল তার মাথায়। কিন্তু লোকটার গতি এতে বিন্দুমাত্র হ্রাস পেল না।

দানবের মাথায় বিশ্রী থ্যাচ শব্দে আঘাত হেনেছে পোকার। শব্দটা গা গুলিয়ে দিল সাবরিনার।

বমি বমি ভাবটা আবার তাকে নিঃশ্বাস নিতে সাহায্য করল। সে বেড়া খামচে ধরে উঠে বসল। হামাগুড়ি দিয়ে দেখছে লড়াই। অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের জানালা থেকে ছিটকে আসা আলো দৃশ্যটাতে ভৌতিক একটা আবহ সৃষ্টি করেছে।

পোকারের প্রচণ্ড আঘাত একটুও কাবু করতে পারেনি প্রকাণ্ডদেহীকে। সে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সজোরে আঘাত করল রবার্টকে। রবার্ট সাথে সাথে মারটা ঠেকিয়ে দিল বটে কিন্তু আঘাতটাতে এমন শক্তি ছিল, ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে। লোকটা আবার সাবরিনার দিকে ফিরেছে, সেই ফাঁকে হাঁচড়ে পাঁচড়ে সিধে হলো রবার্ট।

লোকটাকে ওর দিকে আবার ফিরতে দেখে বেড়া ধরে বহু কষ্টে নিজেকে খাড়া করল সাবরিনা। আবার রবার্টের চিৎকার শুনতে পেল। দেখল লোকটার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ও, পোকারটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে ভীষণ জোরে বাড়ি মারল মাথায়। বাড়ির চোটে খুলির চামড়া কেটে ঝুলে পড়ল। রবার্ট পরপর আরও দু'বার ভয়ংকর আঘাত হানল। পাকা বাঙ্গির মতো ফেটে গেল লোকটার মাথা, ভাঙ্গা খুলির ফাঁক দিয়ে জেলির মতো থকথকে হলুদ পদার্থ বেরিয়ে এসে গাল বেয়ে পড়তে লাগল। তারপরও সে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল সাবরিনাকে ধরতে।

রবার্ট এক ছুটে এসে সাবরিনা আর তার হামলাকারীর মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়াল। তার হাতের ভারী লৌহ শলাকা বারবার উঠল এবং নামল। উঠল এবং নামল। প্রতিটি আঘাতে থ্যাচ থ্যাচ শব্দের মাত্রা বাড়ল।

মুখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছিল সাবরিনা। রক্তের স্বাদ পেয়ে বুঝতে পারল কামড়ে রক্তাক্ত করে ফেলেছে সে আঙুলের গাঁট। মাত্র কয়েক হাত দূরে লোকটা থাবা বাড়িয়ে তখনও ওকে ধরার চেষ্টা করছে আর পোকার দিয়ে তাকে বিরামহীন আঘাত করেই চলেছে রবার্ট। লোকটার চূর্ণ বিচূর্ণ মাথার এখন কোনো আকার নেই, খুলির ভাঙ্গা হাড় হলুদ মগজসহ ঝুলে আছে মুখের পাশে, তরল মগজ প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে ছিটকে যাচ্ছে চারদিকে। অথচ লোকটার ভাঙ্গা মাথা থেকে রক্ত বেরোয়ইনি বলতে গেলে।

এমন সময় ভেসে এল ছুটন্ত পদশব্দ।

মানুষজনের চিৎকার চেঁচামেচি।

অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে আসা লোকজন বেড়া বেয়ে উঠছে, রাস্তা দিয়েও ছুটে আসছে অনেকে ভয়ংকর দৃশ্যপটটির কাছে। এদের আগমন টের পেয়ে পিছু হটল রবার্ট। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে সে। মুখটা ঘৃণায় বিকৃত। তার সামনে দাঁড়িয়ে যে জিনিসটা এখনও দুলছে ওটাকে মানুষ বলে চেনার কোনো উপায় নেই। ওটার মাথার জায়গায় রয়েছে আকৃতিহীন, একটা মাংসপিণ্ড। ওটা দাঁড়িয়ে আছে, ডানে বামে এপাশ-ওপাশ করছে, যেন থেতলানো চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে।

যারা প্রথম দৃশ্যপটে পৌঁছাল তারা প্রকাণ্ডদেহীকে দেখামাত্র ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্যরাও এসে দৃশ্যটা দেখে আঁতকে উঠে পাথরের মতো জমে গেল। চূর্ণ-বিচূর্ণ মস্তিষ্ক নিয়ে ভয়ংকর জিনিসটা বারবার ঘুরছে। কয়েকটি গা ছমছমে মুহূর্ত পার হলো। কেউ কথা বলছে না, কেউ জায়গা ছেড়ে নড়ছে না। তারপর অকস্মাৎ বিশালদেহী দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে এবং আর নড়াচড়া করল না।

মাটিতে পড়ে থাকা দেহটির দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল রবার্ট। তারপর হাতের পোকারটা মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বেড়ার দিকে ছুটল। ওখানে তখনও হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে সাবরিনা। শক্ত হাতে খামচে ধরে রেখেছে বেড়া। রবার্ট বেড়া থেকে ওর হাত ছাড়িয়ে নিল, তারপর ওখান থেকে সরিয়ে আনল। ওর পাশে বসে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রাখল ওকে।

'লেগেছে তোমার?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল রবার্ট।

'না। ও আমাকে ধরতে পারেনি। তোমার, ডার্লিং?'

'মাথায় একটু লেগেছে। এছাড়া ঠিকই আছি আমি।'

ওদের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল।

অ্যাপার্টমেন্ট ভবন এবং রাস্তা থেকে ছুটে আসা কিছু মানুষ ঝোপের মধ্যে পড়ে থাকা লাশটা কৌতূহল নিয়ে দেখছিল। বাকিরা এগিয়ে এল সাবরিনা আর রবার্টের কাছে।

'কী হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'আমি আমার বেডরুমের জানালা দিয়ে সব দেখেছি,' জবাব দিল কে যেন। 'ওই বিশালদেহী লোকটা ম্যানিয়াকের মতো ধাওয়া করছিল মেয়েটাকে। পুরুষ লোকটা বিশালদেহীকে থামানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে থামেনি। অত মার খেয়েও সে তেড়ে যাচ্ছিল মেয়েটার দিকে যেন কিছুই হয়নি।

'যীশাস, লোকটার মাথার দশা দ্যাখো!'

'ধড়ের ওপরে তো থেতলানো মাংসপিণ্ড ছাড়া কিছুই নেই।'

'ভাঙা খুলি নিয়েও সে কী করে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল?'

'ওটা ছিল একটা ম্যানিয়াক।'

ঘাসের ওপর বসা রবার্ট আর সাবরিনার দিকে ঝুঁকল এক লোক। 'তোমরা ঠিক আছ তো?'

'জ্বী,' বলল রবার্ট। 'আমরা ঠিক আছি।' বিশালদেহীর ক্ষত বিক্ষত শরীরের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল, 'ওর কী অবস্থা।'

'ও মরে ভূত হয়ে গেছে।'

'আরে, ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। তোমার কোনো দোষ নেই। আমরা অনেকেই দেখেছি কী ঘটেছে। ওকে মেরে ফেলা ছাড়া তোমার কোনো উপায়ও ছিল না।'

দূর থেকে ভেসে এল পুলিশের গাড়ির সাইরেনের আওয়াজ। ক্রমে বাড়তে লাগল শব্দ।

সাতাশ

ডা. অশোক চৌধুরী এক্সামিনেশন কক্ষে ধাতব একটি টুলে তার রোগিনী মিসেস হেলেন ইঙ্গলসের মুখোমুখি বসেছেন। তিনি টেবিলের কিনারে বসেছেন, ডান হাতটা চেপে ধরে রেখেছেন বাম হাত দিয়ে।

'এখানটায় ব্যথা করে,' লোয়ার ট্রাইসেপে ইঙ্গিত করলেন মিসেস হেলেন। 'কনুই থেকে শুরু করে আঙুলের ডগা পর্যন্ত।'

ডাক্তার হালকাভাবে মহিলার হাত স্পর্শ করলেন। কোথাও ফুলে যায়নি কিংবা ত্বকের রঙে পরিবর্তন ঘটেনি। সামান্য চাপ দিলেন তিনি।

'আউ!' চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস হেলেন।

ডা. চৌধুরী সন্তুষ্ট হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন।

'ব্যথাটা বেশি হয় যখন আমি সার্ভ করি,' বললেন মহিলা, 'এবং ব্যাক হ্যান্ড মারতে যাই।'

'দেখে মনে হচ্ছে টেনিস এলবো রোগে আক্রান্ত হয়েছেন আপনি,' বললেন ডাক্তার। 'এটা হলো টেনিস খেলার কারণে সৃষ্ট কনুইর প্রদাহ। কদ্দিন ধরে খেলছেন?'

'কুড়ি বছর।'

'সম্প্রতি আপনার খেলায় কোনো চেঞ্জ এনেছেন?'

বিব্রতকর ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন ভদ্রমহিলা। 'ওয়েল, আমি আমার সার্ভটা আরও উন্নত করতে চাচ্ছিলাম। মানে আমি আর আগের মতো গতানুগতিকভাবে সার্ভ করতে চাইনি। ডন আমার খেলায় অসন্তুষ্ট হয়ে ডাবলসে আর আমার পার্টনার হতে চায় না।'

স্বামী-স্ত্রী মিলে টিম গঠনের নির্বোধের মতো বুদ্ধি, মনে মনে ভাবলেন ডা. চৌধুরী। মুখে বললেন, 'আপনি আপনার সার্ভে কী ধরনের পরিবর্তন এনেছেন?'

'আসলে আমি মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার খুব ভক্ত। তিনি তো বলটাকে পাউডার বানিয়ে ফেলেন। আমি তাঁর মতো সার্ভ করার চেষ্টা করি এবং তার ফলাফলও পেতে শুরু করি।'

'সে ফলাফলের একটি হলো আপনি কনুইর প্রদাহে ভুগছেন, বললেন ডা. চৌধুরী। 'শুনুন, হেলেন, মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা একজন প্রফেশনাল। তিনি আপনার

চেয়ে ছয় ইঞ্চি লম্বা, ওজনও কমপক্ষে চল্লিশ পাউন্ড বেশি এবং উনি একজন বাঁ-হাতি খেলোয়াড়। আপনি বরং আপনার নতুন সার্ভের জন্য পরে মডেল খুঁজবেন। এখন আগের স্টাইলেই খেলে যান।'

কপালে ভাঁজ পড়ল হেলেন ইঙ্গলসের। তিনি চল্লিশোর্ধ, স্বর্ণকেশী, নীল চোখের এক সুন্দর নারী। 'ডন এটা পছন্দ করবে না।'

'তাহলে তাকে মার্টিনার সঙ্গে খেলতে বলুন। খেলার আগে দুটো অ্যাসপিরিন গিলে নেবেন আর ইলাস্টিক ব্রেস পরবেন, তাহলে আপনার ব্যথাটা কমবে। আর কামানের গোলা ছোড়ার মতো বল সার্ভ করার চিন্তাটা আপাতত: ভুলে যান।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জ্যাকেটটি গায়ে চড়ালেন হেলেন।

'আচ্ছা, আমি ভেবে দেখব।'

এক্সামিনেশন রুম থেকে বেরিয়ে নিজের অফিসে ঢুকলেন ডা. চৌধুরী। ওয়াশরুমে ঢুকে সিঙ্কে হাত ধুয়ে নিলেন। তার ডেস্কের ফোনটি বেজে উঠল। হাত মুছে ফোন ধরলেন তিনি।

'হ্যাঁ, ক্যারল?'

'জনৈক ডা. ব্রিসলাভ আপনাকে ফোন করেছেন।'

প্যাথলজিস্টের নাম শোনামাত্র শিরদাঁড়া টানটান হয়ে গেল ডা. চৌধুরীর। 'আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।'

ক্লিক শব্দ করল লাইন, ডা. চৌধুরী বললেন, 'হ্যালো, কারমিট?'

'হাই, চৌডরী, ব্যস্ত?'

'তেমন কিছু না। কী খবর বলো?'

'গত রাতে লাশ কাটার ঘরে নতুন এক অতিথির আগমন ঘটেছে। তুমি হয়তো তার ব্যাপারে আগ্রহবোধ করবে।'

পেটে সুড়সুড়ির অনুভূতি হলো ডা. চৌধুরীর। 'কে সে?'

'তার নাম এডোয়ার্ড ফ্রাঙ্কোভিচ।'

নামটা মনে করার চেষ্টা করলেন ডা. চৌধুরী, নাহ্, এ নামে তাঁর কোনো রোগী নেই। 'নামটি আমার পরিচিত নয়,' বললেন তিনি।

'নাম নয়, জরুরি বিষয় হলো যেখানে সে মারা গেছে। বিচউড ড্রাইভের একটি বাড়ির সামনে। ওই বাড়িতে সাবরিনা স্টুয়ার্ট বাস করে।'

'সাবরিনা? ও ঠিক আছে তো?'

'যদ্দুর জানি ভালোই আছে। ফ্রাঙ্কোভিচের মৃত্যুর সঙ্গে সেই আগের মতো কিছু অদ্ভুত ব্যাপার জড়িয়ে আছে। তাই ভাবলাম তোমাকে জানাই।'

'আগের মতো মানে?'

'মানে লোকটা দু'বার মারা গেছে।'

এক মুহূর্তের জন্য নেমে এল নীরবতা। তারপর ডা. চৌধুরী বললেন, 'তুমি কি ওখানে আছ কিছুক্ষণ?'

'এ ছাড়া আর কোথায় যাব?'

'আমি এক্ষুনি আসছি। বিষয়টি নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

ফোন রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন ডা. চৌধুরী। নিচের ঠোঁট ধরে টানছেন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। এ মুহূর্তে তাঁর একটি সিগারেট খুব দরকার। তিনি রিসিভার ভুলে রিসেপশনিস্টের সঙ্গে কথা বললেন, 'আজ বিকেলে আমার আর কী কী কাজ আছে, ক্যারল?'

ডা. চৌধুরীর সঙ্গে বিকেলে যেসব রোগীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে সে তালিকায় চোখ বুলাল ক্যারল। সবচেয়ে আর্জেন্ট কেসটির রোগীকে এক ব্লক দূরের একটি ক্লিনিকে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন চৌধুরী। বাকি রোগীদের সঙ্গে পুনঃ শিডিউল করতে বললেন ক্যারলকে।

সাদা জ্যাকেটটা খুলে ফেলে পুরানো টুইড জ্যাকেটটা পরে নিলেন ডাক্তার। বেরিয়ে গেলেন ব্যাকডোর দিয়ে। ওয়েটিং রুমে বসা রোগীদের ক্যারল সামলাতে পারবে।

কাজটা খুবই অপেশাদারী হলো, মনে মনে বললেন ডা. চৌধুরী কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে রোগীদের ফাঁকি না দিয়ে উপায় ছিল না। ডা. ব্রিডলাভের ফোন অশুভ সব চিন্তা জাগিয়ে তুলছিল তাঁর মনে। কিন্তু আসল ঘটনা না জানা পর্যন্ত কোনো উপসংহারে আসবেন না চৌধুরী।

বেলা দুটোর সময় তিনি ওয়েস্ট লস এঞ্জেলস রিসিভিং হসপিটালের ডক্টরস পার্কিং লটে এসে প্রবেশ করলেন। লম্বা কদমে এগোলেন ইমার্জেন্সি এন্ট্রান্স, পরিচিত কয়েকজন ডাক্তারের উদ্দেশ্যে মৃদু নড করলেন, এলিভেটরে তাঁকে নিয়ে এল সাব-বেসমেন্টে।

জামাকাপড় ভেদ করে বরাবরের মতো শীতল হাওয়া ঢুকল ডাক্তারের শরীরে। অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা, এ এমন এক জায়গা যা কখনও উষ্ণ থাকে না। মৃত্যুর মতো শীতল। রেফ্রিজারেটেড ড্রয়ারগুলো পাশ কাটিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে গেলেন প্যাথলজি ল্যাবে।

আঠাশ

ঘরের কিনারে জীর্ণ একটি টেবিলে বসে আছেন কারমিট ব্রিডলাভ। চেয়ারটা পেছন দিকে হেলানো, ডাক্তার তাঁর লম্বা পা দুটো তুলে দিয়েছেন একটি লোয়ার ড্রয়ারের ওপর।

পেপারব্যাক ওয়েস্টার্ন পড়ছেন। যথারীতি তাঁর মুখের এককোনে ঝুলছে টুথপিক।

একটি অটোপসি টেবিলে চাদর দিয়ে ঢাকা একটি মনুষ্য লাশ। ডা. চৌধুরী অনুমান করলেন ওটা পুরুষ মানুষের লাশ, লম্বায় হবে ছয় ফুট পাঁচ কিংবা ছয় ইঞ্চি, ওজন ২৪০ পাউন্ডের কাছাকাছি।

'হ্যালো, কারমিট,' বললেন ডা. চৌধুরী। চাদরের নিচের লাশটার দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'এর কথাই বলেছিলে?'

বইয়ের একটি পৃষ্ঠার এক কোনা মুড়ে এক পাশে পেপারব্যাকটা নামিয়ে রাখলেন ডা. ব্রিডলাভ। 'হ্যাঁ, ও-ই।' সিধে হলেন তিনি, টেবিলের সামনে হেঁটে গেলেন, দাঁড়ালেন চৌধুরীর পাশে।

'আজ সকালে লাশটা আমি কাটাছেঁড়া করেছি। ভেতরে কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস পেয়েছি।'

'ওকে একবার দেখা যায়?'

'নিশ্চয়।' টেবিলের ওপরের চাদরটা মুঠো করে ধরলেন প্যাথলজিস্ট। একটু ইতস্তত: করে বললেন, 'দৃশ্যটা খুব একটা সুখকর লাগবে না, চৌধুরী।'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার, ব্রিডলাভ চাদরটা টেনে খুলছেন, তিনি কদম পিছিয়ে গেলেন।

প্রকাণ্ডদেহী এক ব্যক্তির লাশ। অত্যন্ত পেশীবহুল শরীর। বুক থেকে পেট পর্যন্ত ফেড়ে ফেলা কাটা অংশ আবার সেলাই করে জোড়া লাগানো হয়েছে। তবে ডা. চৌধুরী আঁতকে উঠলেন লাশের মাথা দেখে। ধড়ের ওপরে মাথা বলে যে জিনিসটা রয়েছে তা ভাঙ্গা, চূর্ণ-বিচূর্ণ, থেতলানো একটা মাংসপিণ্ড মাত্র। বাঁকা হয়ে আছে মুখ। মাথা এবং মুখ থেকে মুছে ফেলা হয়েছে রক্ত। ছাল ওঠা মাথার ত্বকের নিচে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে টুকরো করে ভাঙা খুলি। ডা. চৌধুরী কল্পনায় দেখলেন অটোপসি করার আগে বিচূর্ণ খুলির অন্তত; আধডজন ফাটল এবং গর্ত দিয়ে তরল

মগজ গড়িয়ে পড়ছে।

'এর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চয় কোনো প্রশ্ন করার দরকার হবে না?' মন্তব্য করলেন তিনি।

সতর্ক দৃষ্টিতে তাঁকে দেখলেন প্যাথলজিস্ট। 'তাই কি?'

ডা. চৌধুরীর মনে পড়ে গেল প্যাথলজিস্ট তাঁকে বলেছিলেন লোকটার দু'বার মৃত্যু ঘটেছে। তিনি বললেন, 'ঘটনাটা খুলে বলো।'

'ওরা গতকাল মাঝরাতে আমার কাছে এ লাশ নিয়ে আসে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল খুন হয়েছে লোকটা। আজ সকালে লাশের দিকে তাকিয়ে বিশেষ করে মাথার দৃশ্যটা দেখে আমার মনে একটা সন্দেহ হয়।'

'কী রকম?' জানতে চাইলেন ডা. চৌধুরী।

'লাশের কন্ডিশন রিপোর্ট লেখা মৃত্যুর সময়ের সঙ্গে মিলছিল না। জানি না ব্যাপারটা কেউ কেন লক্ষ করেনি। ওরা হয়তো ফাঁক হয়ে থাকা খুলির দিকে ভালো করে তাকায়নি পর্যন্ত।'

'তার কারণ আমি বুঝতে পারছি,' মন্তব্য করলেন ডা. চৌধুরী।

'তখনই আমি লক্ষ করি লাশের দেহে পোর্স্টমর্টেম ডিকম্পোজিশনের চিহ্ন। চব্বিশ ঘন্টা আগে কেউ মারা না গেলে লাশের শরীরে এরকম পঁচন ধরে না। প্রমান দেখতে চাও?'

'লাশে কীভাবে পঁচন ধরে তা আমার জানা আছে,' বললেন ডা. চৌধুরী।

'ঠিক আছে। লোকটার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় তার ড্রাইভিং লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি ঘেঁটে। তার কোনো নিকট আত্মীয় নেই জেনে আমি তার শরীরে ছুরি চালাই।'

প্যাথলজিস্ট নাটকীয়ভাবে বিরতি নিলেন।

'কারমিট, তুমি কি এগোবে?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। লোকটার পেট কাটার পরে তার সম্পর্কে যে সন্দেহ করেছিলাম তা আমার মনে পোক্ত হয়। লোকটার মৃত্যু হয়েছে শুক্রবার কোনো এক সময়, রোববার রাতে নয়। তার মৃত্যু দৃশ্য যত লোকেই প্রত্যক্ষ করুক না কেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তখন আমার ওয়েস্টউডের সেই মহিলা গাড়িচালকের কথা মনে পড়ে যায়। মনে হয় বিচউড ড্রাইভের বাড়ির তরুণী আর ওই মহিলার গাড়ি চাপা পড়তে যাওয়া মেয়েটি তো একই জন। তোমার পেশেন্ট। তখন আমি তোমাকে ফোন করি।'

'ফোন করেছ বলে খুশি হয়েছি,' বললেন ডা. চৌধুরী। টেবিলে শোয়া, পেট আর বুক সেলাই করা লাশটার দিকে তাকালেন।

'বাড়ি খেয়ে যদি এর মাথা ফেটে মৃত্যু না হয়ে থাকে তো কীভাবে মারা গেছে সে?'

'শ্বাস বন্ধ হয়ে।'

'আর ইউ সিরিয়াস?'

'একশোবার সিরিয়াস। মুখটা দ্যাখো। শ্বাসরোধ হয়ে মারা গেলে মুখের ত্বক যে রকম কালো হয়ে যায় এর গায়ের চামড়াও তেমন। শরীরের যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমি কাটাকুটি করেছি সেগুলো ছিল কাইয়ানাটিক এবং কনজেস্টেড। থাইমাস, লাংস, পেরিকার্ডিয়াম এবং প্লুরায় হেমারেজ হয়ে গিয়েছিল। স্বরযন্ত্রে অভ্যন্তরীণ ক্ষত দেখে বোঝা যায় সে কিছু গেলার সময় দম বন্ধ হয়ে মারা যায়।'

'ল্যারিনজিয়ান অ্যাপারচারে কোনো বিসদৃশ মেটেরিয়াল পাওয়া যায়নি?'

'আমি লাশ কাটার পরে এরকম কিছু দেখতে পাইনি তবে নিশ্চিত করে বলতে পারি, নিশ্চয় এরকম কিছু ছিল যে কারণে সে শ্বাস নিতে পারেনি।'

'শুক্রবারে।'

'না পরে।'

'তোমার কাছে পুলিশ রিপোর্টটা আছে?'

ডা. ব্রিডলাভ ফিরে গেলেন ডেস্কে, ছড়ানো ছিটানো কাগজপত্র থেকে পুলিশের টাইপ করা রিপোর্টের কার্বন কপিটি খুঁজে নিয়ে চৌধুরীকে দিলেন।

চোখে রিডিং গ্লাস গলিয়ে কাগজটিতে চোখ বুলালেন ডা. চৌধুরী। বিচউড ড্রাইভে সাবরিনা স্টুয়ার্টের বাসার সামনেই হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে, রিপোর্ট পড়ে নিশ্চিত হলেন। বর্ণনায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেন তিনি, এক জায়গায় এসে থমকে গেলেন।

'রবার্ট ডান,' ঘোষণার সুরে বললেন তিনি।

'হোয়াটস দ্যাট?' জিজ্ঞেস করলেন ডা. ব্রিডলাভ।

'এই যে এখানে 'আক্রমণকারী' হিসেবে এর নাম লিখেছে। এ-ই ওই লোকের মাথা গুঁড়ো করেছে। আমি একে চিনি, আমি আর এ লোক একই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে থাকি।'

ডা. চৌধুরী রিপোর্ট পড়া শেষ করলেন, তারপর আরেকবার আগাগোড়া ভালো করে চোখ বুলালেন।

দ্বিতীয়বার পড়া শেষ করে রিপোর্টটি একটি অটোপসি টেবিলের ওপর রাখলেন ডা. চৌধুরী। রিপোর্টটি নিয়ে চিন্তা করছেন। সাবরিনার ওপর এই নতুন হামলা, গত বৃহস্পতিবারে ওকে গাড়ি চাপা দেয়ার চেষ্টা, সে সঙ্গে সুইমিং পুলের দুর্ঘটনা এবং সাবরিনার সেই অদ্ভুত গল্প সব মিলে এমন একটি উপসংহার খাড়া করতে চাইছে

যেটি পছন্দ করতে পারছেন না তিনি, আবার এটা অস্বীকার করারও জো নেই। এখানে যা ঘটছে তা ওষুধপত্র কিংবা ন্যাচারাল সায়েন্সের ব্যাখ্যার বাইরে। এসব ঘটনার একটিমাত্র সম্ভাব্য উপসংহার থাকতে পারে আর তা হলো– মরা মানুষ আবার জিন্দা হয়ে সাবরিনা স্টুয়ার্টকে হত্যা করতে চাইছে।

'অদ্ভুত সব ঘটনা, তাই না?' বললেন ডা. ব্রিডলাভ।

'অদ্ভুত তো বটেই,' সায় দিলেন অশোক চৌধুরী। 'তুমি এটা নিয়ে কী করবে?'

'কোনটা নিয়ে কী করব?'

'ঈশ্বর, কারমিট, তোমার কাছে প্রমাণ আছে এ লোকটা দু'বার মারা গেছে। ফোনেও তুমি আমাকে তা-ই বলেছ। গত সপ্তাহে ওই মহিলাকে নিয়ে একই ঘটনা ঘটেছে। তুমি এ ঘটনা বোর্ডকে জানাবে না?'

'পাগল! আমি এসবের মধ্যে জড়াতে চাই না।'

'তুমি এ কথা কী করে বললে? এটা হয়তো এ সময়ের অন্যতম একটা মেডিকেল স্টোরি হতে পারে।'

'হুঁ, এবং এটা সবচেয়ে হাস্যকর গল্পও হতে পারে। আমাকে এসবের মধ্যে জড়িয়ো না।'

'তোমার দেখছি খুব অ্যাটিটিউড প্রবলেম আছে,' রুষ্ট হলেন ডা. চৌধুরী।

'হতে পারে তবে এসব থেকে আমি দূরে থাকতে চাই।' ডেস্কের কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার ভান করলেন প্যাথলজিস্ট। কিন্তু অশোক চৌধুরী তাঁর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছেন দেখে তিনি হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করে বন্ধুর দিকে মুখ তুলে চাইলেন। 'শোনো, অশোক, আমি এ ব্যাপারটা বোর্ডের কাছে নিয়ে যেতে পারি, বলতে পারি 'এক্সকিউজ মি, নিচতলার হিমঘরে কয়েকজন লোক পেয়েছি যারা মৃত্যুর পরে হাঁটাহাঁটি করে বেড়াচ্ছে এবং মানুষ ধাওয়া করছে। তারপর তারা আবার মারা যাচ্ছে এবং তাদেরকে এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে। আমি ভাবলাম বিষয়টি আপনাদেরকে জানানো দরকার।'

'এতে বোর্ডের দু'রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এক, সদস্যরা সবাই হাসতে হাসতে মারা যাবেন অথবা দুই, তারা আমাকে ধরে বেঁধে, পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবেন। না, আরও একটা কাজ তাঁরা করতে পারেন। তাঁরা আমার কথা শুনবেন, প্রতিটি শব্দ বিশ্বাস করবেন এবং বলবেন যদি চাকরিটা বাঁচাতে চাই তাহলে যেন গোটা ব্যাপারটা ভুলে যাই।'

তর্ক করতে গিয়েও থেমে গেলেন ডা. চৌধুরী। বুঝতে পেরেছেন ব্রিডলাভ যা বলেছেন তা সত্যি। এ গল্পটা এমনই অবিশ্বাস্য যে কেউই বিশ্বাস করবে না। আর ওয়েস্ট লস এঞ্জেলেস রিসিভিং হসপিটালের বোর্ড অব ডিরেক্টরদের বিশ্বাস করার

তো প্রশ্নই নেই।

'গল্পই অন্য কাউকেও বলতে পারো,' বললেন তিনি। 'খবরের কাগজে কিংবা টেলিভিশনে।'

ব্রিডলাভ মুখ থেকে টুথপিক বের করে গম্ভীর গলায় বললেন, 'অশোক, আমি যে চাকরিটা করছি তা নিয়ে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট। আমি এ হাসপাতালের প্রধান প্যাথলজিস্ট। আমার একটি চমৎকার বাড়ি আছে, খুব ভালো একটি স্ত্রী আছে, আমি নির্বিরোধী, শান্ত একটি জীবন যাপন করি। এ জীবন আমি চালিয়ে যেতে চাই। মিডিয়া স্টার হওয়ার কোনো শখ আমার নেই।'

'আমি শুধু বলছি তুমি এখানে যা দেখেছ তা রিপোর্ট করবে,' মৃদু স্বরে বললেন চৌধুরী।

'আইউইটনেস নিউজ এ স্টোরি পেলে কী করবে সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে? কিংবা হেরাল্ড এক্সামিনার? অথবা ন্যাশনাল এনকুইয়ার?'

'তা বটে,' স্বীকার করলেন ডা. চৌধুরী।

'আমি কাজ করে খাই এবং এ কথাটা আমি ভালোভাবেই করছি,' বললেন ব্রিডলাভ। 'আমি অটোপসি করে যা পাই আমার রিপোর্টে লিখে রাখি। কেউ যদি এ নিয়ে কিছু একটা করতে চায় সেটা তার ব্যাপার। তোমার কি এ নিয়ে হৈচৈ করার ইচ্ছে আছে?'

'না, নেই,' ধীর গলায় বললেন ডা. চৌধুরী।

দুই ডাক্তারের মাঝে অল্পক্ষণের জন্য অস্বস্তিকর একটি নীরবতা নেমে এল।

'অশোক, একটা কথা বলি?' অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করলেন ব্রিডলাভ।

'বলো।'

'তোমার এই বন্ধু, তোমার পেশেন্ট, সাবরিনা স্টুয়ার্ট...'

'হ্যাঁ, বলো?'

'আমি তাকে পরামর্শ দেব সে যেন গোরস্তানের ধারে কাছেও না ঘেঁষে।'

প্যাথলজিস্টের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ডা. চৌধুরী। দেখলেন ব্রিডলাভের চেহারা খুব সিরিয়াস। তিনি বললেন, 'তোমার পরামর্শের কথা আমি তাকে বলব।'

পুলিশ রিপোর্টে তিনি আরেকবার চোখ বুলালেন। দেখলেন কেসটির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ড্যান অলিভারকে। নামটা চেনা ডা. চৌধুরীর। ভেনিস এলাকায় বছর দুই আগে সিরিজ রেপ মার্ডারের তদন্ত করছিল এই লোক। তখন তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ডাক্তারের। দু'জনে বেশ বন্ধুত্বও হয়ে যায়।

ব্রিডলাভকে রিপোর্টটি ফেরত দিলেন তিনি। 'আমাকে ফোন করার জন্য

ধন্যবাদ, কারমিট। আমাকে জানিয়ো যদি...' বাক্যটি কীভাবে শেষ করবেন বুঝতে না পেরে চুপ হয়ে গেলেন।

'যদি এরকম কেস আরেকটা হাতে পাই তাইতো?' বললেন ব্রিডলাভ।

'আচ্ছা, জানাবো।'

লাশের সঙ্গে প্যাথলজিস্টকে রেখে এলিভেটরে চেপে ওপরে উঠে এলেন ডা. অশোক চৌধুরী। হলওয়েতে পা বাড়াতেই গরম হাওয়া আলিঙ্গন করল তাঁকে। উষ্ণ বাতাসটা ভালো লাগল ডাক্তারের। নার্সদের একটি ঘরে ঢুকে লসএঞ্জেলেসের পুলিশ সদর দপ্তরে ফোন করলেন। হোমিসাইড বিভাগের সার্জেন্ট অলিভারকে চাইলেন। একটু পরেই জলদগম্ভীর একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল ইথারে।

'অলিভার বলছি।'

'ড্যান, আমি ডা. অশোক চৌধুরী।'

'আপনার গলা শুনে খুশি হলাম, ডক্টর। কেমন আছেন?'

'ভালো আছি। ড্যান, তোমার একটি কেসের বিষয়ে একটু কথা বলতে চাই।'

'কী কেস?'

'এডোয়ার্ড ফ্রাঙ্কোভিচ, হলিউডে রোববার রাতের হোমিসাইড ভিক্টিম।'

'ওহ্, হ্যাঁ। সে এক বিশ্রী অবস্থা। সে কি আপনার পেশেন্ট ছিল?'

'না, তবে মেয়েটি আমার পেশেন্ট। মেয়েটি মানে যার বাড়ির সামনে ঘটনা ঘটেছে।'

অপরপ্রান্তে কাগজ ওল্টানোর খসখস শব্দ।

'সাবরিনা স্টুয়ার্ট,' বলল অলিভার।

'হ্যাঁ, ওই মেয়েটিই।'

'রিপোর্ট বলছে মেয়েটির বয়ফ্রেন্ড রবার্ট ডান ফ্রাঙ্কোভিচকে মেরে ফেলেছে।'

'হ্যাঁ, আমি রবার্টকেও চিনি,' বললেন অশোক।

'ওর জন্য যদি আপনি ফোন করে থাকেন তাহলে বলব ওকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ও কোনো বিপদের মধ্যে নেই। অ্যাপার্টমেন্ট হাউস ভর্তি সাক্ষী পেয়েছি আমরা যারা সবাই বলছে রবার্ট নিজের এবং ওই মেয়েটির জীবন বাঁচাতে ফ্রাঙ্কোভিচকে আঘাত করেছিল। এই ফ্রাঙ্কোভিচটা আসলে একটা উন্মাদ।'

'রবার্টের কোনো ঝামেলা হবে না জেনে খুশি হলাম,' বললেন অশোক। 'তবে শুধু ওর ব্যাপারে কথা বলতে তোমাকে ফোন করিনি।'

'আপনার কোনো ইনফরমেশন দরকার?' হঠাৎ পুলিশি সুর এসে গেল অলিভারের কণ্ঠে।

'ঠিক জানি না। আমরা কি একটু একত্রে বসে কথা বলতে পারি?'

'রবার্ট এবং এই মেয়েটি তাদের স্টেটমেন্ট রেকর্ড করার জন্য কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে চলে আসবে। আপনি আসতে চান?'

'তোমার আপত্তি না থাকলে চাই।'

'ঠিক আছে। তাহলে চলে আসুন। আমি নিচে, গার্ডকে আপনার জন্য ভিজিটর ব্যাজ পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ফোন রেখে ধীর পায়ে জীবাণুমুক্ত করিডর পার হয়ে হাসপাতালের বাইরে চলে এলেন ডা. চৌধুরী। এখন আর পিছু হঠার উপায় নেই। তিনি চান বা না চান পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েছেন এর মধ্যে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ভাবলেন মাত্র সপ্তাহ খানেক আগেও কী চমৎকার সরল জীবন যাপন করছিলেন তিনি। তখন শুধু তাঁকে ভাবতে হতো রোগীদের গলা ব্যথা, হাত ভাঙা আর তাঁর আসন্ন ডিভোর্স নিয়ে।

আহা, সেই সুন্দর পুরানো দিনগুলো! একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গাড়িতে উঠে বসলেন ডা. অশোক চৌধুরী।

উনত্রিশ

লস এঞ্জেলেস পুলিশ বিল্ডিং পুরানো সিটি হলের দিকে বিস্তৃত নতুন মিউনিসিপ্যাল কমপ্লেক্সের একটি অংশ। সাবরিনা স্টুয়ার্ট এবং রবার্ট ডানের সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে ভবনের বারো তলার একটি কক্ষে। ঘরে আসবাব বলতে একটি ছোট কনফারেন্স টেবিল এবং প্যাড বসানো, নরম প্লাস্টিকের খান ছয়েক চেয়ার। ঘরের দেয়ালের রঙ হলদে-ধূসর, কার্পেট ম্যাড়মেড়ে বাদামী। ঘরে আভিজাত্যের একমাত্র চিহ্ন বহন করছে কয়েকটি অ্যাশট্রে। ওগুলোর গায়ে লাসভেগাসের ডিউনস হোটেলের ছাপ মারা।

সার্জেন্ট অলিভার টেবিলের একদিকে বসেছে, তার মুখোমুখি সাবরিনা এবং রবার্ট। সার্জেন্ট বলিষ্ঠ গড়নের, মাথায় ঝলমলে কালো চুল, নিখুঁত ছাঁটের গোঁফ, দাঁতের ফাঁকগুলো বড়বড়। টেবিলের দূর প্রান্তের একটি চেয়ার দখল করেছেন ডা. অশোক চৌধুরী। তাঁর চেয়ারটি এমনভাবে বসানো যে দেখলেই বোঝা যায় আজকের দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে তিনি কোনো ভূমিকা রাখছেন না।

সাবরিনা এবং রবার্ট উভয়কেই বেশ নার্ভাস লাগছে এবং দু'জনে একটু পরপর একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে পরস্পরকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে। ঘনঘন ধূমপান করে চলেছে সাবরিনা, ওদিকে বুড়ো আঙুলের নখের ডগা দাঁত দিয়ে খুঁটছে রবার্ট। আলাপচারিতার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে চলেছে অলিভার। দু'জনকে প্রায়ই মনে করিয়ে দিচ্ছে এডোয়ার্ড ফ্রাঙ্কোভিচের মৃত্যুর জন্য তাদেরকে দায়ী করা হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগও আনা হবে না।

'আমি যা চাই,' বলল অলিভার, 'তাহলো গত রাতে কী ঘটেছে তা আপনারা দু'জনে আমাকে বলবেন, বাড়ির বাইরে ফ্রাঙ্কোভিচকে দেখার পর থেকে পুলিশ আসা পর্যন্ত যা ঘটেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেবেন। আপত্তি না থাকলে আপনাদের স্টেটমেন্ট আমি রেকর্ড করে রাখব অথবা চাইলে আমি স্টেনোগ্রাফারও ডেকে পাঠাতে পারি।'

'টেপ রেকর্ডারে আমার কোনো সমস্যা নেই,' বলল সাবরিনা। তার কথায় সম্মতি জানাল রবার্ট।

'আপনাদের দু'জনকেই ট্রান্সক্রিপ্ট দেখানোর পরে সই নেয়া হবে,' বলল অলিভার। সে ক্যাসেট যন্ত্রের রেকর্ড লেখা লিভারটি দাবিয়ে ধরে প্রথমে সাবরিনাকে

তারপর রবার্টকে রোবাবার রাতের ভয়ংকর ঘটনাটি বলার সুযোগ দিল।

ডা. নীরবে বসে থেকে দুই যুবক-যুবতীর কথা শুনে গেলেন। ওরা নিচু স্বরে কথা বলল। চোখে ফুটল সেই অভিজ্ঞতার আতংক। মৃত মানুষটা সম্পর্কে ডাক্তার জানেন কিন্তু ওরা কিছুই জানে না মনে পড়তে শিউরে উঠলেন চৌধুরী।

সাবরিনা এবং রবার্টের গল্প বলা শেষ হলে টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে দিল সার্জেন্ট অলিভার। মেঝেয়, পায়ের কাছে রাখা একটি অ্যাটাচি কেস তুলে নিল সে। কেসের ডালা খুলে আট বাই দশ সাইজের একটি ছবি বের করল। সাদা কালো ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি পাম গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখের ইয়া তাগড়া এক লোক। পরনে পশমি শার্ট আর জিনস প্যান্ট। ভিড়ের মধ্যে আলাদাভাবে তাকে চেনার মতো কোনো বৈশিষ্ট্য নেই চেহারায়।

'লোকটাকে চেনেন?' জিজ্ঞেস করল অলিভার।'

ছবিটিতে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে মাথা ঝাঁকাল সাবরিনা এবং রবার্ট।

'সেই লোকটা,' বলল সাবরিনা, 'এ সেই লোক। তবে গত রাতে তাকে অন্যরকম লাগছিল।'

'অন্যরকম কোন্ অর্থে?'

'এক নম্বর হলো তার মুখে হাসি ছিল না,' জবাব দিল সাবরিনা, 'দ্বিতীয়ত তার চেহারায় কেমন উদভ্রান্ত একটা ভাব ছিল।'

'আর তার মুখটা ছবির চেয়ে অনেক বেশি কালো ছিল,' যোগ করল রবার্ট। 'প্রায় বেগুনিই বলা যায়।'

'কিন্তু এই লোকটিই তো আপনাদের ওপর হামলা চালিয়েছিল তাই না?'

'জ্বী।' বলল সাবরিনা।

'ওই চেহারা জীবনেও ভুলব না আমি,' বলল রবার্ট।

মাথা ঝাঁকাল ডিটেকটিভ। 'সাবরিনা, ছবিটা আবার ভালো করে দেখুন এবং মনে করার চেষ্টা করুন রোববার রাতের আগে এ লোককে কোথাও দেখেছেন কিনা?'

চোখ কুঁচকে ছবিটি দেখল সাবরিনা। তারপর মাথা নাড়ল।

'নাহ্, রোববার রাতেই একে প্রথম দেখি আমি।'

'কর্মক্ষেত্রে কখনও এর সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি? কিংবা সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে?'

'না।'

'কোনো ক্যাজুয়াল মিটিং, দোকানে, সিনেমা হলে অথবা গ্যাস স্টেশনে?'

ডানে বামে মাথা নাড়ল সাবরিনা। 'আমি নিশ্চিত গতরাতের আগে এ লোককে আমি কোথাও দেখিনি।'

'আর আপনি, রবার্ট?'

'এ লোককে আমিও চিনি না। কখনও দেখা হলে এরকম দশাসই একটা চেহারা নিশ্চয় মনে থাকত।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অলিভার। 'আপনি ওকে চিনবেন সে আশাও আমি করিনি,' তবে ভেবেছিলাম সাবরিনা হয়তো একে আগে কোথাও দেখে থাকবে। লোকটা সাবরিনাকেই হামলা করতে গিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কারণটা জানা গেলে খুব ভালো হতো।'

সাবরিনা হঠাৎ শিউরে উঠল, রবার্ট ওর হাত ধরে মৃদু চাপ দিল।

'আপনার কোনো শত্রু আছে, সাবরিনা?' জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট।

'এমন কেউ যে আপনাকে হত্যা করতে চায়?'

'না, না,' জোর দিয়ে বলল সাবরিনা। 'অনেক লোকের সঙ্গেই আমার নানান সময়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে, তাদের মতের সঙ্গে আমার মত মেলেনি তবে সেসব কোনো সিরিয়াস বিষয় ছিল না। সামান্য মতবিরোধ থেকে এরকম কিছু ঘটা... না, এ হতেই পারে না।'

পকেটসাইজ নোটবুকে কী যেন লিখে নিল অলিভার, তারপর ওদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল। 'ব্যস, আজ এ পর্যন্তই। এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ।'

'তাহলে কি আমরা এখন যেতে পারি?' জানতে চাইল সাবরিনা।

'নিশ্চয়।'

চেয়ার ছাড়ল সাবরিনা এবং রবার্ট, এগোল দরজার দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে পেছন ফিরে ডা. চৌধুরীর দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল সাবরিনা।

'সার্জেন্টের সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে,' বললেন চৌধুরী।

'আমরা পুরানো বন্ধু,' জানাল অলিভার।

'আপনার সঙ্গে কি আমরা পরে দেখা করব, ডক্টর?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

'আমি রাতে তোমাদেরকে ফোন করব'খন। তিনজনে মিলে বসা দরকার।'

ওরা দু'জন বিদায় নিয়ে চলে গেল। যেন এই বন্ধ ঘর থেকে পালিয়ে বাঁচল।

ওরা চলে যাওয়ার পরে সার্জেন্ট অলিভার ছবিটি ঠেলে দিল ডা. চৌধুরীর সামেন। 'আপনার কী মনে হয়, ডাক্তার?'

সহজ সরল চেহারার, হাসিমুখের বিশালদেহী মানুষটার ছবির দিকে তাকালেন ডা. অশোক। 'হাসপাতালে যাকে দেখে এসেছি তার সঙ্গে একে মেলানো খুব কঠিন।'

'এ সেই লোকই, লোকটার বাড়িওয়ালির কাছ থেকে ছবিটা জোগাড় করেছি। বছরখানেক আগে তোলা ছবি। তখন এরা দু'জন এক সঙ্গে ডেটিং করত। তবে মাস

কয়েক আগে তাদের সম্পর্ক ছুটে যায় বলে জানিয়েছে বাড়িওয়ালি।'

'এ লোকটা আসলে কে, ড্যান?'

অ্যাটাচি কেস থেকে স্ট্যাপল মারা একতাড়া কাগজ বের করল অলিভার। 'এর পুরো নাম এডোয়ার্ড ডেভিড ফ্রাঙ্কোভিচ,' কাগজ পড়ে সে বলতে লাগল। 'জন্ম ১৯৩১ সালের ১ মার্চ মিশিগানের মাস্কেগনে। কোরীয় যুদ্ধে সেনাবাহিনীর হয়ে অংশ নিয়েছে। কর্পোরাল পদ পাবার পরে সেনাবাহিনী থেকে ডিসচার্জ হয়। পার্পল হার্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। ১৯৫৮ সালে বিয়ে করেছিল। পরের বছরই ডিভোর্স হয়ে যায়। ফিগোরায় ম্যাককয়স অটো রিপেয়ার এ গত চার বছর ধরে কাজ করেছে। হান্টিংটন পার্কে একাকী বাস করত। কোনো নিকটাত্মীয় নেই, ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই, পুলিশের হাতে কখনও গ্রেপ্তার হয়েছে বলেও শোনা যায়নি।'

'এ লোকের কোনো মানসিক অসুস্থতা ছিল?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

'সেরকম কিছু শুনিনি।'

'ভেরি ব্যাড।'

'কেন?'

'কারণ সে মানসিকভাবে অসুস্থ থাকলে তবু তার উদ্ভট আচরণের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেত।'

'হুঁ,' অলিভার ডাক্তারের দিকে তাকাল। 'আমাকে নাকি কি জরুরি কথা বলবেন?'

'পরে বলব,' বললেন ডাক্তার। 'তুমি এখন কোথায় যাবে?'

'যে গ্যারেজে ফ্রাঙ্কোভিচ কাজ করত তার মালিকের সাথে কথা বলব।'

'আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি?'

'নিশ্চয়,' অলিভার ক্যাসেট রেকর্ডার, ফ্রাঙ্কোভিচের ছবি আর স্টাপল করা রিপোর্টের কাগজপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে অ্যাটাচি কেসে ঢোকাল। তাকাল ডাক্তারের দিকে। 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি, ডক?'

'করো,'

'এই খুনের ঘটনা নিয়ে আপনার এত আগ্রহ কেন? আপনার মতো একজন ব্যস্ত ডাক্তার তাঁর কাজকাম ফেলে কেন একজন গোয়েন্দার পেছনে ঘুরঘুর করছেন?'

জবাব দেয়ার আগে একটু চিন্তা করলেন ডা. চৌধুরী। তারপর বললেন,' আমি নিজে থেকে এই দুটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি, ড্যান, সে ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছায় হোক। চলো যেতে যেতে তোমাকে সব কথা বলব।'

ত্রিশ

ফিগোরার একটি বিশৃঙ্খল ব্লকে অবস্থান ম্যাকয়'স অটো রিপেয়ার। একপাশে হোলসেল প্লাম্বিং সাপ্লাই হাউজ, অন্যপাশে পরিত্যক্ত একটি গ্যাস স্টেশন। অ্যাসফল্টের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসা আগাছা ঘিরে ফেলেছে গ্যাস স্টেশনটিকে। সার্জেন্ট অলিভার তার ছাপ বা চিহ্ন বিহীন পুলিশ কারটি মরা গ্যাস পাম্পের পাশে দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে নামল। তার পেছন পেছন ডা. অশোক চৌধুরী।

ওরা হেঁটে এসে দাঁড়ালেন সোনালী চুলের রোগা এক তরুণের পেছনে। সে হতচ্ছাড়া চেহারার একটি পুরনো শেভ্রোলে গাড়ির ইঞ্জিনের ওপর কনুই ভর দিয়ে ঝুঁকে আছে।

'গ্যারেজের মালিক কই?' জিজ্ঞেস করল অলিভার।

'ভেতরে,' মুখ না তুলেই বলল ছেলেটি। তেলঝোল মাখা একটা কনুই দিয়ে ইঙ্গিত করল নিচু একটি ভবনের দিকে। ভাঙাচোরা গাড়ি উপচে পড়ছে ভবন থেকে।

'ধন্যবাদ,' ঘোঁত ঘোঁত করে বলল অলিভার, পা বাড়াল বিল্ডিংয়ের দিকে।

ভেতরে একটি গাড়ির ইঞ্জিন মেশিনগানের গুলির মতো ব্যাকফায়ারের আওয়াজ করছিল। উচ্চ শব্দটা ছাপিয়ে এক লোকের চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল। কণ্ঠ অনুসরণ করে এগিয়ে গেল অলিভার এবং ডাক্তার। দেখল বেঁটে, মোটা, ঘেমো টাক মাথা নিয়ে এক লোক কালো চোখের ভীত-সন্ত্রস্ত একটি ছেলেকে খুব ধমকাচ্ছে। প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে লোকটার মাংসল ও মোটা হাতজোড়া ওপরে নিচে নড়াচড়া করছে।

'গড ড্যাম ইট, একটা সহজ ফাকিং পার্টসের অর্ডারও তুমি বুঝতে পারো না! তুমি কি এমনই ফাকিং স্টুপিড যে রকার আর্ম গাসকেট আর হেড গাসকেটের পার্থক্য কী জানো না? যীশাস এ জন্যেই তো বলে তোমাদের মতো ফাকিং লোকজনের মাথায় ঘিলু বলতে কিছু নেই।' সে তার গালির তোড়ে মুহূর্তকালের বিরতি দিয়ে অলিভার এবং ডা. চৌধুরীর দিকে ফিরল। 'কি চাই?'

'আপনি এ গ্যারেজের মালিক?' জিজ্ঞেস করল অলিভার।

'আমার নাম ম্যাকয়, আর যেহেতু সাইনবোর্ডে আমার নাম লেখা আছে কাজেই বোঝা যাচ্ছে আমিই এ গ্যারেজের মালিক।'

'আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।'

'এক মিনিট,' সে ছেলেটির দিকে দৃষ্টি ফেরাল। ছেলেটি তখন পালাবার ফিকির খুঁজছে। 'এখন তুমি তোমার ফাকিং পার্টস হাউজে যাও এবং এবারে যেন সঠিক ফাকিং গ্যাসকোটটি আনতে ভুল না হয়। বোঝা গেছে?'

দ্রুত ওপর নিচে মাথা ঝাঁকাল ছেলেটি। দুই আগন্তুকের দিকে একবার বিব্রতকর দৃষ্টি বুলিয়ে ছুটে পালাল।

ম্যাকয় পরনের কভারঅলের পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে ঘামে ভেজা চকচকে টাক মুছল। 'স্টুপিড ফাকিং মেক্সিকানের দল।' বলল সে। 'এদেরকে আপনি কিছুতেই কাজ শেখাতে পারবেন না। এরা হলো জন্মের অলস এবং মরবেও আলস্য করে।'

'তাই নাকি?' বলল অলিভার। 'এই যে আমার পরিচয় পত্র।' সে ম্যাকয়কে তার ওয়ালেট খুলে দেখাল। L.A.P.D ব্যাজ এবং আইডি কার্ডটি যেন পড়তে পারে সেজন্য দীর্ঘসময় সে ওয়ালেট ধরে রাখল লোকটার মুখের সামনে।

'আ– দেখুন, সার্জেন্ট ব্যক্তিগতভাবে মেক্সিকানদের বিরুদ্ধে আমার কোনো আক্রোশ নেই। এদের অনেকেই খুব ভালো মানুষ। কোনো কোনো মেক্সিকান আমার এখানে ডিনার করতেও আসে...।'

অলিভার বলল, 'বাদ দেন। আমরা কোথাও বসে কথা বলতে পারি?'

'নিশ্চয়,' বলল ম্যাকয়, সে এখন অলিভারকে খুশি করতে উদগ্রীব। 'চলুন, আমার অফিসে যাই।'

'অফিস' বলতে গ্যারেজের এক কোণে প্লাইউড দিয়ে তৈরি একটি কিউবিকল। উঁচু একটি কাউন্টারে হস্তচালিত পুরানো একটি অ্যাডিং মেশিনসহ অনেকগুলো বিল, ইনভয়েস ইত্যাদি রাখা। কাউন্টারের পেছনে একটি উঁচু টুল। দেয়ালে বিভিন্ন পার্টস ম্যানুফ্যাকচারের পোস্টার সাইজ ক্যালেন্ডার।

'আজ খুব কাজের চাপ পড়েছে,' বলল ম্যাকয়। 'আমার সেরা মেকানিকটি গতরাতে হুট করে পল্টি তুলল। তাই এখন আমাকে এই স্টুপিড– 'ফাকিং' শব্দটি সে আর উচ্চারণ করল না। মাঝপথে ব্রেক কষে তাকাল অলিভারের দিকে।

'এদেরকে নিয়েই সাময়িকভাবে কাজ সারতে হচ্ছে।'

'আপনার মেকানিক মানে এডোয়ার্ড ফ্রাঙ্কোভিচ?' জিজ্ঞেস করল গোয়েন্দা।

'জ্বী, জ্বী।'

'আমরা একে নিয়ে কথা বলতেই এসেছি।'

স্বস্তি পেল যেন ম্যাকয়। 'আজ সকালে এখানে কয়েকজন পুলিশ এসেছিল। ওর ভাগ্যে কী ঘটেছে বলেছে। বিগ এডের জীবনে অমন ঘটনা ঘটবে কেউ কল্পনাও করেনি। আমরা ওকে ওর ডাক নামেই ডাকতাম, বিগ এড, বিরাট শরীর ছিল তো।'

'সে কি ভায়োলেন্ট স্বভাবের ছিল?' জানতে চাইল অলিভার। 'বদমেজাজী ছিল?'

'বিগ এড? আরে না। তার শরীরে রাগ বলে বস্তুটিই ছিল না। সবসময় হাসত, কথা বলত খুব কম। নিজের কাজটা খুব ভালো জানত। ওকে কখনও অসুস্থ হতে দেখিনি, কোনোদিন দেরি করে আসেনি।'

'সে কি কখনও সাবরিনা স্টুয়ার্ট নামে কোনো মেয়ের কথা আপনাকে বলেছে?'

'নাহ। তাছাড়া নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ও কখনোই কথা বলত না। অবশ্য ওর পার্সোনাল লাইফ বলতেও তেমন কিছু ছিল না। সারাক্ষণ কাজেই ব্যস্ত থাকত। আর আমিও পুরুষ মানুষের কাজছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে মাথা ঘামাই না।' রুমাল দিয়ে আবার মাথার ঘাম মুছল ম্যাকয়। 'আর সে লোকটা এখন নেই। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন?'

'কী?'

'শুক্রবার তো ও প্রায় মারা যাচ্ছিল। মানে আমি ভেবেছিলাম মারাই গেছে।'

ডা. চৌধুরীর শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল। 'কী ঘটেছিল?'

ডা. চৌধুরীর দিকে এমনভাবে তাকাল ম্যাকয় যেন এই প্রথম তাঁকে দেখছে। সে দৃষ্টি ফেরাল অলিভারের দিকে।

'উনি আমার সঙ্গে আছেন,' বলল ডিটেকটিভ। 'বলুন, প্রশ্নটার জবাব দিন।'

'ওয়েল, আমরা সেদিন গ্যারেজের পেছনে বসে লাঞ্চ করছিলাম। আমি আর বিগ এড। ক্যাটারারের গাড়ি থেকে কিনে আনা স্যান্ডউইচ খাচ্ছিলাম দু'জনে। এখানে ভালো স্যান্ডউইচের কোনো দোকান নেই বলে গাড়ির পচা ধচা খাবার কিনে খেতে হয়।' একটু বিরতি দিয়ে আবার শুরু করল ম্যাকয়। 'হঠাৎ শুনি 'অঁক' করে উঠল এড। তাকিয়ে দেখি মাথাটা ডানে বামে নাড়ছে সে, কোটর ছেড়ে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছিল চক্ষু। প্রথমে ভাবলাম ফিট হয়ে যাচ্ছে বুঝি এড কারণ তার মুখ নীল হয়ে যাচ্ছিল। খাওয়ার সময় কিছু একটা গলায় বিঁধে গিয়েছিল ওর। আমি ছুটে গিয়ে ওর পিঠে চাপড় মারতে লাগলাম। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না। সে গলায় হাত দিয়ে গ্যারেজের আঙিনায় টলতে টলতে হাঁটছিল, সে সঙ্গে দ্রুত কালো হয়ে যাচ্ছিল মুখ। হঠাৎ আলুর বস্তার মতো ধপাশ করে মাটিতে পড়ে যায় সে।

আমি ওর কাছে গিয়ে দেখি একদমই শ্বাস নিচ্ছে না। হার্টবিট চেক করলাম। কোনো হৃদস্পন্দন পেলাম না। আপন মনে বললাম, 'সেরেছে! এই লোকটা হয় মারা গেছে নতুবা মরতে বসেছে।' আমি গ্যারেজের সামনে গিয়ে কয়েকজন লোককে নিয়ে এলাম।'

'ফিরে এসে ওকে কী অবস্থায় দেখলেন?' জিজ্ঞেস করলেন ডা. চৌধুরী।

'দেখি উঠে বসেছে বিগ এড। তবে চেহারাসুরত মোটেই ভালো দেখাচ্ছিল না।

মুখের রঙ তখনও বেগুনি আর চোখে কেমন উদভ্রান্ত, ফাঁকা দৃষ্টি, যেন কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে ঠিক আছে কিনা। জবাবে অদ্ভুত গলায় 'হ্যাঁ' বলল এড।'

'গলার স্বর কেমন শোনাচ্ছিল?' জানতে চাইলেন অশোক।

মাংসল কাঁধ জোড়া ঝাঁকাল ম্যাকয়। 'কেমন শূন্য আর বেসুরো কণ্ঠ। স্বরটা যেন তার মুখ থেকে বেরুচ্ছিল, বুকের ভেতর থেকে নয়। কিন্তু তার চেহারাটা ওইসময় আমার কাছে মোটেই সুবিধেজনক মনে হচ্ছিল না। ওকে বললাম ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যেতে। সে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় নিজের টুলবক্সটা পর্যন্ত নিয়ে যায়নি। ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়লাম, 'সোমবার দেখা হবে,' কিন্তু ও কোনো জবাব দেয়নি। তারপর আর ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।'

ডা. চৌধুরী অলিভারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। 'ব্যস, এ-ই-ই জানি আমি,' বলল ম্যাকয়।

সার্জেন্ট গ্যারেজ মালিকের দিকে নজর ফেরাল। 'আজ তাহলে এ পর্যন্তই, মি. ম্যাকয়।' সে নিজের নাম আর ফোন নাম্বার লেখা একটি কার্ড লোকটাকে দিয়ে বলল, 'অন্য আর কোনো কথা মনে পড়লে আমাকে একটা ফোন দেবেন।'

'নিশ্চয়, সার্জেন্ট। আমি পুলিশকে সহযোগিতা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।'

'সে তো বটেই,' বলল অলিভার। সে ডা. অশোককে নিয়ে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল।

গাড়িতে ফিরে এসে স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসল অলিভার। ডাক্তারের দিকে ফিরে বলল, 'ডাক্তার, মোটকু যখন বলল ফ্রাঙ্কোভিচ শুক্রবার স্যান্ডউইচ খেতে গিয়ে শ্বাসরোধ হয়ে মরতে বসেছিল, এ কথা শুনে আপনাকে দারুণ চমকে উঠতে দেখেছি। আসল ঘটনাটা কী একটু খুলে বলবেন?'

নিজের আসনে বসে অস্বস্তি নিয়ে গা মোচড়ামুচড়ি করলেন ডাক্তার। 'কীভাবে যে কথাটা বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'সহজ সরল ইংরেজিতে বলুন। মেক্সিকান পুলিশও মাঝে মাঝে সরল ভাষা বুঝতে পারে।'

হেসে উঠলেন ডাক্তার তবে হাসিতে উচ্ছ্বাস নেই। 'ঠিক আছে, বলছি। এ কথা শুনলে তুমি কী বলবে যে গত শুক্রবার ম্যাকয়ের গ্যারেজে বসে স্যান্ডউইচ খেতে গিয়ে দম আটকে মারা গিয়েছিল ফ্রাঙ্কোভিচ?'

ডাক্তারকে চোখ সরু করে দেখল অলিভার। 'বলল আপনার রসিকতাটা একদমই বাজে।'

'আমি কোনো রসিকতা করছি না,' বললেন অশোক। 'তুমি জানতে চেয়েছ আমি তোমাকে বললাম। আমি যা দেখেছি তাতে আমার মতামত হলো শুক্রবার বিকেলেই মারা গিয়েছিল এড ফ্রাঙ্কোভিচ।'

'আ-আহ। তাহলে আপনার মতামত অনুসারে রোববার রাতে কে সাবরিনা স্টুয়ার্টের বাড়িতে হামলা করেছিল এবং মাথা ফেটে মরেছে?'

অস্বস্তি নিয়ে নড়ে উঠলেন ডা. চৌধুরী। 'এড ফ্রাঙ্কোভিচ। সেই একই ব্যক্তি।'

'অস্বাভাবিক একটা পরিস্থিতি,' শুকনো গলায় বলল সার্জেন্ট। 'আপনি কি এই মেক্সিকান পুলিশকে ব্যাখ্যা করবেন এরকম একটা ঘটনা কীভাবে ঘটা সম্ভব হলো?'

'আমি এর ব্যাখ্যা জানি না,' স্বীকার করলেন ডা. চৌধুরী। 'শুধু জানি গত রাতে একটা মরা মানুষ সাবরিনা স্টুয়ার্টকে হামলা করেছিল।'

'ওহ্, শিট!' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল অলিভার।

'জানি আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, ড্যান। কিন্তু বিশ্বাস করো আমার হাসপাতালের প্যাথোলজিস্ট যেসব প্রমাণ পেয়েছে তাতে আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে ফ্রাঙ্কোভিচ এবং শনিবার রাতে যখন তার লাশ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসা হয়, সে আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা আগেই মৃত্যুবরণ করেছিল।'

মাথা ব্যথা হলে লোকে যেমন হাত দিয়ে চোখ চেপে ধরে অলিভারও সেভাবে নিজের চোখ চেপে ধরল।

'আরও আছে,' বলে চলল ডাক্তার। 'গত বৃহস্পতিবার সাবরিনাকে এক মহিলা প্রায় গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। অটোপসিতে দেখা যায় অ্যাক্সিডেন্টের অনেক আগেই ওই মহিলা মারা গেছে। আমি মহিলার স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছি, তিনি নিশ্চিত করে বলেছেন তাঁর স্ত্রী বৈদ্যুতিক হেয়ার ড্রায়ারে শক খান এবং মারা যান। সাবরিনাকে যখন ওই মহিলা গাড়ি চাপা দিতে যাচ্ছিল মহিলা তখন জীবিত ছিল না, ছিল মৃত।'

একটা হাত তুলল অলিভার। 'ব্যস, ব্যস।'

'তুমিই তো শুনতে চাইলে।'

'ঠিক আছে, শুনলাম তো। এখন যা করব তা হলো যা শুনেছি তা ভুলে যাবো। তোমার প্রতিও আমার সেই একই পরামর্শ রইল।'

'আমি এটা ভুলতে পারব না, ড্যান। আমি এটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি।'

'যদি তা-ই হয় তো তোমার জন্য দু:খ প্রকাশ করছি। তবে আমি এর সঙ্গে কোনোভাবেই জড়াতে চাই না।'

'কিন্তু তুমি তো একজন পুলিশ ম্যান।'

'ঠিকই বলেছ আমি একজন পুলিশম্যান। আমি এখানে যে কেসটি পেয়েছি তা সরল একটি হত্যাকাণ্ডের কেস। জাস্টিফায়াবল হোমিসাইড। অর্থাৎ এ হত্যাকাণ্ডের জন্য কাউকে দোষ দেয়া যাবে না। আমি আমার রিপোর্টে তা-ই লিখব।'

'কী ঘটেছে তা জানতেও তোমার আগ্রহ হচ্ছে না?'

'আমি জানি কী ঘটেছে, ডক। একজন সাধারণ মানুষ হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। সে একজন নাগরিকের ওপর হামলা চালিয়েছিল, নাগরিকটির বয়ফ্রেণ্ড তাকে মেরে ফেলেছে। জলবৎ তরলং একটা ব্যাপার। এর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই।'

'কিন্তু—'

তাঁকে বাধা দিল অলিভার। 'আমি কোনো জিন্দালাশের কথা কিছু জানি না এবং জানতেও চাই না।'

নিভে গেলেন ডা. চৌধুরী। 'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল তুমি এরকমই কিছু ভাববে।'

অনেকক্ষণ ডাক্তারের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সার্জেন্ট অলিভার। তারপর গাড়িতে গিয়ার দিয়ে এগিয়ে চলল নিজের গন্তব্যে।

একত্রিশ

দরজায় অপেক্ষা করছিলেন ডা. অশোক চৌধুরী। এমন সময় হাজির হলো সাবরিনা এবং রবার্ট। রবার্টের মতোই ডাক্তারের অ্যাপার্টমেন্টেও একটি বেডরুম, কমপ্যাক্ট কিচেন, টাইল বসানো বাথরুম এবং ব্রেকফাস্ট বার। তবে রবার্টের ঘরের মতো অগোছালো নয় ডাক্তারের বাসস্থান। একদম ঝকঝকে, তকতকে। কোথাও কোনো জিনিস অগোছালো নয়। স্ত্রীর সঙ্গে যেসব জিনিস শেয়ার করতেন অশোক সেগুলো তাঁর আগের বাড়িতেই রয়ে গেছে। অবশ্য এ বাসায় ওসব জিনিস রাখার জায়গা যেমন নেই তেমন ডাক্তারও চাননি ওগুলো সাজিয়ে ঘরটিকে ফেলে আসা বাড়ির চেহারা দিতে। তিনি স্কাই হাইতে এসেছেন স্রেফ ক'দিনের জন্য। ক'দিন পরে অন্য কোথাও চলে যাবেন।

রবার্ট এবং সাবরিনা ঘরে ঢুকে একটি সোফায় বসল। ডা. চৌধুরী ওদের জন্য হেইনকেনের একটি বোতল খুললেন।

'তোমার মাথার কী অবস্থা, রবার্ট?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

রবার্ট তার মাথার পেছনের ফোলাটা স্পর্শ করল। সাবরিনার বাড়িতে ফ্রাঙ্কোভিচের সঙ্গে মারামারির সময় ব্যথা পেয়েছিল। বাড়ি খেয়ে ওখানটায় ডেলার মতো হয়ে আছে।

'ব্যথা আছে,' বলল রবার্ট, 'তবে আর কোনো সমস্যা নেই।'

'দ্যাটস গুড। আর তুমি, সাবরিনা, রাতে ঘুম হয়েছিল তো ঠিকমতো?'

'জ্বী। দু'একবার অবশ্য ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুমিয়েও পড়েছি।'

'ভালো। তোমার সিডেটিভের দরকার হলে প্রেসক্রিপশন লিখে দিতে পারি।'

'না, ঠিক আছে, লাগবে না,' বলল সাবরিনা। ডাক্তারের চোখে চোখ রাখল। 'কিন্তু আপনি নিশ্চয় আমাদের মেডিকেল রিপোর্ট শুনতে এখানে ডাকেননি।'

হাসলেন ডাক্তার। 'না, সে জন্য ডাকিনি। দ্যাখো, আমি কখনও কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাই না। এটি আমার চরিত্রের মধ্যেই নেই। একজন ডাক্তারের তা কখনও করাও উচিত নয়। কিন্তু এ ব্যাপারটা... এটা একটু ভিন্নরকম। এটাকে চাইলেই আমি অগ্রাহ্য করতে পারছি না। তাছাড়া, সাবরিনা, তোমার কাছে আমার একটা ঋণ রয়ে গেছে।'

'আমার কাছে ঋণ? ঠিক বুঝলাম না।'

'সুইমিংপুলের দুর্ঘটনার পরে গত সপ্তাহে তুমি আমার কাছে এসেছিলে। একটা অদ্ভুত গল্প ছিল তোমার কাছে। গল্পটা কাউকে শোনাবার জন্য তুমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলে। আমি তোমার গল্প শুনেছিলাম বটে তবে খুব একটা মনোযোগ দিইনি। তুমি যেসব লক্ষণের কথা বলেছিলে তা আমার জানা কোনো শারীরিক পীড়ার সঙ্গে মেলে না। তাই আমি পাত্তা দিইনি। হ্যালুসিনেশন বলে প্রেসক্রিপশনে লিখে দিয়েছিলাম। আমি তোমাকে মামুলি কিছু পরামর্শ দিয়ে ট্রাংকুলাইজারের কথা লিখে দিই। যদিও তোমার এ ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না।

'আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন, ডক্টর?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

'আমি আসলে বলতে চাইছি সাবরিনা বিপদের মধ্যে আছে। বিষম বিপদ।'

'এখনও?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

'হ্যাঁ। ইতিমধ্যে দুটো ঘটনা ঘটেছে। আরও ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।'

'মাফ করবেন,' বলল রবার্ট। 'আপনি কীসের ঘটনার কথা বলছেন?'

'সাবরিনার জীবনের ওপর হামলার ঘটনা– বৃহস্পতিবার দুপুরে এবং রোববার রাতে।'

'গাড়ির ওই মহিলার ব্যাপারটা তাহলে কোনো দুর্ঘটনা ছিল না?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'না। আমি এ ব্যাপারে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে নিশ্চিত হয়েছি ওটা মোটেই কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না।'

'ব্যাখ্যা করুন, ডক্টর।' বলল রবার্ট।

'করছি। তার আগে রোববার রাতের ওই লোকটার প্রসঙ্গে আসি। কোনোই সন্দেহ নেই সে সাবরিনাকে মারতেই এসেছিল।'

'জ্বী, তাতে কোনো সন্দেহই নেই,' সায় দিল রবার্ট। 'আমার ওপর তার কোনো আক্রোশ ছিল না। সে শুধু আমাকে তার পথ থেকে ঠেলে সরিয়ে সাবরিনাকে আঘাত করতে চাইছিল।'

'ঠিক তাই। গত চারদিনে এ নিয়ে দু'বার সাবরিনার জানের ওপর হামলা হলো। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জানতে পারব কীসের বিরুদ্ধে লড়াই করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের আরও ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধরে নিতে হবে।'

'কিন্তু আমরা করবটা কী?' বলল রবার্ট। 'অলরেডি আমি একটা লোককে মেরে ফেলেছি।'

'না, তুমি তাকে মারো নি,' বললেন ডাক্তার।

দীর্ঘ একটা নীরবতা নেমে এল ঘরে কেউ কোনো কথা না বলার জন্য। বাইরে শোনা যাচ্ছিল টেনিস প্লেয়ারদের হট্টগোল।

'ডক্টর, আমি ফ্রাঙ্কোভিচ নামের লোকটাকে হত্যা করেছি,' বলল রবার্ট। আমি কমপক্ষে ডজনবার তাকে পোকার দিয়ে আঘাত করেছি। আমি তার মাথার খুলি ফেটে যেতে দেখেছি। ওই পোকার দিয়ে একটা বাড়ি মেরেই তাকে আমি মেরে ফেলতে পারতাম।'

'ঠিক বলেছ,' বললেন অশোক চৌধুরী। 'পোকার দিয়ে জায়গামতো একটা বাড়ি মারলেই সাধারণ মানুষ অক্কা পেতে পারে। অটোপসি রিপোর্টও তাই বলে?'

বিস্মিত দেখাল রবার্টকে। 'তাহলে...'

'তুমি আসলে একটা মরা মানুষকে আঘাত করেছিলে,' বললেন অশোক চৌধুরী।

চোখ গোল গোল হয়ে গেল রবার্টের। সাবরিনা চুপচাপ বসে রইল, ডাক্তারের কথা শুনছে।

'ফ্রাঙ্কোভিচের অটোপসি করা হয়েছে আমার হাসপাতালে। মিসেস কার্লসনেরটাও তাই। এ মহিলাই বৃহস্পতিবার গাড়ি চালাচ্ছিল। দুটো ক্ষেত্রেই এ দু'জনের মৃত্যু ঘটেছে প্রত্যক্ষদর্শীরা তাদেরকে মারা যেতে দেখার বহু আগে।'

'পুলিশ কি ব্যাপারটা জানে?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

'তারা জানতে চায় না। আমি সার্জেন্ট অলিভারকে বিষয়টি বলার চেষ্টা করেছিলাম। সে বুদ্ধিমান, যোগ্য একজন মানুষ। কিন্তু সবার আগে তার পরিচয় সে একজন পুলিশম্যান। আমি জিন্দালাশের কথা বলা শুরু করতেই সে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। এজন্য অবশ্য তাকে দোষ দেয়া যায় না। এ ধরনের একটা কেস নিয়ে এগোবার কোনো প্রসিডিওর নেই আর আজকাল পুলিশের লোকেরা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক থাকে।'

'কিন্তু... এসবের মানে কী?' প্রশ্ন করল রবার্ট। 'আসলে ঘটছে কী?'

'কী ঘটছে জানলে তো বলেই দিতাম,' বললেন ডাক্তার। 'শুধু এটুকু বলতে পারি... যারা সাবরিনাকে হামলা করেছিল তারা ছিল জিন্দালাশ।'

বত্রিশ

'সুইমিংপুলের ওই ঘটনার সঙ্গে এসবের সম্পর্ক রয়েছে, তাই না?' অবশেষে মুখ খুলল সাবরিনা। 'সেই টানেল, দেয়ালে দাঁড়ানো ছায়ামূর্তির দল, সেই কণ্ঠ যেটি আমাকে ওখান থেকে ফিরে আসতে দিতে চায়নি।'

'তা আমি জানি না,' বললেন ডাক্তার। 'আমার অভিজ্ঞতায় স্বাভাবিকের বাইরে এখন পর্যন্ত কিছু ঘটেনি।'

'ইটস ক্রেজি,' বলল রবার্ট। এর কোনো অর্থ নেই। কতগুলো জিন্দালাশ নাকি সাবরিনাকে হামলা করেছে! যীশাস, এতো পাগলেও বিশ্বাস করবে না।'

'কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ মুহূর্তে আমাদেরকে তা-ই বিশ্বাস করতে হচ্ছে,' বললেন অশোক।

'আচ্ছা, বুঝলাম। কিন্তু প্রশ্ন হলো এরপরে আমরা কী করব? আরেকটা জোম্বি এসে কখন হামলা চালাবে সে অপেক্ষায় তো বসে থাকলে চলবে না।'

'আমরা বসে থাকবও না,' বললেন ডাক্তার। 'আমার একটি পরামর্শ আছে। এ জন্যেই তোমাদের দু'জনকে আজ রাতে আসতে বলেছিলাম।'

'পরামর্শটা কী, ডক্টর?' জানতে চাইল সাবরিনা।

হাসলেন ডাক্তার। 'তোমার সঙ্গে একজনের পরিচয় করিয়ে দেব। সে ওয়েস্ট লস এঞ্জেলেসের হাসপাতালের একজন নার্স।'

'নার্স?' বলল রবার্ট। 'নার্স দিয়ে কী হবে?'

'ওনার কথাটা আগে শেষ করতে দাও, রবার্ট,' শান্ত গলায় বলল সাবরিনা।

'মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী এবং অত্যন্ত সেবাপরায়ণ,' বলে চললেন ডাক্তার, 'তবে সে আমাদেরকে যে খুব বেশি সাহায্য করতে পারবে এমনও নয়।'

'তাহলে?' অধৈর্য শোনাল রবার্টের কণ্ঠ।

'মেয়েটির অকাল্ট কালেনকশন আছে।'

'মেয়েটি কি ডাকিনী চর্চা করে?'

'মেয়েটি ডাকিনী চর্চা করে না, তার নানী করত। নানীর অনেক গল্প বলেছে সে আমাকে। শুনেছি বৃদ্ধার নাকি অতিপ্রাকৃত কিছু ক্ষমতা আছে। হেসে উঠলেন ডাক্তার। 'এসব ব্যাপার আগে বিশ্বাস করতাম না। এখন করি।'

কী যেন ভাবছিল সাবরিনা। তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন চৌধুরী।

'কী ভাবছ?'

'অকাল্টের কথা বলায় পিটার লানডাউর কথা মনে পড়ে গেল। রোববার রাতে আমার বাসায় তার আসার কথা ছিল। ফোনে তাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। বলেছিল আমার সঙ্গে নাকি খুব জরুরি দরকার। তারপর ওইরাতে ওই ভয়ংকর ঘটনাটার কারণে আমি পিটারের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন মনে পড়ছে তার কথা। ভাবছি সে সেদিন এলো না কেন।'

'তার কথা ভুলে যাও,' বলল রবার্ট। সে হয়তো অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া সে তার জ্যোতিষী বিদ্যার ট্রিকস দেখিয়ে আমাদেরকে কোনো সাহায্যও করতে পারত না।'

'সে যাই হোক, তবু হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার কথা।'

'এই বৃদ্ধা মহিলাটির ব্যাপারে কী যেন বলছিলেন, ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট। 'তার কীসের নাকি ক্ষমতা আছে?'

'আমি আসলে মহিলা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না,' জবাব দিলেন ডাক্তার। 'চাইলে সেই নার্সের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। সে হয়তো তার নানীর সঙ্গে তোমাদের একটা যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবে।'

'দেখা করতে ক্ষতি কি?' বলল সাবরিনা।

'আমাদের হারানোরই বা কী আছে?' যোগ করল রবার্ট।

ভ্রু কোঁচকাল সাবরিনা। রবার্ট তাকাল তার দিকে। 'কী হয়েছে?'

'তোমার কথা শুনে পিটারের একটা কথা মনে পড়ে গেল। শুরুতে ভেবেছিলাম সে আমাদের সঙ্গে ফাজলামি করছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ও সত্যি আমাদেরকে সাহায্য করতে চাইছিল।'

'জানি আমি,' নরম গলায় বলল রবার্ট। 'পিটার যদি কয়েকদিনের মধ্যে যোগাযোগ না করে আমরাই বরং ওর সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

হাসল সাবরিনা। ফিরল ডা. চৌধুরীর দিকে। 'আজ রাতে আপনার নার্সের সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

ঘড়ি দেখলেন ডাক্তার।' মিনিট কুড়ি পরে ও কাজের একটা ব্রেক পাবে। তখন ওর সঙ্গে কথা বলা যায়।'

'আমার গাড়িটা নিচ্ছি,' বলল রবার্ট। 'যাই, চাবি নিয়ে আসি।'

বেরিয়ে গেল রবার্ট, ওর নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে হাঁটা দিল। সাবরিনা সোফার সামনে ঝুঁকে এল, ডাক্তারের চোখে কী যেন খুঁজল।

'একটা সত্যি কথা বলবেন?

'কী?'

'গত সপ্তাহে কি আমি সত্যি সুইমিংপুলে ডুবে গিয়েছিলাম? আমি কি মারা গিয়েছিলাম?'

'মানে?'

'মানে হলো হয়তো সত্যি এ পৃথিবীতে আমার এখন থাকার কথা নয়। মৃত্যুর জগত থেকে এখানে ফিরে আসাটা হয়তো ভুল হয়ে গেছে। ওই জিন্দালাশগুলো যদি সত্যি আমাকে চায় তাহলে জোর করে এখানে থাকা আমার উচিত হচ্ছে না, আমার কারণে অন্যদেরও আঘাত করা ঠিক হচ্ছে না। আপনি, রবার্ট, পিটার সকলে মিলে এমন কিছু জগাখিচুড়ি পাকিয়ে তুলছেন যাতে শুধু আমার কারণে ফলাফল হতে পারে অতি ভয়ংকর।'

'এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই, সাবরিনা। তবে এটুকু বলতে পারি আমরা যারাই এর মধ্যে জড়াই না কেন, স্রেফ নিজের ইচ্ছায় জড়াচ্ছি।'

'সে রাতে, ওখানকার পার্টিতে আপনি আমার...আমার শরীর পরীক্ষা করেছিলেন। শুধু বলুন, আমি কি মারা গিয়েছিলাম?'

একটু নীরব থেকে জবাব দিলেন ডা. চৌধুরী। 'রবার্ট তোমাকে পানি থেকে তোলার পরে যখন তোমার মুখে শ্বাস লাগিয়ে তোমাকে শ্বাস করানোর চেষ্টা করছিল তখন আমার মনে হয়েছিল তুমি আর বেঁচে নেই।'

মুখটা কুঁচকে গেল সাবরিনার।

'তবে এরকম বহু উদাহরণ আছে যেখানে ভাইটাল সাইনগুলো নেগেটিভ থাকে, ধারণা করা হয় মারা গেছে রোগী, কিন্তু তারপরও সে বেঁচে ওঠে এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। আর একটি ব্যাপারে তোমাকে নিশ্চিত করে বলি, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কেউ নেই যে সত্যি সত্যি মারা যাওয়ার পরে আবার ফিরে পেয়েছে জীবন। তোমার ক্ষেত্রেও তেমন কিছু ঘটেনি। যদি কোথাও কোনো ভুল হয়েও থাকে, অন্যরা ভুলটা করেছে, আর তারা যে-ই হোক না কেন। তুমি বেঁচে আছ, সাবরিনা, আমাদের সবার মতোই তুমি জীবন্ত। তুমি এ পৃথিবীর মানুষ এবং তোমাকে এখানে ধরে রাখার জন্য যত লড়াই করতে হয়, করব।'

আবেগতাড়িত হয়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল সাবরিনা, চট করে চুম্বন করল ডাক্তারের গালে। 'থ্যাংকস, ডক্টর, জীবন কত সুন্দর কথাটি মনে করিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। আর আমি সৌভাগ্যবতী আপনাদের মতো মানুষ পেয়ে।'

খুলে গেল দরজা, গাড়ির চাবি হাতে ঘরে ঢুকল রবার্ট। 'চলুন সবাই।'

রবার্টের পিছু পিছু ওর কামারো গাড়ির দিকে পা বাড়াল সাবরিনা এবং ডা. অশোক চৌধুরী।

তেত্রিশ

ওয়েস্ট লসএঞ্জেলেস রিসিভিং হাসপাতালের দোতলার ক্যাফেটেরিয়াটি বেশ প্রশস্ত। ফরমিকার টেবিলের ওপরে প্লাস্টিকের ফুল সাজানো। ডাক্তার, নার্স এবং রাতের শিফটের কর্মচারীরা স্বল্প কাজের বিরতিতে এখানে এসে কফি পান করে, রোল কিংবা স্যান্ডউইচ খেয়ে আবার দ্রুত চলে যায়। পরিবেশটা ঠিক আড্ডা দেয়ার মতো নয়।

ঘরের এক কোণের একটি টেবিল দখল করেছে সাবরিনা, রবার্ট এবং ডা. চৌধুরী। তাদের সামনে কফি ভর্তি সাদা মগ। তবে মগের দিকে কারও নজর নেই, সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে এনট্রান্সের দিকে।

'ওই যে ও এসে পড়েছে,' বলল ডা. অশোক চৌধুরী।

জলপাই ত্বক আর কালো কফি চোখের একটি মেয়ে ঢুকল ক্যাফেটেরিয়ায়। পরনে সাদা নাইলনের নার্স ইউনিফর্ম, তার সুগঠিত শরীরের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে। দোরগোড়ার ভেতরে এসে সে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক।

'এদিকে এসো, ইনেজ,' ওকে ডাকলেন ডাক্তার।

ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে টেবিলের দিকে পা বাড়াল মেয়েটি। মুখে উষ্ণ এবং আন্তরিক হাসি।

সিধে হলেন চৌধুরী, মেয়েটির সঙ্গে তার সঙ্গীদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'রবার্ট, সাবরিনা, এ সেই মেয়ে যার কথা তোমাদেরকে বলেছি। ইনেজ ভিল্লানুয়েভা। আর ইনেজ এরা আমার বন্ধু সাবরিনা স্টুয়ার্ট এবং রবার্ট ডান।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' জলতরঙ্গের সুরে কথা বলে উঠল মেয়েটি। উচ্চারণে স্প্যানিশ টান।

'তোমার জন্য কিছু আনাই?' জিজ্ঞেস করল চৌধুরী। 'এক কাপ কফি?'

মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'আমি হাসপাতালের কফি খাই না। এ কফি খেলে নাড়িভূঁড়ি হজম হয়ে যায়।'

তার কথা শুনে হেসে উঠল অন্যরা। ইনেজ বসল টেবিলে। অনিসন্ধিৎসু চোখে তাকাল ডাক্তারের দিকে।

'তুমি এসেছ বলে খুব খুশি হয়েছি, ইনেজ,' বললেন তিনি। 'তোমার কাছে

তোমার নানীর গল্প অনেক শুনেছি। আমার বন্ধুদের তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন।'

তামাটে ত্বকের মেয়েটি প্রথমে রবার্টকে দেখল, তারপর তাকাল সাবরিনার দিকে। সাবরিনার দিকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশিক্ষণ চেয়ে রইল সে, একটা ছায়া ঘনাল মুখে। ফিরল ডাক্তারের দিকে।

'আমি তো ভাবতাম আমার নানীর গল্প আপনি বিশ্বাস করেন না।'

'আমি যে কীসে বিশ্বাস করি সেটাই ইদানীং বুঝে উঠতে পারছি না,' বললেন ডাক্তার। 'তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত, আমার অভিজ্ঞতার বাইরে কিছু ঘটলে সেগুলো আর অস্বীকার করি না।'

'মোর থিংস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ,' তাই না, ডক্টর?' মুচকি হাসল ইনেজ।

'ওরকমই আর কী।'

নার্স মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত তাকাল সাবরিনার দিকে। 'আপনিই বোধকরি ঝামেলায় পড়েছেন, না?'

'হ্যাঁ। কী করে বুঝলেন?'

'আমার পরিবারে, ভিলানিউভাদের প্রত্যেকেরই একটা আলাদা ক্ষমতা আছে। কারও বেশি, কারও কম। ছেলেবেলায় আমরা কেউ অসুস্থ হলে কিংবা আমাদের কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আমাদের মা দু'একদিন আগেই তা টের পেয়ে যেতেন। কিন্তু এটা ঠেকানোর ক্ষমতা তাঁর ছিল না বলে মনে মনে খুব কষ্ট পেতেন। আমার ভাই, তখন সে ছোট, দৃষ্টি শক্তির সাহায্যের টেবিলের ওপরে থেকে বল ফেলে দিতে পারত।'

'আর আপনি কী পারেন, ইনেজ?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'আমি মাঝে মাঝে মানুষের মুখে নানান জিনিস দেখতে পাই। এমনসব গোপন ব্যাপার জেনে যাই যা তারা নিজেরাও জানে না। তবে আমার ক্ষমতা এটুকুই। আমাদের কারোরই অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা নেই। শুধু নানী ছাড়া।'

'আপনার নানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায় না?'

'সত্যি দেখা করতে চান? আমার নানী বাইরের লোকজনের সঙ্গে খুব কমই দেখা করেন। আর যাদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন তাদের সবার কপালেই পরবর্তীতে অশেষ দুর্ভোগ থাকে। তারা নানীকে নানান প্রশ্ন করে, জবাব পেতে পীড়াপীড়ি করে, তারা যা জানতে চায় তা নানী তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার পরে তারা আফসোস করে কেন এসব জানতে গিয়েছিল। তাঁকে কেউ কেউ ব্রুজা বা ডাইনি বলে ডাকে।

'ইনেজ, আমার দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে,' বলল সাবরিনা,' হয়তো আপনার নানী আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। হয়তো বা পারবেন না। জানি না। আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।'

সাবরিনার মুখখানা পরখ করল ইনেজ। তার কফি রং চোখে সাবরিনার জন্য গভীর সমবেদনা। 'আমি নানীর সঙ্গে কথা বলব, সাবরিনা। তবে খুব বেশি আশা করবেন না। আমার নানীকে লোকে অনেক ফালতু কাজে ব্যবহার করেছে। এজন্য তিনি লোকের ওপর খুব বিরক্ত। এখন তিনি শুধু একা একা ঘরে বসে থাকেন আর মরণের দিন গোনেন। তবে আমি আপনার কথা তাঁকে বলব। আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব করব।'

'ধন্যবাদ,' খুশি হয়ে গেল সাবরিনা।

'আমার নানীর সঙ্গে কথা বলার পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হবে কী করে?'

সাবরিনা রবার্টের কাছ থেকে একটি নোটবুক নিয়ে তাতে নিজের বাড়ি এবং অফিসের টেলিফোন নাম্বার লিখে দিল। ইনেজ কাগজের টুকরোটা নিয়ে ভাঁজ করে রেখে দিল নিজের কাছে।

ইনেজের হাত ধরল সাবরিনা। 'ইনেজ, তোমাকে আমি তুমি করে বলি?'

ইনেজ হেসে সায় দিল। সাবরিনা বলল, 'আমাকে তুমি সাহায্য করছ এজন্য আমি তোমার প্রতি যে কত কৃতজ্ঞ তা বলে বোঝাতে পারব না।

ইনেজের চেহারা এবারে গম্ভীর দেখাল। 'তোমার জন্য আমি এখনও কিছুই করতে পারিনি। আমার নানী তোমার সঙ্গে দেখা না-ও করতে পারেন। তবে তিনি রাজি হলেও তাঁর সঙ্গে দেখা না করাই হয়তো তোমার জন্য ভালো হবে।'

'তবু আমি ঝুঁকি নেবো,' বলল সাবরিনা।

ইনেজ ওর দিকে তাকিয়ে করুণ হাসল। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'সাবধানে থেকো, সাবরিনা,' বলল সে। 'খুব সাবধানে থেকো।' তারপর সে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। পেছনে একবার তাকাল না পর্যন্ত।

চৌত্রিশ

পরদিন কোনো কাজে মন বসাতে পারছিল না সাবরিনা। দৈনন্দিন কাজগুলোতেও ভুল করে চলছিল ও। ভুলে যাচ্ছিল অ্যাপয়েন্টমেন্ট, লোকের কথায় মনোযোগ দিতে পারছিল না। লাঞ্চের সময় ও ক্যাটারিং ওয়াগন থেকে একটি টুনা সালাদের স্যান্ডউইচ, একটি আপেল আর হাফ পাউন্ড দুধ কিনে নিজের ডেস্কে ফিরে এল। খেতে খেতে খবরের কাগজে ছাপা হওয়া প্রতিদ্বন্দ্বী এজেন্সিগুলোর বিজ্ঞাপনে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছিল। যদিও ওর মন পড়েছিল টেলিফোনে। কখন বেজে উঠবে ফোন সে অপেক্ষাই করছিল।

সাবরিনা জানে সে ইনেজ ভিল্লানুয়েভার নানীর কাছ থেকে একটু বেশিই সাহায্যের আশা করে ফেলেছে। বৃদ্ধ মহিলার নাকি সাইকিক পাওয়ার আছে। অন্য সময় হলে এসব হেসেই উড়িয়ে দিত ও। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এ দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে অন্য কারও সাহায্য বড়ই দরকার। তাই সে ইনেজের ফোনের অপেক্ষায় আছে।

বেলা তিনটার দিকে অবশেষে প্রত্যাশিত ফোনটি এল। ঝনঝন শব্দ শুনে দারুণ চমকে উঠল সাবরিনা যেন ওটা ওকে কামড়ে দিয়েছে।

'সাবরিনা? আমি ইনেজ ভিল্লানুয়েভা। তোমাকে বিরক্ত করলামনা তো?'

'না, না। আমি তোমার ফোনের অপেক্ষাই করছিলাম।'

'আমি একটু আগে আমার নানীর সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁর বাড়িতে ফোন নেই তাই তাঁর বাড়ির নিচতলার ভাড়াটেকে অনুরোধ করতে হয়েছে নানীকে ডেকে দিতে। সে খুব বেজার হয়ে কাজটা করে দিয়েছে।'

'নানী কী বললেন?' কণ্ঠ থেকে ঔৎসুক্য আড়াল করার চেষ্টা করল সাবরিনা।

'যা ভেবেছি। নানী তোমার সঙ্গে দেখা করতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। বললাম না উনি এখন কারও সঙ্গে দেখা করতে চান না। কিন্তু আমি ঘ্যান ঘ্যান করেই যাচ্ছিলাম। তাঁকে বললাম তুমি আমার খুব পুরানো এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অনেক অনুরোধের পরে অবশেষে তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন। তবে একবারই কথা বলবেন এবং অল্পক্ষণের জন্য।'

'বাহ্, চমৎকার, ইনেজ। তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব! উনি থাকেন

কোথায়?'

বয়েল হাইটসে নানীর বাড়ির ঠিকানা দিল ইনেজ। সাবরিনা ডেস্ক ক্যালেন্ডার প্যাডে ঠিকানাটা লিখে কাগজটা ছিঁড়ে নিল।

'আমি আজ রাতেই ওখানে যাচ্ছি,' বলল সে, 'অফিসের কাজ শেষ করার পরপরই।'

'না,' দ্রুত বলে উঠল ইনেজ। 'নানী আজ রাতে তোমার সঙ্গে কথা বলবেন না।'

'কিন্তু কেন?'

'তা আমি জানি না। তিনি তাঁর মুড মাফিক লোকের সঙ্গে কথা বলেন এবং আমি এ নিয়ে তাঁকে কখনও প্রশ্নও করিনি।

হতাশ বোধ করল সাবরিনা। হতাশাটা প্রাণপণে চাপা দিতে দিতে বলল, 'তাহলে ওনার সঙ্গে কবে দেখা হবে?'

'কাল আসতে বলেছেন নানী। সূর্যাস্তের পরে।'

'কাল,' বলল সাবরিনা, 'আমি একা যাবো নাকি সঙ্গে কেউ থাকলে সমস্যা নেই?'

'সেসব নিয়ে কিছু বলেননি নানী। রবার্টকে নিয়ে আসতে পারো।'

'তুমি কি ওনাকে বলেছ কোন্ বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে চাই?'

'আমি কিছুই বলিনি। নানীকে কিছু বলার দরকার হয় না।'

'বেশ। তোমাকে আবারও ধন্যবাদ, ইনেজ। আমি সত্যি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'নানীর সঙ্গে কথা বলার পরে তোমার এ খুশি ভাবটা বজায় থাকলেই হলো।'

ও প্রান্তে ক্লিক একটা শব্দ হলো এবং সাবরিনার হাতের ফোনের লাইনটি কেটে গেল। সে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ক্রেডলে রেখে দিল যন্ত্র। ইচ্ছে করল গলা ফাটিয়ে হাসে। সে তার অফিসে বসে আছে, ফোনে কথা বলে কিনা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে এক ডাইনির সঙ্গে!

সূর্যাস্তের পরে। বাহ্, চমৎকার। পূর্ণিমা রাতে নয় কেন? আরও ভালো হয় পাহাড়ের ওপর কোনো পুরানো বাড়িতে, প্রবল বৃষ্টি এবং বজ্রপাত হচ্ছে, তখন এ ডাইনি বুড়ির সঙ্গে দেখা করতে গেল সাবরিনা।

বহু কষ্টে হাসি দমন করল ও। জোর করে মনোনিবেশ করল কাজে এবং পরবর্তী দু'ঘণ্টা এতেই ডুবে থাকল। পাঁচটার সময় রবার্টকে ফোন করে ইনেজের কথা তাকে বলল।

'বুড়ির সঙ্গে আজ দেখা করলে সমস্যা কী?' ক্ষেপে গেল রবার্ট। 'কেন কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে?'

'আমি জানি না,' বলল সাবরিনা। 'ইনেজ জানালো তার নানী আগামীকাল দেখা

করতে চান। আর নানীর কথাই আইন।'

'হুঁ', নাক দিয়ে বিদঘুটে একটা শব্দ করল রবার্ট। 'তুমি নেহায়েত বিপদের মধ্যে আছ বলে নইলে এসবে আমি পাত্তা দিই?'

'জানি আমি,' বলল সাবরিনা। 'আমারও হতাশ লাগছে। কিন্তু করার তো কিছু নেই।'

'আর আমার লাগছে রাগ।' আজ রাতটা নিয়ে কী প্ল্যান? আমার বাসায় আসবে?'

'আমি রাতে বেরুবো,' বলল সাবরিনা। 'বন্ধ দরজার পেছনে লুকিয়ে থাকার কথা ভাবলেই হাঁপ ধরে যাচ্ছে।'

'বাইরে যাওয়াটা কি নিরাপদ হবে?'

'আমি তো রোববার রাতে বাড়িতেই ছিলাম। তখন কি নিরাপদে ছিলাম?'

'তা বটে,' ওর যুক্তি মেনে নিল রবার্ট। 'কোথায় যেতে চাইছ?'

'তুমিই বলো। তোমাকে নিয়ে বেরুব। তোমার জন্মদিন উপলক্ষে ডিনার করব। আমরা সী ক্লিফে যেতে পরি। ওখানকার লবস্টার তো তোমার খুবই প্রিয়।'

'আমার জন্মদিন তো আগামী মাসে।'

'তাতে কী, আজ রাতে আমার সেলিব্রেট করতে ইচ্ছে করছে। এমন আমন্ত্রণ আর না-ও পেতে পারো। তো কী বলো?

'তোমার আমন্ত্রণ আমি অগ্রাহ্য করে পারি?' বলল রবার্ট।

পঁয়ত্রিশ

তিন ঘণ্টা পরে প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে ধরে ওরা চলল উত্তর দিকে। টোপাঙ্গার সৈকত ঘেঁষা বাড়িঘর ছাড়িয়ে ম্যালিবুর বড়লোকদের কলোনি পার হলো, পেপাররডিন ইউনিভার্সিটির পাহাড়ি এলাকার পাশ কাটাল, এখানকার পাহাড়গুলো সোজা গিয়ে মিসেছে সাগরে। অসমাপ্ত একটি কনডোমিনিয়ামের কালো কংকালের পাশ দিয়ে এখন গাড়ি ছুটছে। প্রতিবছর ক্যালিফোর্নিয়ার পাহাড়ে, ঝোপঝাড়ে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটে তারই শিকার ওই কনডোমিনিয়াম। চালচুলোহীন একদল তরুণ এখন ওখানে আস্তানা গেড়েছে।

বাকেট সিটে শিরদাঁড়া টানটান করে বসে আছে রবার্ট, হাতজোড়া হুইলের ওপর। সে তেমন কিছু বলছে না। সাবরিনা ওর গাড়ি নিয়ে আসেনি। আসলে সে গাড়ি চালাতে তেমন পছন্দ করে না। তাই রবার্টের গাড়িতে উঠে বসেছে।

সীক্লিফ রেস্টুরেন্টটির অবস্থান উপকূল রেখা থেকে সোজা ওপরে উঠে যাওয়া একটি পাহাড়ের ওপর। রেস্টুরেন্টের নিচে, পাহাড়ের গায়ে প্রবল বাতাস ছুটে এসে ধাক্কা খাচ্ছে, সাগরের পানি ওখানে বিক্ষুব্ধ এক জলরাশিতে রূপ নিয়েছে। ফেনাসহ বিরাট বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের কোলে। সীক্লিফ তার গোবদা সাইজের গলদা চিংড়ির জন্য বিখ্যাত। দামও তেমনি চড়া। এরা উত্তরের সবচেয়ে সেরা মার্গারিটা পুয়ের্তো ভালারটাও পরিবেশন করে। রেস্টুরেন্টটি ধূসর পাথরে তৈরি, এখানে বসে প্রকৃতি উপভোগ করা যায় দারুণভাবে। ভূতত্ত্ববিদরা অনেক আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন রেস্টুরেন্টটি পাহাড়ের যে অংশে দাঁড়িয়ে আছে তা অদূর ভবিষ্যতে ভেঙে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে সীক্লিফ সোজা পঞ্চাশ ফুট নিচে, পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ভূমিকম্পের স্তরচ্যুতির মধ্যে বসবাসে অভ্যস্ত ক্যালিফোর্নিয়ানরা এসব ভবিষ্যদ্বানী থোড়াই কেয়ার করে। তাই রেস্টুরেন্ট ব্যবসাটি দিনদিন জমে উঠছে।

রাত ন'টার খানিক আগে রবার্ট আর সাবরিনা পৌঁছে গেল সীক্লিফ রেস্টুরেন্টের পার্কিং লটে। গাড়ি থেকে নামার পরে লাল জ্যাকেট পরা এক অ্যাটেনডেন্ট ওদেরকে স্বাগত জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল। যে টেবিলে ওদেরকে বসানো হলো সেখান থেকে সাগর দেখা যাচ্ছিল না। তবে এ নিয়ে দু'জনের কেউই আপত্তি জানাল না।

এ রেস্টুরেন্টে ওরা আগেও এসেছে এবং রেস্টুরেন্টের জানালা দিয়ে নিসর্গ উপভোগ করেছে।

রবার্ট লবস্টারের ঝলসানো লেজের অর্ডার দিল, সাবরিনা রেড স্ন্যাপার আনতে বলল। খাবারের অপেক্ষায় বসে থেকে ওরা বিখ্যাত মার্গারিটায় চুমুক দিতে লাগল।

অস্থির একটা নীরবতা কাজ করছে রবার্টের মধ্যে। সাবরিনাকে সিগারেট ধরাতে দেখে সে ভ্রু কোঁচকাল। সাবরিনা বলল, 'রবার্ট, তোমার বার্থডে'র কথা বলে এখানে নিয়ে এলাম। একটু সেলিব্রেট করবে না?'

'সরি। মাত্র তিনদিন আগে এক লোকের মাথা গুঁড়িয়ে দিয়েছি আমি। এ মুহূর্তে গাদা গাদা মজা করার মুড খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কাম অন, আমরা কিন্তু কথা দিয়েছিলাম আজ রাতে ওসব প্রসঙ্গই একদম তুলব না।'

'শিওর। কিন্তু চাইলেই কি মজার ভান করে সব ভুলে থাকা যায়? ইচ্ছে করলেই কি তুমি পারবে এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে, না জানি আবার কে হামলে পড়ে তোমার ওপর?'

'চুপ করো,' ধমকে উঠল সাবরিনা। চুপ হয়ে গেল রবার্ট।

ওরা অস্বস্তিকর নীরবতার মাঝে সালাদ খেল। ওয়াইন ভিনেগারের ড্রেসিং করা মুচমুচে সব্জি। ওদের খালি প্লেট তুলে নিয়ে মূল কোর্স পরিবেশনের জন্য এগিয়ে এল ওয়েটার। সে চলে যাওয়ার পরে রবার্ট টেবিলের ওপর দিয়ে সাবরিনার একটি হাত ধরল।

'হানি, আমি দুঃখিত।' বলল সে।

সাবরিনা ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমি বুঝতে পারছি, ডার্লিং। আসলে আজ এখানে আসাই আমাদের উচিত হয়নি।'

'না, ঠিক আছে। আমরা এখন সময়টাকে উপভোগ করব। কাল সেই ডাকিনী মহিলার কাছে যাবো, ভূত তাড়ানোর মন্ত্র শিখবো, তারপর আরও যা যা করতে হয় করব। এখন এসো মজা করি।'

ওরা ডিনারের সঙ্গে পান করল এক বোতল পিনটচার্ডোনে।

ওয়েটার যখন কফি নিয়ে এল ততক্ষণে দু'জনেরই মনের গুমোট ভাবটা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক আনন্দ স্ফূর্তিতে মজে গেছে ওরা। রবার্ট এমনকী একটি কৌতুকও শোনাল। সাবরিনা মাস্টার চার্জ বের করল ডিনারের বিল মিটিয়ে দিতে।

ওরা কিশোর-কিশোরীর মতো হাত ধরাধরি করে নেমে এল পার্কিং লটে।

'হানি, এখানে এসে খুব ভালো করেছি,' বলল রবার্ট। 'তোমাকে আমি অনেক ভালোবাসি।'

'এখনও আমাকে বিয়ে করতে চাও?'

'আগের চেয়েও বেশি।'

সাবরিনা ওর প্রেমিকের হাতে চাপ দিল। তরুণ ইঞ্জিনিয়ারটির প্রতি প্রবল ভালোবাসা অনুভব করছে সে। কিছুক্ষণ আগে বেজার মুখে ছিল রবার্ট। তাতে কিছু মনে করেনি সাবরিনা। কারণ একদম নিখুঁত কোনো হিরোর সঙ্গে সে বাকি জীবনটা কাটাতে চায় না। চায় দোষেগুণে ভরা কোনো মানুষের সঙ্গে, যে ভুল করবে আবার তা স্বীকারও করবে।

সাগরের ওপরের আকাশে মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ হাসছে। কমলারঙের কুমড়োর মতো চাঁদ।

'ওহ্, রবার্ট, চাঁদটা দ্যাখো,' বলল সাবরিনা।

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর,' সায় দিল রবার্ট।

'চলো, একটু হাঁটি।'

পার্কিং অ্যাটেনডেন্টকে গাড়ির ওপর নজর রাখতে বলে রবার্ট আর সাবরিনা ক্লিফের কিনারে এগোল। দাঁড়াল গার্ড রেইলের পাশে।

'চাঁদ কেনো এত রোমান্টিক?' ঘোষণার সুরে বলল সাবরিনা।

'কারণ চাঁদকে নিয়ে বহু কবিতা এবং গান লেখা হয়েছে তাই,' বলল রবার্ট।

ওরা মাথার ওপরের সুন্দর চাঁদটিকে নিয়ে ছড়া বানাতে লাগল। দু'জনেই প্রাণ খুলে হাসছে। হঠাৎ কী মনে পড়তে হাসি থামাল সাবরিনা। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাথা নাড়তে নাড়তে।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

'এক মিনিট,' ছোট ক্লাব ব্যাগটা খুলল সাবরিনা। তাকাল ভেতরে। 'যা ভেবেছি। ধ্যাত্তোরি, আমি আমার ক্রেডিট কার্ডটা রেস্টুরেন্টে ফেলে এসেছি।'

'আমি নিয়ে আসছি।' বলল রবার্ট। 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরও কিছু ছড়া বানাতে থাকো।'

ওকে চুমু খেয়ে রেস্টুরেন্টের দিকে চলে গেল রবার্ট। সাবরিনা সমুদ্রের দিকে ফিরল। চাঁদটাকে এখন কেমন যেন লাগছে। মোটেই সুন্দর লাগছে না। মনে হচ্ছে ভোঁতা, ভাবলেশশূন্য একটা মুখ, ভীতিকর কী যেন একটা আছে ওটার মধ্যে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সাবরিনার গা ছমছম করে উঠল।

সে রবার্টের পেছন পেছন যাবে মাত্র ভেবেছে হঠাৎ পার্কিং লটের দিক থেকে কেউ অমানুষিক একটা আর্তনাদ করে উঠল। পাঁই করে ঘুরল সাবরিনা এবং বরফের মতো জমে গেল। অ্যাসফল্টের ওপর নগ্ন পায়ে থপথপ আওয়াজ তুলে ওর দিকে ছুটে আসছে পাতলা সাদা পোশাক পরা লম্বা চিকন গড়ের একটি মেয়ে। চাঁদের

আলোয় তার মরা মানুষের মতো মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেল সাবরিনা। সাদা ফ্যাকাসে। হাঁ হয়ে আছে। চোখ জোড়ায় জান্তব উল্লাস।

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ঘুরল সাবরিনা, গার্ড রেইল ধরে ক্লিফের দিকে ছুটল। রেস্টুরেন্ট থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে ও। পেছনে শুনতে পাচ্ছে মেয়েটির পায়ের থপ থপ শব্দ আর গলা দিয়ে ছিটকে আসা ভয়ঙ্কর অপার্থিব চিৎকার। মুহূর্তের জন্য সাবরিনার স্মৃতিতে ভেসে উঠল সেই ভীতিকর টানেলের দেয়ালের সামনে দাঁড়ানো ছায়ামূর্তিগুলো, ওরা হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল ওকে।

'না!' কাতরে উঠল সাবরিনা। 'ওহ, নো! গড, নো!' দৌড়াল ও হোঁচট খেতে খেতে, গার্ড রেইল যেখানে শেষ হয়েছে সে জায়গাটা পার হয়ে গেল, খোলা চুড়োর দিকে ছুটছে এখন। অনেক দূর থেকে, রেস্টুরেন্টের দিক থেকে একটা কোলাহল ভেসে এল। কোলাহল ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে রবার্টের গলা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ওরা যথাসময়ে সাহায্য করতে পারবে না সাবরিনাকে। দেরি হয়ে গেছে। বড্ড বেশি দেরি হয়ে গেছে।

পায়ের নীচে কি যেন একটা ছিটকে গেল। সাবরিনার জুতোর একটা হিল ভেঙে গেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আর কদ্দুর যাবে ও? উপায় না দেখে ঘুরল সাবরিনা। বিস্ফারিত চোখের মেয়েটাকে হামলা ঠেকানোর জন্য প্রস্তুত হলো।

অমানবিক, ভৌতিক একটা চিৎকার দিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটি। ওকে লক্ষ্য করে থাবা চালাল, খামচে দেয়ার চেষ্টা করল। প্রাণপণে লড়তে লাগল সাবরিনা, ঘুসি মারছে। কিন্তু তাতে কিছুই লাভ হচ্ছে না। মেয়েটির শরীরে যেন অমানুষিক শক্তি ভর করেছে।

জানপ্রাণ দিয়ে মেয়েটিকে ঠেকানোর চেষ্টা করছে সাবরিনা, কিন্তু সে সঙ্গে একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছে চুড়োর দিকে। ওকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটি। তার ফ্যাকাশে ছাতাধরা মুখটা ক্রমে এগিয়ে আসছে সাবরিনার মুখের দিকে। তার মুখে বিশ্রী পঁচা গন্ধ পাচ্ছে সাবরিনা।

শেষ মুহূর্তে মরিয়া হয়ে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিয়ে মেয়েটার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করল সাবরিনা। ফ্যাঁস করে কী যেন ছিড়ে গেল। ভারসাম্য হারিয়ে এক মুহূর্ত দুলল মেয়েটি, দু'হাতের থাবায় ধরে আছে সাবরিনার সিল্কের ব্লাউজের সামনের ছেঁড়া অংশ। চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ অকস্মাৎ জোরালো হয়ে উঠল রবার্ট রেস্টুরেন্টের লোকজন নিয়ে ছুটতে ছুটতে কাছিয়ে আসার কারণে।

পাহাড়চূড়োর মাথায় অনন্ত একটি মুহূর্ত দুলল মেয়েটি, তারপর স্লো মোশনের ভঙ্গিতে সে উল্টে পড়ে গেল।

সহজাত প্রবৃত্তিতে ঝট করে ঘুরল সাবরিনা। আর মেয়েটি ডিগবাজি খেতে খেতে

রওনা হয়ে গেল পাহাড়ের নিচে। তার গলা দিয়ে ভয়ার্ত আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে। শেষে থ্যাচ করে একটা শব্দ হলো। নিচের পাথরের গায়ে আছড়ে পড়েছে তার দেহ, সাগরের উন্মত্ত ঢেউ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিষ্প্রাণ শরীরটায়।

রবার্ট এসে পড়েছে। সাবরিনাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকল। পরনের জ্যাকেট খুলে ঢেকে দিল সাবরিনার নগ্ন উর্ধাংশ।

'গড, সাবরিনা,' বলল সে, 'আরও একজন।'

এবারে আর অশ্রু ঝরল না সাবরিনার চোখ থেকে। তার চোখ শুকনো, অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে। শুধু ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আরও একজন।'

ছত্রিশ

লস এঞ্জেলেসের পুবের ডাউনটাউন বয়েল হাইটস। গত পঞ্চাশ বছরে তিন বা চারবার এ শহরে নানান মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। শুরুর দিকে, লস এঞ্জেলেস তখন বয়সে বালক, এখানে বাস করত যে প্রাচীন পরিবারগুলো তারা ছিল ঐশ্বর্যমন্ডিত। ১৯২০ এর দশকে এরা উত্তরে বেল এয়ার এবং দক্ষিণে পালোস ভার্দে পেনিনসুলায় চলে যায়। তারপর এ শহরে আগমন ঘটে ইহুদি অভিবাসীদের। তারা ছিল কঠোর পরিশ্রমী, এরাও টাকা পয়সা কামিয়ে সানফার্নান্ডো ভ্যালি এবং বেভারলি হিলসে চলে যায় ওদিকের নিসর্গ বেশি সবুজ ছিল বলে। এরপরে আসে মিডল ক্লাস মেক্সিকান-আমেরিকান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তারা পুবে, স্যান গেব্রিয়েল ভ্যালির শহরতলীতে অভিবাসী হয়। একসময়ের গর্বিত বয়েল হাইটস ডিস্ট্রিক্ট এখন সূর্যের তাপে পুড়ে মরছে, এখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দা গরীব কিউবান, সম্প্রতি মেক্সিকো থেকে আসা ইমিগ্রান্টদের দল আর বেশকিছু অবৈধ বিদেশি।

রবার্ট এবং সাবরিনা কামারো গাড়ি নিয়ে মনোহর চেহারার আবাসিক এলাকা দিয়ে চলেছে। জুনের এ গোধূলীবেলায় মাথায় লাল টাইলসের ছাদ, খিলান আকৃতির জানালা নিয়ে সিমেন্টের তৈরি বাড়িগুলো বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। বাড়িগুলোর সামনের লন বলতে নগ্ন বাদামী ঝোপঝাড়, তবে কোথাও কোনো আবর্জনা নেই। মসৃণ পেভমেন্ট, ছোট ছোট দোকানগুলো উজ্জ্বল রঙে রাঙানো। রাস্তার দু'পাশে সারসার পাম গাছ। বাতাসে গাছের পাতায় মৃদু শিহরণ। দেখে বিশ্বাস করা কঠিন এরকম সুন্দর এলাকার বাসিন্দারা আর্থিক দৈন্যতার শিকার।

ব্রুকলিন এভিন্যুর মোড়ে এসে গাড়ি থামাল রবার্ট। এক টুকরো কাগজে লেখা নাম্বার রাস্তার ঠিকানার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বলল, 'ওটাই সেই বাড়ি।'

রাস্তার ওপারে দোতলার একটি কাঠের বাড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখাল ও। বাড়িটির রাস্তার দিকের অংশ কমলা রঙে রঙ করা। কোকা কোলার বিজ্ঞাপনের একটি সাইনবোর্ড লেখা *পেয়েজে লিকার?*

'মদের দোকান মহিলার বাড়ি? প্রশ্ন করল সাবরিনা।

'নার্সের দেয়া ঠিকানায় তো তা-ই লেখা আছে,' জবাব দিল রবার্ট।

গাড়ি পার্ক করল ও। নেমে এল দু'জনে। রাস্তার মাথায়, রাস্তার একটি বাতির নিচে একদল তরুণ মেক্সিকান একটি প্রিমাউথ ফিউরি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছিল। তারা নীরবে দেখল রবার্ট আর সাবরিনা রাস্তা পার হয়ে মদের ছোট দোকানটির দিকে এগোচ্ছে।

ওরা দোকানে ঢুকল, দোকানের তাকে থরে থরে সাজানো মদের বোতল। একটি বড় রেফ্রিজারেটরে রাখা হয়েছে বিয়ার এবং কোমল পানীয়, ক্যানভর্তি কয়েকটি খাদ্য, পটেটো চিপস এবং ব্যান্ড বার। দোকানের মালিক, টাকমাথা, ইয়া ভুঁড়িওয়ালা, তার একজন খদ্দেরের সঙ্গে হড়বড় করে স্প্যানিশে কথা বলছিল। খদ্দেরটি বেশ গাট্টাগোট্টা, নাকে শুকনো ক্ষতের সাদা দাগ। রবার্টদেরকে দেখে দু'জনেই চুপ হয়ে গেল।

'হাই,' বলল রবার্ট।

কোনো সাড়া দিল না ভুঁড়িঅলা।

'এটা কি ২৫০০ চার্লস স্ট্রিট?'

খদ্দের তার কেনা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কাউন্টারের সামনে থেকে সরে গেল। রবার্টকে চোখ কুঁচকে দেখল দোকান মালিক, 'No se.'

স্প্যানিশের সঙ্গে স্প্যানিশে কী যেন বলল লোকটা। সাবরিনা শুধু migras শব্দটি বুঝতে পারল।

'না, না,' বলল ও, 'আমরা ইমিগ্রেশন সার্ভিস থেকে আসিনি।

দোকান মালিকের তবু সন্দেহ যায় না। 'ঠিক বলছেন?'

'নিশ্চয়।' বলল সাবরিনা। 'আমরা আমাদের এক বন্ধুর নানীকে খুঁজছি।'

'জ্বী, জ্বী,' সায় দিল রবার্ট।

কাস্টমারকে কী যেন বলল দোকানদার। সে রবার্ট আর সাবরিনার কাছ থেকে যতদূর সম্ভব দূরত্ব রেখে চলছিল। এবারে দ্রুত কদমে সে পগারপার হলো।

'ঠিক আছে,' বলল টেকো। 'আপনারা কাকে খুঁজছিলেন বললেন?'

'এক বৃদ্ধাকে,' বলল সাবরিনা। 'তাঁর নাম ভিল্লানুয়েভা। তার নাতনী ইনেজ আমাদেরকে এ ঠিকানাটা দিয়েছে।'

'ভিল্লানুয়েভা? সেই বুড়ি *ক্রুজা?*

'হ্যাঁ, তিনিই,' বলল সাবরিনা। 'উনি কি এখানে থাকেন?'

'না, এখানে থাকে না,' চট করে বলল দোকানদার। 'ওপরতলায় থাকে। ওখানে একটা ঘর নিয়ে সে আছে।'

'ওখানে কী করে যাব?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

'আপনারা বেহুদাই সময় নষ্ট করছেন। বুড়ি ক্রুজা কারও সঙ্গে কথা বলে না।'

'তবু আমরা একটু চেষ্টা করে দেখতে চাই,' বলল সাবরিনা। 'ওপরতলায় যাওয়ার সিড়ি কোনো দিকে?'

'আচ্ছা, যেতে চাইছেন যান। তবে সত্যি খামোকা সময় নষ্ট করছেন আপনারা। দোকানের বাইরে, বিল্ডিংয়ের পাশে সিড়ি আছে। ভবনের ওপরতলায় থাকে সে। খবরদার বলবেন না যেন আমি আপনাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি।'

সাবরিনা লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে রবার্টকে নিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। মদের দোকান আর একটি জুতো তৈরির দোকানের মাঝখানে, আগাছাভরা একটি সরু গলিতে কাঠের সিড়িটা খুঁজে পেল ওরা। দোতলা পর্যন্ত উঠে গেছে সিড়ি। সাবরিনা সিড়ি বাইতে শুরু করল। ওর পেছনে পেছনে এল রবার্ট।

কাঠের জীর্ণ দরজা কোনোরকমে কড়িবর্গার সঙ্গে ঝুলে আছে। ঠাণ্ডা একটা বাতাস ঝাপটা মারল সাবরিনার ঘাড়ে। শিউরে উঠল ও। রবার্টের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল সাবরিনা। উৎকণ্ঠার হাসি ফুটল দু'জনের মুখেই।

দরজায় নক করল রবার্ট। ভেতর থেকে কোনো সাড়া নেই। ওরা অপেক্ষা করছে। দূর থেকে ভেসে আসছে ব্রুকলিন এভিনিউর গাড়ির আওয়াজ। আবার কড়া নাড়ল রবার্ট।

'চলে যাও!' দরজার ওপাশ থেকে সরু, খনখনে গলায় বলে উঠল কেউ।

'আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' বলল রবার্ট।

সাবরিনা দরজায় মুখ ঠেকিয়ে বলল, 'সিনোরা ভিল্লানুয়েভা, আপনার নাতনি, যে হাসপাতালে নার্সের কাজ করে, সেই ইনেজ আমাদেরকে পাঠিয়েছে। সে নাকি আপনাকে আমাদের কথা বলেছে?'

ঘরের ভেতরে খড়মড় শব্দ হলো। তারপর ছিটকিনি টানার শব্দ এবং ভেতর দিকে ইঞ্চিছয়েক খুলে গেল দরজা। ভেতর থেকে বাসি একটা গন্ধ বেরিয়ে এল। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে উঁকি মারা বৃদ্ধাকে ঠাহর করতে এক মুহূর্ত সময় লাগল সাবরিনার। বৃদ্ধা টেনেটুনে পাঁচফুট হবেন উচ্চতায়, রোগা পাতলা গায়ে ঢোলা একটা সুয়েটার আর লম্বা স্কার্ট। তাঁর মুখ বলীরেখার দাগে ভর্তি।

'সেনোরা?'

বৃদ্ধা কিছু বললো না।

'আমি সাবরিনা স্টুয়ার্ট। এ আমার বন্ধু রবার্ট ডান।'

'আমি জানি তোমরা কে।' বৃদ্ধার কোটরে ঢোকানো চোখ দুটো দারুণ জীবন্ত এবং উজ্জ্বল। 'খুব যদি দরকারই হয় তাহলে ভেতরে এসো।'

দরজা মেলে ধরে তিনি সরে দাঁড়ালেন। সাবরিনা এবং রবার্ট ভেতরে ঢোকার পরে বন্ধ করে দিলেন দরজা। সাবরিনা চোখ বুলিয়ে দেখল ঘরে রয়েছে ধূসর

মিলিটারি কম্বল দিয়ে ঢাকা একটি সোফা-বেড, কাঠের একটি টেবিল, সেটি নানান রঙে চিত্রিত, তিনখানা চেয়ার, একটি সস্তা সাদা-কালো টেলিভিশন। টিভিতে গেমশো চলছে নিঃশব্দে। ঘরে আলোর উৎস বলতে একটি পুরানো স্ট্যান্ডিং ল্যাম্পের চল্লিশ ওয়াটের বাতি। ঘরের একমাত্র জানালাটি সবুজ পর্দা দিয়ে ঢাকা।

বৃদ্ধা টেবিলে বসলেন। সাবরিনা বসল তাঁর বিপরীতে। তৃতীয় চেয়ারটি দখল করতে যাচ্ছিল রবার্ট, তাকে বাধা দিলেন বৃদ্ধা। 'না। তুমি নও। তোমার এখানে কোনো কাজ নেই।' হাড্ডিসার একটি আঙুল তুললেন সোফা বেডের দিকে।

'তুমি ওখানে গিয়ে বসো।'

বিস্মিত দেখাল রবার্টকে তবে সে বৃদ্ধার নির্দেশ মেনে সোফা-বেডে গিয়ে বসল।

পুরো এক মিনিট সিনোরা ভিল্লানুয়েভা আর সাবরিনা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

'তুমি আমার কাছে কী চাও?' অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করলেন মেক্সিকান মহিলা।

'আ– আমি ঠিক জানি না,' বলল সাবরিনা। 'আগে আমার গল্পটা শুনুন।

'না। আমি তোমার গল্প জানি। তোমাকে ঘিরে আছে মৃত্যু। তুমি মৃত্যুর মাঝে বাস করছ। এ-ই হলো তোমার গল্প। শুধু বলো আমার কাছে কী চাও।'

'আমি আপনার কাছে যা চাই তা হলো এসব ঘটনার ব্যাখ্যা। আমি বুঝতে পারছি না আমাকে নিয়ে এসব কী ঘটছে এবং কেনইবা ঘটছে।'

আবার নেমে এল নীরবতা। বৃদ্ধার ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। অবশেষে তিনি বললেন, 'তুমি মৃতের পৃথিবীতে হেঁটে এসেছ।'

'জ্বী,' শিউরে উঠল সাবরিনা, যদিও ঘরটি বেশ গরম এবং গুমোট।

'তোমাকে তোমার সময় হওয়ার আগেই ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তোমার ওখানে যাওয়ার কথা ছিল না।'

সামনে ঝুঁকে এল সাবরিনা, প্রতিটি কথা গিলছে।

'তুমি অনেক দূরে চলে গিয়েছিলে। অনেক বেশি কিছু দেখে ফেলেছিলে। মৃতেরা তোমাকে ফিরে পেতে চায়।'

সেই টানেলের ভৌতিক কণ্ঠটা প্রতিধ্বনির মতো যেন বেজে উঠল সাবরিনার কানে। তুমি এখন ফিরে যেতে পারবে না। *তুমি অনেকদূরে এসে পড়েছ। তুমি কোনোদিনই ফিরতে পারবে না।*

'আমারও তা-ই মনে হয়েছিল,' মৃদু গলায় বলল সাবরিনা, 'যে ওরা আমাকে ফিরে আসতে দিতে চাইছিল না।'

'তবু তুমি ওদের আদেশ অমান্য করে ফিরে এসেছ। তুমি জীবনের কাছে ফিরে

এসেছিলে তোমার ভালোবাসার মানুষের আহ্বানে।

আড়চোখে রবার্টকে দেখল সাবরিনা। সে সোফা বেড়ে মেরুদণ্ড খাড়া করে বসে আছে, মাথাটা একটু কাত করে রেখেছে ওদের কথা শোনার জন্য।

'আমি ফিরে আসি,' বলল সাবরিনা। 'তবে এখন–'

'এখন ওরা তোমার কাছে এসেছে। মৃতরা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে।'

সাবরিনার গলা শুকিয়ে গেল। শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে এ কথায় সায় দিল।

'তুমি অনেক সাহস দেখিয়েছ, মেয়ে। তুমি ওদের সঙ্গে লড়াই করেছ, যদিও ওরা অত্যন্ত শক্তিশালী। মৃতেরা।'

'আমি বেঁচে থাকতে চাই,' বলল সাবরিনা। 'আমার বয়স তো এমন কিছু হয়নি যে এখুনি মরতে হবে।'

'সবাই বেঁচে থাকতে চায়, মেয়ে। এমনকী অশীতিপর বুড়োবুড়িরাও।

'জ্বী। কথাটা বলার জন্য দুঃখিত।'

'দুঃখিত হতে হবে না। তরুণরা ভাবে তারা সারা জীবন বেঁচে থাকবে।'

বৃদ্ধার কোটরাগত উজ্জ্বল চোখে স্নেহের আভাস দেখতে পেল। সে হাসল।

'তবে তোমাকে লক্ষ রাখতে হবে। চোখকান খোলা রেখে চলতে হবে। তোমার সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি।'

'ওরা আরও আছে নাকি?' প্রায় কান্না এসে গেল সাবরিনার।

'হ্যাঁ। তোমাকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে মোট ক'জন তোমার ওপর হামলা করতে আসবে।'

'আমাকে বলা হয়েছে? ঠিক বুঝলাম না।'

বৃদ্ধা সাবরিনার চোখে চোখ রাখলেন। তাঁর বলীরেখা ভর্তি চেহারা দেখে কিছুই বুঝতে পারল না সাবরিনা। আবার প্রতিধ্বনির মতো কানে বাজল টানেলের সেই ভয়াল কণ্ঠ *তুমি একবার জিততে পারবে, দ্বিতীয়বার হয়তো ফাঁকি দিতে পারবে, খুব জোর তৃতীয়বারও বেঁচে যাবে, কিন্তু চতুর্থবার– কক্ষনো না!*

সাঁইত্রিশ

'চার?

হামলাকারীর সংখ্যা কি মোট চারজন?

সিনোরা ভিল্লানুয়েভা মাথাটা সম্মতির ভঙ্গিতে সামান্য নিচু করলেন।

দ্রুত চিন্তা করছে সাবরিনা। গাড়ির সেই মহিলা, সেই ম্যানিয়াক, পাহাড়ের ওপর ওই মেয়েটা। মোট তিনজন। এ তিনজনের সঙ্গেই লড়াই করে জিতে গেছে ও।

কিন্তু চতুর্থবার– কক্ষনো না।

ওকি চার নম্বর জিন্দালাশকে ঠেকাতে পারবে? নাকি তার আগেই পাগল হয়ে যাবে!

'আপনি তো অনেককিছু দেখতে পান, সেনোরা,' বলল সাবরিনা। 'আপনি কি আমার নিয়তি দেখতে পান? আমি কি চার নম্বর জিন্দালাশের সঙ্গে লড়াইতে জিততে পারব?'

'এ প্রশ্নের জবাব আমি জানি না,' বললেন বৃদ্ধা।

হতাশার শীতল থাবা যেন চেপে ধরল সাবরিনাকে।

'আমার কি করার কিছুই নেই? ওই ভয়ংকর প্রেতাত্মাগুলো কখন আবার হামলা চালাবে সে ভয়েই কি আমার বাকি জীবনটা পার করতে হবে?'

'এ কথা সত্য যে অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা রাস্তা দিয়ে তোমাকে হাঁটতে হবে। বললেন বৃদ্ধা। 'তবু আশা আছে। মৃতদের অনেক শক্তি, তবে কিছু জিনিস তাদের আওতার বাইরে। শুধুমাত্র সদ্য মৃতরাই হাঁটার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু তাদের দেহও শেষে পঁচে গলে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। চার নম্বর আসার পরে আর কেউ আসবে না।'

'চার নম্বর জিন্দালাশটা কখন বা কবে আসবে বলতে পারবেন?'

'না, তা আমি জানিনা।'

মুখ ফিরিয়ে নিল সাবরিনা। ওর ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে।

'তোমাকে শুধু এটুকুই বলতে পারি?' বলে চললেন বৃদ্ধা, 'ইভ অব সেন্ট জনের পরে আর কেউ তোমাকে ধাওয়া করতে আসবে না।'

কথাটা শোনামাত্র চমকে উঠল সাবরিনা। *তুমি ইভ অব সেন্ট জনের সময় অবশ্যই ফিরে আসবে।*

'এ নামটা আমি শুনেছি। কী এটা? ইভ অব সেন্টজন কী জিনিস?'

'এটা হলো এ পৃথিবীর বাইরের সকল প্রাণীর সেরা রাত। এ সময়ে আত্মারা উড়ে বেড়ায়, মৃত মানুষরা হাঁটাহাঁটি করে। এ হলো জাদুটোনার রাত, ডাইনিদের রাত। আমাদের ভাষায় এ হলো la nocne de medio-verano. মিডসামার নাইট।'

'মিড সামার নাইট!' পুনরাবৃত্তি করল সাবরিনা। তাকাল রবার্টের দিকে। 'কবে এটা?'

রবার্ট একটু চিন্তা করে বলল, 'মনে হয় জুনের ২৩ তারিখ। সোমবার।'

সাবরিনা ফিরল সিনোরা ভিল্লানুয়েভার দিকে। তিনি মৃদু মাথা ঝাঁকালেন। 'সোমবার।'

'ওরা যদি সোমবার আমাকে মেরে ফেলতে না পারে তাহলে কি এসবের অবসান হবে?'

'ইভ অব সেন্ট জনের পরে মৃতদের আর কোনো শক্তি থাকবে না।'

গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সাবরিনা। মনে হলো ও যেন প্রায় মুক্ত, স্বাধীন একটা মানুষ। লক্ষ করল বৃদ্ধা তখনও তার দিকে ঠায় তাকিয়ে আছেন। কীসের যেন সাবধানবাণী তাঁর চোখে।

'আর কিছু বলবেন?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'তোমাকে আমার আর কিছু বলার নেই। তোমরা এখন যেতে পারো।' খনখনে, সরু কণ্ঠটি হঠাৎ শীতল শোনাল।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে চেয়ার ছাড়ল সাবরিনা। ওর পাশে এসে দাঁড়াল রবার্ট।

'এক মিনিট,' বলল সে, 'আমাদেরকে আরও অনেক কিছু বলার আছে আপনার। আমরা জানতে চাই এই শেষ জিন্দালাশ দেখতে কেমন হবে? তাকে আমরা চিনব কীভাবে? তাকে আমরা বাধা দেব কীভাবে?'

নিজের আসন ছেড়ে অনেক কষ্টে সিধে হলেন সিনোরা ভিল্লানুয়েভা। ফিরলেন রবার্টের দিকে। তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি বেরুল।

'বললামই তো তোমাদেরকে আমার আর কিছু বলবার নেই। এখন কিছু বললেও কোনো কাজ হবে না।'

'কিন্তু আপনি নিশ্চয় আরও অনেক কিছু জানেন।'

'জানি বৈকি।'

'ঈশ্বরের দোহাই বলুন কী জানেন? কী দেখতে পাচ্ছেন আপনি?'

'দেখতে পাচ্ছি আরও মৃত্যু,' বললেন বৃদ্ধা, বন্ধ ঘরে তাঁর কণ্ঠ যেন বিস্ফোরিত হলো। 'দেখতে পাচ্ছি একজন বন্ধুকে যে আসলে বন্ধু নয়। দেখছি আগুন এবং রক্ত। আর বেশি কিছু নয়।'

'আর বেশি কিছু নয়' কথার মানে কী?' বিপজ্জনকভাবে গলা চড়ল রবার্টের। 'আপনি আমাদেরকে ধাঁধার মধ্যে রাখছেন কেন? আমরা চাই তথ্য, তারিখ, জানতে চাই সময়।'

'রবার্ট, প্লীজ–' বলল সাবরিনা।

বৃদ্ধা এক কদম এগিয়ে গেলেন রবার্টের দিকে। ওর মুখে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারলেন। তথ্য, অ্যাঁ তুমি তথ্য চাইছ? বেশ, যুবক। আমি তোমাকে তথ্য দেব। বলে দিতে পারি কবে তুমি মারা যাবে। বলতে পারি কীভাবে ঘটবে তোমার মৃত্যু। এবং সেটা তুমি কোনোভাবেই বদলাতে পারবে না।'

ঘরে অকস্মাৎ আড়ষ্ট নীরবতা নেমে এল।

'তো? তুমি কি তথ্যগুলো এখনই জানতে চাও, অনিসন্ধিৎসু যুবক?'

বিবর্ণ হয়ে গেল রবার্টের চেহারা। ঘামছে সে। অবশেষে অস্ফুট উচ্চারণ করল, 'না।'

বৃদ্ধা ওর দিকে কটমট করে তাকিয়েই থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে রবার্টের মুখের ওপর থেকে নামিয়ে আনলেন আঙুল। 'কথা বলবে ভেবেচিন্তে। কখন এবং কীভাবে মারা যাবে এ কথা জানতে চাওয়ার মতো বড় অভিশাপ আর নেই।'

চলৎশক্তিহীনের মতো দাঁড়িয়েই রইল রবার্ট। সাবরিনা ওকে কনুই দিয়ে ধাক্কা মারলে সম্বিৎ ফিরে পেল রবার্ট। রওনা হলো দরজার দিকে।

'সিনোরা, আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দিই?' বলল সাবরিনা।

'আমার ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই।'

'তাহলে অন্তত: আপনাকে কিছু টাকা দিতে দিন,' সাবরিনা তার ব্যাগ খুলতে গেল।

'টাকা? টাকা দিয়ে আমি কী করব? এখন চলে যাও। আমি ক্লান্ত।'

স্বল্পালোকিত, স্যাঁতস্যাঁতে ঘরটি থেকে বেরিয়ে এল রবার্ট এবং সাবরিনা। সিড়ি বেয়ে নেমে এল গলিতে। রাস্তায় এসে রাতের তাজা বাতাস নিল বুক ভরে। নিরেট পেভমেন্ট, পাম গাছ, প্লিমাউথ গাড়ির সামনে তরুণের দল সবকিছুই সিনোরা ভিল্লানুয়েভা আর তার ছোট অন্ধকার ঘর থেকে আলাদা একটি পৃথিবীর অংশ বলে মনে হলো। এ পৃথিবীটাই ওদের চিরচেনা, জীবন আর প্রাণের পৃথিবী।

ওরা রাস্তা পার হয়ে নিজেদের গাড়িতে উঠে বসল।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে সাবরিনার দিকে ফিরল রবার্ট। 'তোমার কেমন মনে হলো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'কী কেমন মনে হলো?'

'ওই বুড়ি মহিলাকে।'

'ওনার কথা আমার বিশ্বাস হয়েছে। তাছাড়া বিশ্বাস না করেই বা উপায় কী?'

গাড়ি গিয়ারে দিয়ে ফুটপাত থেকে রাস্তায় নেমে পড়ল রবার্ট।

'আমি জানি না। সে হয়তো তোমাকে একটা ধাপ্পা দিয়েছে।'

'আমাকে ধাপ্পা দিতে যাবে কীসের জন্য? টাকা সাধলাম। নিল না।

'হয়তো এবারে নেয়নি। ধাপ্পাবাজির খেলাটাই তো এভাবে খেলা হয়। তারা প্রথমে কোনো টাকা পয়সা না নিয়ে তোমাকে তাদের বিশ্বাসের জালে বেঁধে ফেলবে। তার পরেরবার তুমি যখন ওদের কাছে যাবে তখন তোমাকে ঠিকই খসাবে।'

'রবার্ট, গাড়ি থামাও।'

'কী?'

'বললাম গাড়ি থামাও।'

অবাক চোখে সাবরিনাকে দেখল রবার্ট তারপর কামারোর গতি কমিয়ে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড় করাল। ফিরল সাবরিনার দিকে।

'এখন বলো তুমি এর মধ্যে ধাপ্পাবাজিটা কোথায় দেখলে?' রাগে গজরাতে গজরাতে বলল সাবরিনা।

নিজের আসনে অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে বসল রবার্ট। 'না মানে.. আমি বলতে চাইছিলাম এ বৃদ্ধা মহিলাকে আমরা কতটুকুই বা চিনি? একটি মেয়ে, যাকে আমরা দু'জনের কেউই চিনি না, সে দাবি করে বসল তার নানীর নাকি অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে। এসব ব্যাপার হজম করাই তো মুশকিল।'

সাবরিনা কটমট করে তাকাল রবার্টের দিকে। 'রবার্ট, তোমাকে আমি আসলে বুঝতে পারি না। এখানে আসার আগে নিজের এ সন্দেহের কথা নিয়ে তো কিছু বলোনি। এখানে আসার ব্যাপারে আমার মতোই তুমি উৎসাহী ছিলে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, তুমি কখন এবং কীভাবে মারা যাবে সে কথা যখন উনি বলে দিতে চাইছিলেন তখন কি তোমার মনে হয়েছিল উনি তোমার সঙ্গে চালাকি করছেন?'

'আমি...' সাবরিনার চোখে চোখ রাখতে পারল না রবার্ট, তাকাল উইন্ডশীল্ডের দিকে। 'না।' সে মিনমিনে গলায় বলল। 'আমার বিশ্বাস হয়েছিল মহিলা ওটা বলে দিতে পারবে। গড হেল্প মি, এখনও আমি বিশ্বাস করি সে সেটা পারবে।'

'তাহলে...?'

'আমি ভয় পেয়েছিলাম, সাবরিনা। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কখন ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে সবকিছু আবার এতো সাধারণ এবং স্বাভাবিক লাগছিল যে নিজের ওপর ধিক্কার হচ্ছিল আমার। আমার মনের একটা অংশ মেনে নিতে পারছিল না যে ওই ছোটখাটো বুড়ি মেক্সিকান মহিলা আমার দিকে আঙুল, আমাকে ভয় দেখিয়ে আত্মা উড়িয়ে দিয়েছিল। ব্যাপারটা যেভাবেই হোক অস্বীকার করা দরকার ছিল আমার। প্রমাণ করার দরকার ছিল যে আমি শক্তিশালী, তাই আমি হড়বড় করে ওসব কথা বলে ফেলেছি, মুখের লাগমটা আর টেনে ধরতে পারিনি।'

সাবরিনা রবার্টের মাথাটা নিজের কাছে টেনে এনে চুমু খেল। 'তুমি সে-ই পুরুষ যাকে আমি ভালোবাসি। এখন কি আমরা বাড়ি যেতে পারি?'

রবার্ট সাবরিনার গালে একটা হাত রেখে গভীর চোখে ওর দিকে তাকাল। 'সাবরিনা,' বলল সে। 'তুমি একটা মেয়েই বটে।'

আটত্রিশ

বীচউড ড্রাইভের বাড়িতে একটা ক্যানভাসের চেয়ারে বসে আছেন ডা. অশোক চৌধুরী। তাঁর মুখোমুখি কফি টেবিলের ওপাশে বসেছে সাবরিনা এবং রবার্ট। ইনেজ ভিল্লানুয়েভার নানীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছিল সাবরিনা, ডাক্তারের পূর্ণ মনোযোগ তার গল্পে।

সাবরিনার গল্প বলা শেষ হলে ঘরে দীর্ঘক্ষণের জন্য বিরাজ করল নীরবতা। অবশেষে ডা. চৌধুরী নীরবতা ভাঙলেন। 'ইটস ফ্যান্টাস্টিক' যদিও পরোক্ষভাবে আমিই তোমাদের ওই মহিলার কাছে পাঠিয়েছিলাম তবু এ গল্প বিশ্বাস করা খুব কঠিন। ডাইনি, জিন্দালাশ এসব ব্যাপার হজম করাই মুশকিল।'

'জানি আপনি কী ভাবছেন,' বলল রবার্ট। 'আমি ওখানে ছিলাম এবং যা শুনেছি তা এখনও আমাকে বিমূঢ় করে রেখেছে। ঈশ্বর জানেন এসব ঘটনা যে ঘটছে তা আমি বিশ্বাস করতে চাই না, কিন্তু অবিশ্বাস না করেই বা উপায় কি?'

'আপনার যদি অন্য কোনো যুক্তি বা ব্যাখ্যা থাকে, ডক্টর, আমি তা মেনে নিতে রাজি,' বলল সাবরিনা।

'সেরকম কিছু থাকলে তো ভালোই হতো,' বললেন চৌধুরী।

'কিন্তু নেই তো! আমাদের এখন একটাই করণীয় আমরা ধরে নিতে পারি বৃদ্ধা যা বলেছেন তা সব সত্যি এবং এ বিশ্বাস নিয়েই এগোতে হবে। তোমার কাছে কাগজ কলম আছে?'

সাবরিনা ডাক্তারকে একটি হলুদ প্যাড আর একটি বলপয়েন্ট দিল। তিনি তাঁর সামনে, কফি টেবিলের ওপর প্যাডটি রাখলেন।

'মাঝে মাঝে আমি আমার সমস্যার কথা কাগজে লিখে নিই। তাতে সমস্যার সমাধান করতে সুবিধা হয়।'

'আপনি এখন একজন ইঞ্জিনিয়ারের মতো কথা বলছেন,' বলল রবার্ট।

'প্রথমে যে কাজটি করতে হবে,' বলে চললেন ডাক্তার, 'তা হলো সমস্যার ধরন নিরূপন।'

এক মুহূর্ত সবাই নিশ্চুপ রইল তারপর রবার্ট বলল, 'আরে, এটা সবচেয়ে সহজ কাজ। বৃদ্ধা যে কথা বলল তা যদি আমরা মেনে নিই তাহলে বুঝতে হবে কেউ বা কিছু সাবরিনার ওপর হামলা চালাতে আসবে।'

ডা. চৌধুরী প্যাডের ওপরে গোটা গোটা অক্ষরে লিখলেন *সাবরিনার জীবন বিপন্ন।*

'বিপদের ধরন সম্পর্কে আমরা কী জানি?'

'মহিলা বলেছে ওরা ওই জোম্বিদের আরেকটা অর্থাৎ চার নাম্বারটাকে পাঠাবে। এবং ওটাই শেষ।'

ডাক্তার লিখলেন *ম্যাক্সিমাম ৪টা জোম্বি।*

শিউরে উঠল সাবরিনা কিন্তু বলল না কিছু।

'ওদের তিনজনকে ইতিমধ্যেই ব্যবহার করা হয়েছে,' বলল রবার্ট।

'হ্যাঁ,' সায় দিল সাবরিনা। 'গাড়ির সেই মহিলা, রোববার রাতে যে লোকটা এখানে অনুপ্রবেশ করেছিল আর পাহাড়চূড়োয় সেই মেয়েটি।'

ডা. চৌধুরী প্যাডে আবার নোট নিলেন *৩টা গেছে, ১টি আছে।*

'একটা আছে,' লেখাটা পড়ে এক মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজল সাবরিনা।

'একটা টাইম লিমিটও জানা গেছে,' বলল রবার্ট। 'শেষ জোম্বির আসার কথা ইভ অভ সেন্ট জনের দিন। সেদিন সোমবার। ওই দিনটা যদি উতরে যেতে পারি, আমরা জিতে যাবো।'

ডেডলাইন : ২৩ জুন, লিখলেন ডাক্তার।

'যেহেতু এখন ডেডলাইনটি আমরা জানি,' বললেন তিনি, 'কাজেই এই সময়ের মধ্যে সাবরিনাকে এক মুহূর্তের জন্যেও একা রাখা যাবে না।

'নিশ্চয়,' বলল রবার্ট। ও আমার বাসায় থাকবে।

'অন্য কোথাও ওকে নিয়ে যাওনা। শহর থেকে দূরে।'

'নেয়া যায়,' বলল রবার্ট। 'ওকে নিয়ে সান ফ্রান্সিসকো চলে গেলাম। সোমবার পর্যন্ত ওখানেই থাকলাম।'

'এক মিনিট,' বলল সাবরিনা। তার কণ্ঠের তীক্ষ্ণধার ওদের দু'জনকেই চমকে দিল। 'আপনারা দু'জনে মিলে এমনভাবে প্ল্যান করছেন যেন এ ঘরেই আমি নেই। আমি কোনো অসহায় শিশু নই। আমি কাচের তৈরি কোনো পুতুলও নই যে তুলোয় মুড়ে আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে হবে।'

'আয়াম সরি, সাবরিনা,' বললেন ডা. চৌধুরী। 'তোমাকে কীভাবে নিরাপত্তা দেয়া যায় সেটার সবচেয়ে ভালো উপায় আমরা খুঁজছিলাম।'

'আমরা জানি তুমি অসহায় নও,' বলল রবার্ট, 'এবং তুমি কাচের তৈরি তো নও-ই।'

'ঠিক আছে,' গলার স্বর নরম করল সাবরিনা। 'আমি অকৃতজ্ঞের মতো কথা বলতে চাই না। কিন্তু আপনারা যেসব পরামর্শ দিচ্ছেন সেগুলোর কথা একবার ভেবে

দেখুন। আমাকে একা রাখতে চাইছেন না। দ্যাটস ফাইন। আমি এ মুহূর্তে একা থাকতে ভীতও নই কারণ আমাদের হাতে এখনও চারদিন সময় আছে। কেউই চাইবে না চারদিন প্রতিটি সেকেণ্ড তার ওপর নজর রাখা হোক এবং আমরা কী করে বুঝব এতে খুব একটা ফায়দা হবে কিনা, রোববার রাতে তো আমি একা ছিলাম না, তবু ওই ম্যানিয়াকটা আমার বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকে আমার ওপর হামলা চালিয়েছিল।'

'কিন্তু, এখন তো আমরা জানি কীসের বিরুদ্ধে লড়াই করছি,' বলল রবার্ট। 'রোববারের হামলাটা ছিল আকস্মিক।'

'তা বটে,' স্বীকার করল সাবরিনা। 'কিন্তু এজন্য কেন আমাকে শহর ছেড়ে পালাতে হবে বুঝতে পারছি না। কেউ যদি মরা মানুষটাকে জ্যান্ত করে হত্যার জন্য লেলিয়ে দিতে পারে, তাহলে আমি স্যানফ্রান্সিসকো যাই কিবা এখানেই থাকি, খুব একটা আসবে যাবে না। সব জায়গাতেই সে হামলা চালাতে পারবে।

'তোমার কথায় যুক্তি আছে,' বললেন ডা. চৌধুরী। 'আমরা এই জিন্দালাশদের বিষয়ে কিছু তথ্য জানি। যেমন তারা অভেদ্য বা অবেধ্য নয়। তাদেরকে আঘাত করা যায়, মেরে ফেলাও যায়। ওই মহিলার কথা অনুসারে যদি শুধু সদ্য মৃত একজনই জিন্দালাশে পরিণত হতে পারে তাহলে আর আমাদের ভয় থাকছে না যে কবর থেকে দলে দলে লাশ বেরিয়ে আসবে।'

'এটা অবশ্য ভালো খবর,' বলল সাবরিনা।

'অন্তত: এটুকু আমরা জানতে পারছি যে ওদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ওদের সম্পর্কে আর কী কী জানি আমরা?'

'তারা সহজেই হাঁটাচলা করতে পারে,' বলল সাবরিনা। 'তারা ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন এবং খুব দ্রুত রিঅ্যাক্ট করে।'

ডা. চৌধুরী পৃষ্ঠার মাঝখানে বড় বড় অক্ষরে *জিন্দালাশ* কথাটি লিখে নিচে আন্ডারলাইন করলেন। তার নিচে লিখলেন : *ক্ষিপ্রতা।*

'আর ওদের গায়ে অনেক জোরও আছে,' বলল রবার্ট। 'স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে ওরা অনেক বেশি বলবান। রোববার যে দানবটা আমাকে দেয়ালে ছুড়ে মেরেছিল তার ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল আমি যেন পালকে তৈরি।'

শক্তি

'আর ওরা কথাও বলতে পারে,' যোগ করলেন ডা. চৌধুরী। 'যদিও ওদের ভেতরে কোনো সচেতনতা থাকে না। গাড়ির ওই মহিলার স্বামী আমাকে বলেছে তার স্ত্রীর আপাত মৃত্যুর বেশ কয়েক ঘণ্টা পরেও সে নাকি লোকটির সঙ্গে কথা বলেছিল। আর এড ফ্রাঙ্কোভিচ যে এখানে রোববার হামলা চালিয়েছিল– সেও নাকি মৃত্যুর পরে

কথা বলেছিল।'

কথা বলা

'আর পাহাড়ের ওই মেয়েটি?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

'আমি তাকে কথা বলতে শুনিনি,' জবাব দিল সাবরিনা। 'তবে তার গায়ে অনেক জোর ছিল। আমি ভাগ্যগুনে তার কবল থেকে বেঁচে গেছি।'

'ওরা মেয়েটার লাশ কি খুঁজে পেয়েছে?' জানতে চাইল রবার্ট।

'এখনও পায়নি,' জানালেন ডাক্তার। 'মেয়েটি যেখানে ছিটকে পড়ে ওখানকার স্রোত খুব শক্তিশালী। স্রোতের টানেই হয়তো বহুদূরে ভেসে গেছে ওর লাশ। আমি অবশ্য আমার হাসপাতালে বলে রেখেছি মেয়েটির কোনো খোঁজ পেলে আমাকে যেন জানায়।'

চিন্তিত দেখাচ্ছে সাবরিনাকে। 'আচ্ছা, ডক্টর, আপনি তো ওই জিন্দালাশদের পরিচিতজনদের সঙ্গে কথা বলেছেন। ওরা আসলে কেমন মানুষ ছিল? মানে যখন বেঁচে ছিল?'

'একদমই সাধারণ মানুষ,' বললেন ডা. চৌধুরী। 'ইভোন কার্লসন ছিল মধ্যবয়স্কা এক গৃহবধূ, তার স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে মহিলা নিজের ঘর সংসার নিয়ে খুবই সুখী ছিল। আর এড ফ্রাঙ্কোভিচ একাকী বাস করলেও সে ছিল নিপাট একজন ভদ্রলোক। কিন্তু জিন্দালাশে পরিণত হওয়ার পরে এরাই ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল।'

'আর ওদেরকে হত্যা করাও ছিল খুব কঠিন,' বলল রবার্ট। 'কিংবা বলতে পারেন ধ্বংস করা।'

'ঠিকই বলেছ,' কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল সাবরিনার।

'আমি দেখেছি বারবার তুমি ওই ভয়ংকর লোকটাকে আঘাত করেছ তারপরও ওটা এগিয়ে আসছিল।'

'এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট,' বললেন ডা. অশোক। 'জিন্দালাশরা কিভাবে নিশ্চল হয়ে পড়ে? উদাহরণ হিসেবে গাড়ির ওই মহিলার কথাই ধরি।'

'মহিলা গাড়ি থেকে নেমেই মাটিতে গড়িয়ে পড়েছিল, 'বলল সাবরিনা। 'কেউ তার গায়ে হাত দেয়নি, সে গাড়িতে বসেও কোনো আঘাত পায়নি। শুধু একটা ঝোপের গায়ে বাড়ি খেয়ে থেমে গিয়েছিল গাড়ি।'

মাথা দোলালেন ডাক্তার। 'মহিলার শরীরে শুধু আগের রাতের বিদ্যুৎস্পৃষ্টতার চিহ্ন পাওয়া গেছে। দুপুরের অ্যাক্সিডেন্টে তার কোনো শারীরিক ক্ষতি হয়নি।'

'আর এখানে যে লোকটা এসেছিল,' বলল রবার্ট, 'তাকে আমি আঘাতের পর আঘাত করেছি কিন্তু তার গতি রোধ করতে পারিনি। লোকজন দৌড়ে আসার আগ

পর্যন্ত সে সাবরিনাকে মারতে চেয়েছিল। তারপর সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।'

'ওই মহিলা যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখনও তার আশেপাশে মানুষজন ছিল তাই না, সাবরিনা?'

'জ্বী। গাড়িটা ধাক্কা খেয়ে থেমে গেলে তারা অকুস্থলে ছুটে যায়। মহিলা গাড়ি থেকে নামার সময়ও তারা ওখানেই ছিল।'

'হতে পারে।' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন ডাক্তার, 'যখন জিন্দা লাশদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয় কিংবা যেহেতু তারা তাদের কাজ শেষ করতে পারেনি, তারা তখন স্রেফ... হাল ছেড়ে দেয়।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে,' বলল রবার্ট।

'এটা হতেও পারে। আর সৈকতের ওই মেয়েটার ক্ষেত্রে কী ঘটেছিল, সাবরিনা?'

'রবার্ট রেস্টুরেন্ট থেকে লোকজন না নিয়ে আসা পর্যন্ত মেয়েটা আমাকে হামলা করছিল। ওরা আসার পরে ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়। তবে লোকজন আসার কারণেই যে মেয়েটা রণেভঙ্গ দিয়েছিল এমনটি নিশ্চিত করে বলতে পারব না— মেয়েটা টান মেরে আমার ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলেছিল এবং তাল সামলাতে না পেরে পাহাড় থেকে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল।'

ভুরু কোঁচকাল রবার্ট। 'ধরে নিলাম আপনার কথাই সত্য, লোক পরিবৃষ্ট হয়ে পড়লে জিন্দালাশরা হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলে। কিন্তু তাতে আমাদের কী ফায়দা?'

'ওদের সম্পর্কে যত বেশি জানতে পারব ততই আমরা প্রস্তুতি নিতে পারব,' বলল সাবরিনা।

'তোমার কেন একা থাকা উচিত হবে না এটা তার অন্যতম একটি কারণ,' বলল রবার্ট।

'রবার্ট, আবার শুরু করলে?'

'ধ্যাত্তেরি, এখন তোমার ইগো প্রবলেম নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় নয়।'

ডা. চৌধুরী ওদের ঝগড়া থামানোর জন্য বললেন, 'রবার্ট, সাবরিনা, এখন আমাদেরকে একত্রে কাজ করতে হবে। নইলে এসব তথ্য কোনোই কাজে আসবে না।'

'জানি, আমি,' গলার স্বর নরম করল সাবরিনা। 'বিশ্বাস করো, রবার্ট, আমার জন্য তুমি যা করেছ বা করছ তাতে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। তবে আমি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকব এবং কিছুই করতে পারব না আর ওদিকে তোমরা বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে, ভাবলেই আমার রাগ উঠে

যাচ্ছে।'

'তোমার রাগ করা মোটেই উচিত হচ্ছে না,' বলল রবার্ট। 'তুমি নিজেও তা জানো।'

'জানি বৈকি। তবু নিজেকে সামাল দিতে পারছি না।'

'সোমবারের পরে এসব নিয়ে ঝগড়া করার অনেক সময় তোমরা পাবে,' বললেন ডা. চৌধুরী।

'তবে তার আগ পর্যন্ত,' সাবরিনাকে বলল রবার্ট, 'তুমি আমার সঙ্গে থাকছ তো?'

'আমি তোমার সঙ্গে থাকব,' বলল সাবরিনা। 'তবে তোমার অ্যাপার্টমেন্টে নয়, আমার বাড়িতে।'

'এতে ফায়দা কী?'

'ফায়দা এই যে নিজের বাড়িতে থাকলে পালিয়ে বেড়াচ্ছি এই অনুভূতি আমার ভেতর একটু কম কাজ করবে।'

'ঠিক আছে। এ দু:স্বপ্নের অবসান ঘটার আগ পর্যন্ত আমি তোমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী হচ্ছি।'

'তোমার চাকরির কী হবে?'

'নো প্রবলেম। আমি কাল আর সোমবার ছুটি নেব।'

আপত্তি করতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল সাবরিনা। তারপর হাসল।

'অলরাইট, রবার্ট, থ্যাংকস।'

ডা. চৌধুরী তাঁর তালিকায় চোখ বুলিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন, সে সঙ্গে টিক চিহ্ন দিয়ে চললেন। তারপর বললেন, 'এটাই পূর্ণাঙ্গ নয়। তবে নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। আমরা কিছু গাইডলাইন পেয়েছি। এখন অন্তত: ছায়ার সঙ্গে লড়াই করতে হবে না।' ঘড়ি দেখলেন তিনি। 'আমার যাওয়ার সময় হলো। দিনে বা রাতে যখনই কোনো ঘটনা ঘটে, আমার ফোন নাম্বার তো আছেই তোমাদের কাছে। ফোন কোরো।'

দোরগোড়া পর্যন্ত ডাক্তারকে পৌঁছে দিল সাবরিনা, 'থ্যাক ইউ ডক্টর। আমার জন্য অনেক করলেন।'

'আরে দূর, আমি কিছুই করতে পারিনি।'

'না, সত্যি বলছি। এসবের মধ্যে আপনি না জড়ালেও পারতেন।'

'তা পারতাম বটে,' বললেন চৌধুরী। 'আমি তো আসলে এতদিন ধরে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে, একাকী বাস করে আসছিলাম। শুধু নিজের কথাই ভাবতাম। অনেকদিন ধরে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে আছি, কারও কোনো কাজের সঙ্গে

জড়াচ্ছি না। কিন্তু কোনো মানুষতো দ্বীপে একাকী বাস করতে পারে না, তাই না?'

'জ্বী,' ডাক্তারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল সাবরিনা। তিনি বেরিয়ে গেলেন দরজা খুলে। ঝোপঝাড়ের মাঝে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে হেঁটে চললেন রাস্তার দিকে। ডাক্তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে ঘুরল সাবরিনা। দেখল ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে রবার্ট।

দু'হাত বাড়িয়ে দিল রবার্ট। ওর আলিঙ্গনে সেঁধিয়ে গেল সাবরিনা। ওকে দীর্ঘ চুম্বন করল। যখন বিচ্ছিন্ন হলো, ঘনঘন শ্বাস ফেলছে দু'জনেই।

'যদিও বিদঘুটে একটা সময় পার করছি আমরা,' বলল সাবরিনা, 'তবু আমি চাই তুমি এক্ষুনি আমার সঙ্গে প্রেম করবে, রবার্ট। তোমাকে আমি এ মুহূর্তে এমনভাবে কামনা করছি যে আমার দাঁতে ব্যথা উঠে গেছে।'

ওকে আবার চুমু খেল রবার্ট। 'আমিও তোমাকে সাংঘাতিকভাবে চাই, সোনা। দারুণভাবে চাই।'

'তোমার কি মনে হয় বিপদ আপদ মানুষের কামনাবাসনা বাড়িয়ে দেয়?'

'কী জানি। সে যাই হোক, কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না। এসো, কাজে লেগে যাই।'

ওরা অনেক সময় নিয়ে প্রেম করল। তারপর একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল।

উনচল্লিশ

শুক্রবার সকাল। ভয়ানক গরম পড়েছে আজ। তীব্র লু হাওয়া বইছে। মরুভূমির দিক থেকে ধেয়ে আসা চামড়া পোড়ানো এ হাওয়ার স্থানীয় নাম সান্তা অ্যানা। লস এঞ্জেলেস আস্ত একটা চুল্লিতে পরিণত হয়েছে।

রবার্ট বিছানায় গড়ান দিয়ে উপুড় হলো। 'কী বিশ্রী গরম।'

'জুন মাসে এরকম গরম কল্পনাই করা যায় না,' ওকে সায় দিল সাবরিনা। রবার্টকে জিজ্ঞেস করল, 'নাশতায় তুমি কী খাবে?'

'তোমার যা খুশি বানাও।'

ওকে চুমু খেয়ে বিছানা ছাড়ল সাবরিনা। গায়ে হালকা একটা রোব পেঁচিয়ে ঢুকল কিচেনে। ফ্রিজ খুলে ফুটি বের করে ওটাকে দুভাগ করল। ফ্রাইং প্যানে দুটো মোটা হ্যামের টুকরো ছেড়ে দিয়ে একটা বাটিতে সাবধানে চারটা ডিম ফেটাল।

কিছুক্ষণ পরে শাওয়ার ছেড়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রবার্ট। মুখের গিজগিজ দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, 'আমার শেভ করা দরকার।'

'আমার ব্লেড দিয়ে শেভ করতে পারো,' বলল সাবরিনা।

'তোমার ওই হালকা ব্লেড আমার শক্ত দাড়িতে লাগলেই ভেঙে যাবে। শুধু ব্লেড না, আরও কিছু জিনিস নিয়ে আসতে একবার বাসায় যাওয়া সত্যি দরকার।'

'কী জিনিস?'

'আন্ডারওয়্যারসহ আরও ব্যক্তিগত ব্যবহার্য কিছু জিনিস।'

সাবরিনা বলল, 'নাশতা খেয়ে বাসায় যেয়ো। তোমার দরকারি জিনিসপত্র নিয়ে এসো।'

'তুমি আমার সঙ্গে চলো?'

'না, আমি যেতে পারব না। আমার ঘরদোর পরিষ্কার করা দরকার। গত এক সপ্তাহ ধরে ঘরে হাত দিই না। সব নোংরা হয়ে আছে।'

'কিন্তু তোমাকে একা রেখে যেতে ভরসা পাচ্ছি না।'

'আরে এক ঘণ্টারই তো ব্যাপার। এক ঘণ্টায় আমার কিছু হবে না।'

'যদি কথা দাও তুমি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকবে, অচেনা কেউ এলে

দরজা খুলবে না শুধু তাহলেই আমি যেতে পারি।'

'রোববারের ওই ঘটনার পরেও দরজা খুলব মাথা খারাপ?'

'আগে আমার কাছে কসম খেতে হবে।'

'আচ্ছা, কসম খেলাম অপরিচিত কেউ এলে দরজা খুলব না।'

তবু রবার্টের চেহারা থেকে সন্দেহ যায় না।

'আরে, কী হলো তোমার? আমি তো নুতুপুতু কোনো মেয়ে নই!' বলল সাবরিনা।

'জানি তুমি তা নও,' বলল রবার্ট। 'আমি শুধু... আচ্ছা, বাদ দাও। আমি যাবো আর আসব।'

ওরা একসঙ্গে নাশতা খেল, খেতে খেতে ঠাট্টা তামাশা করল। বাইরে বাতাস উত্তপ্ততর হয়ে উঠছে। নাশতা খাওয়া শেষ হলে সাবরিনাকে চুম্বন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল রবার্ট।

একা বাড়িতে আরও যেন বেশি গরম লাগছিল সাবরিনার। ওর বাসায় এয়ার কুলার নেই, আর বৈদ্যুতিক পাখাও নষ্ট। রবার্টকে ও কথা দিয়েছে দরজা বন্ধ করে রাখবে। শুধু জানালা দিয়ে সামান্যই বাতাস আসছিল। গরমে অস্থির লাগছিল সাবরিনার। স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ছিল।

এসবই এ বাতাসটার জন্য ভাবল ও। সান্তা অ্যানার কু-প্রভাব সম্পর্কে সকলেই জানে। পুব থেকে বাতাসটা আসে, মানুষের মাথা খারাপ করে দেয়। বাচ্চারা কোনো কারণ ছাড়াই কান্নাকাটি করতে থাকে, প্রেমিক প্রেমিকাদের সম্পর্ক ভেঙে যায়, লোকে উঁচু জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, হত্যাকাণ্ডের মাত্রা বৃদ্ধি পায় আকস্মিক। আর এসবই ঘটে যখন বইতে থাকে সান্তা অ্যানা।

সাবরিনা ঘরদোর পরিষ্কার শুরু করল। তবে একটু পরেই ক্ষ্যান্ত দিল। এমন অসহ্য গরমে কি কাজ করা যায়? সে এক গ্লাস বরফ চা বানিয়ে টিভি গাইড খুঁজল। টিভি গাইডে লেখা আছে সকালে কী ধরনের পুরানো ছবি দেখানো হয়। তবে আজ এলভিস প্রেসলির পুরানো ছবি দেখাচ্ছে। প্রেসলির ছবি দেখতে কোনো আগ্রহবোধ করল না ও।

একটা চেয়ারে বসে বরফ চায়ে চুমুক দিতে দিতে পত্রিকা পড়ার চেষ্টা করল সাবরিনা। কিন্তু পত্রিকা পড়তেও ভালো লাগছে না।

ফোন বেজে উঠল। লাফ মেরে ফোন ধরতে ছুটল সাবরিনা যেন প্রথম রিং-এ ফোন না ধরলে লাইন কেটে দেবে।

'হ্যালো। সাবরিনা?' গলাটা চেনা চেনা লাগল তবে একটু অন্যরকম শোনাচ্ছে। কেমন ঘ্যাসঘ্যাসে।

'পিটার?'

'হুঁ।'

'আপনার গলাটা যেন কেমন শোনাচ্ছে।'

'অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম। গলায় ব্যথা পেয়েছি।'

'আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনার কথা অনেক ভেবেছি। কোনো খোঁজ-খবর নেই। বললেন রোববার রাতে আসবেন।'

'আপনাদের বাড়ি যাওয়ার পথেই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়। তাই আর যেতে পারিনি।'

'ওহ্, পিটার, এর মধ্যে কত কিছু যে ঘটে গেছে। কোত্থেকে যে শুরু করব বুঝতে পারছি না।'

সে সাবরিনার কথা শুনছে বলে মনে হলো না।

'আপনাকে এক্ষুনি একটা জিনিস দেখাতে চাই।'

'কোথায়? আপনার বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। এখানে চলে আসুন।'

'ফোনে বলা যায় না?'

'ফোনে বলে লাভ হবে না। জিনিসটা সামনাসামনি দেখাতে হবে।'

'ঠিক আছে। রবার্ট ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবে। তখন দু'জনে মিলে আসব।'

'না। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'পিটার, আপনি কি কোনো বিপদের মধ্যে আছেন?'

'হ্যাঁ। ফোনে বলা যাবে না। প্লীজ আসুন, সাবরিনা।'

ইতস্তত করল সাবরিনা। ও বাড়ি থেকে বেরুলে খুব রাগ করবে রবার্ট। কিন্তু পিটারের এ বিপদের সময় কী করে ঘরে বসে থাকে সাবরিনা? মানুষটা তো ওকে অনেক সাহায্য করেছে। সে কী বলে শোনা দরকার। তাছাড়া বাইরে গেলে এ বিশ্রী গরমটার কবল থেকেও খানিকক্ষণের জন্য মুক্তি মিলবে।

'ঠিক আছে, পিটার। আমি আসছি। আপনার জন্য কিছু নিয়ে আসব?'

'না। কিছু আনতে হবে না। শুধু জলদি চলে আসুন।' ঘ্যাসঘেসে অদ্ভুত গলায় বলল সে। তারপর কেটে গেল লাইন।

সাবরিনা কিচেন টেবিলে বসে রবার্টকে একটি চিরকুট লিখল।

'আমি পিটারের বাসায় গেলাম। সে নাকি কী বিপদে পড়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরছি।

ভালোবাসা
সাবরিনা

বেরুবার সময় দরজার কড়ার সঙ্গে চিরকুটটি গুঁজে দিল সাবরিনা।

দরজায় তালা মারার আগে চারপাশ সাবধানে একবার তাকাল ও। প্রচণ্ড গরমে গোটা প্রকৃতি ঝিম মেরে আছে। ব্যান্ডিডো একটা ঝোঁপের আড়ালে বসে হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাঁপাচ্ছে।

মাথার ওপরে নির্দয় নীল-সাদা আকাশ। তীব্র তাপটা যেন একটা জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসল সাবরিনার মাথা এবং কাঁধে। এমন চাঁদি ফাটানো গরমের ফকফকে দুপুরে নিশ্চয় কোনো জিন্দালাশ কবর থেকে বেরিয়ে আসবে না।

সরু রাস্তাটি দিয়ে দ্রুত এগোল সাবরিনা। উঠে বসল ডাটসানে। আগুনের মতো গরম হয়ে আছে গাড়ির আসন। তবে গাড়ি ছাড়ার পরে খোলা জানালা দিয়ে আসা অল্প অল্প বাতাস ওকে সামান্য স্বস্তি দিল।

লরেন বেনিয়ন ধরে পিটারের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো সাবরিনা। রাস্তাঘাট খালি। পাহাড়ের নিচে গাছপালাগুলো ভীষণ গরমে ধুঁকছে, একটি ডালও নড়ছে না।

পিটারের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি পার্ক করল সাবরিনা। নেমে এল। এক মুহূর্ত সাইডওয়াকে দাঁড়িয়ে তাকাল পিটারের বাড়ির দিকে। দরজা বন্ধ, জানালার পর্দা ফেলা। জনশূন্য, বাতাসহীন রাস্তা। কেন জানি গা-টা একটু ছমছম করে উঠল ওর।

এমন সময় খুলে গেল দরজা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পিটার তাকাল সাবরিনার দিকে। এগিয়ে এলো না সে, দাঁড়িয়ে থাকল ছায়ায়। তবে ওকে পিটার বলে চেনা যাচ্ছে। তার গলায় কী যেন জড়ানো। সম্ভবত ব্যান্ডেজ, অনুমান করল সাবরিনা। অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল বলেছে পিটার।

'হাই,' ডাক দিল সাবরিনা।

জবাবে পিটার কিছু বলল না শুধু হাত ইশারায় ওকে এগিয়ে আসতে বলল।

চল্লিশ

জীর্ণ কাঠের সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল সাবরিনা। পিটার অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ির ভেতর। বারান্দায় উঠে এল সাবরিনা, দাঁড়াল এসে দোরগোড়ায়।

'পিটার?'

'আমি এখানে,' ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল সেই অদ্ভুত, ঘ্যাসঘেসে কণ্ঠ।

চৌকাঠ পেরিয়ে স্বল্প আলোকিত লিভিং রুমে ঢুকল সাবরিনা। একটা বাসী, পঁচা গন্ধ ঘুসির মতো আঘাত হানল ওর নাকে। ঘরটার দশাও করুণ। ভ্যাপসা, গুমোট। দেখে মনে হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে ঘরের জানালা খোলা হয় না। এর আগেরবার যখন এসেছিল সাবরিনা, বাতাসে স্ট্রবেরির মিষ্টি একটা গন্ধ ছিল। কিন্তু এখন কেমন বাসী ধূপের গন্ধ। হালকা একটা ধোঁয়াও উড়ছে। বিশ্রী গন্ধটা ওর শ্বাস বন্ধ করে দেয়ার জোগাড়।

'পিটার, কোথায় আপনি?'

সাবরিনা কার্পেট মাড়িয়ে পুতির পর্দার দিকে এগোল। পর্দাটা লিভিংরুম আর ছোট ডাইনিং রুমের মাঝখানে ঝুলছে। পর্দার পরে কিচেন আর ছোট একটি হলওয়ে দেখতে পেল ও। হলওয়ের শেষে বেডরুম এবং বাথরুম। পুতির চটচটে স্পর্শে গা ঘিনঘিন করে উঠল সাবরিনার।

কিছু একটা ভজকট আছে এ বাড়িতে। ভয়ংকর কোনো ভজকট। ধূপের ভারী গন্ধ ছাপিয়ে বিকট একটা গন্ধ সাবরিনার নাকে ধাক্কা মারছে। কেমন ইঁদুর পঁচা গন্ধ। ব্যান্ডিডো একবার ইঁদুর মেরে রেফ্রিজারেটরের পেছনে ফেলে গিয়েছিল। তিনদিন পরে গা গোলানো গন্ধ পেয়ে ইঁদুরটাকে খুঁজে বের করেছিল সাবরিনা।

এখান থেকে একছুটে বেরিয়ে যাওয়ার তীব্র একটা তাগিদ অনুভব করল ও। ঘুরল সদর দরজার দিকে। ওটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। পিটার ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। দরজায় পিঠ রেখে, ওর দিকে মুখ করে।

ঘরের অন্ধকার আর ধূপের ধোঁয়ার মাঝ থেকে ওর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সাবরিনা। পিটারের পরনে কলারখোলা শার্ট, গলায় একটা নেকটাই বাঁধা। তবে খুবই শক্ত করে বাঁধা। আর ওর মুখ। ও, মাগো!

পিটারের চোখে প্রাণের কোনো চিহ্নই নেই, মনি উল্টে শুধু সাদা অংশ দেখা

যাচ্ছে। তার মুখের চামড়া পঁচে গিয়ে বেগুনি রঙ ধারণ করেছে। কাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে কুচকুচে কালো জিভ। গা দিয়ে মাংস পঁচার বীভৎস গন্ধ আসছে।

'তুমি ওদের একজন!' বলল সাবরিনা।

জবাবে কিছু বলল না পিটার শুধু দু'হাত থাবার মতো বাড়িয়ে এগিয়ে এল ওর দিকে।

পাঁই করে ঘুরল সাবরিনা, পুঁতির মোটা পর্দা এক ঝটকা মেরে সরিয়ে বাড়ির পেছনের দিকে দৌড় দিল। ওদিক দিয়ে বেরুনোর নিশ্চয় কোনো রাস্তা আছে।

হলওয়ে দিয়ে ছুটতে ছুটতে একটা বেডরুমে চলে এল ও। বেডরুমে কিংসাইজ একটি বেড। দেখলেই বোঝা যায় অনেকদিন এখানে কেউ ঘুমায় না। খাটটা শয়ন কক্ষের বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে। ঘরে একটি জানালা আছে বটে তবে লোহার গরাদের কারণে ওখান থেকে বেরুনোর রাস্তা বন্ধ। বাইরে, ডাইনিং রুমে পুঁতির পর্দা ছিড়ে পুঁতিগুলো মেঝেয় পড়ার শব্দ হলো। পর্দা ছিঁড়ে পিটার ডাইনিং রুমে ঢুকে পড়েছে।

এক লাফে বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল সাবরিনা। হলওয়েতে একটুর জন্য পিটারের সঙ্গে ধাক্কা লাগল না। পিটার ওকে দেখেই হাত বাড়িয়ে দিল। তার শীতল, খড়খড়ে হাতের স্পর্শ পেল সাবরিনা নগ্ন বাহুতে এক সেকেন্ডের জন্য। কিন্তু পিটার ওকে জাপ্টে ধরার আগেই ছুটে পালাল সাবরিনা।

পরের দরজাটি বাথরুমের। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ওখানে সেঁধিয়ে গেল সাবরিনা, চোখের পলকে দরজা বন্ধ করে টেনে দিল ছিটকিনি। পিটার দরজার গায়ে আছড়ে পড়তে দুম করে শব্দ হলো।

দেয়ালের সঙ্গে কুঁকড়ে গেল সাবরিনা, ঘনঘন শ্বাস ফেলছে, ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বন্ধ দরজার দিকে। বাইরে থেকে আবার আঘাত হানা হলো দরজায়। থরথর করে কেঁপে উঠল দরজা। সেই সঙ্গে কেঁপে উঠল সাবরিনা। উন্মাদের মতো চারপাশে চোখ বুলালো এখান থেকে পালাবার পথ খুঁজতে।

দুম!

সাবরিনা চট করে শাওয়ার কার্টেনের পাশে চলে এল। চোখ বরাবর উচ্চতায় একটি জানালা দেখতে পেল ও। কিন্তু জানালাটি চওড়ায় মাত্র আট ইঞ্চি। ওই ফাঁক দিয়ে বড়জোর একটি বেড়াল গলে যেতে পারবে।

টান মেরে ওয়াল কেবিনেট খুলে ফেলল সাবরিনা। আত্মরক্ষার জন্য কিছু একটা খুঁজছে। কোনো অস্ত্র। যে কোনো কিছু। ও কেবিনেটে পেল ইলেকট্রিক শেভার,

ট্যালক, কোলন, অ্যাসপিরিন, টুথপেস্ট, হেয়ার স্প্রে। এগুলো কোনোটাই কাজে আসবে না। অবশ্য জিন্দালাশদের ঠেকানোর মতো অস্ত্রই বা কী আছে? সাবরিনার মনে পড়ল ওর বাড়িতে রবার্ট জিন্দালাশটাকে পোকার দিয়ে বাড়ি মেরে মেরে ওটার খুলি ফাটিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলেছিল। তারপরও ওটা সাবরিনাকে ধরতে এগিয়ে আসছিল।

দুম!

দরজার কাঠে লম্বালম্বি একটা ফাটল তৈরি হলো।

হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সাবরিনা। সিঙ্কের নিচে কেবিনেটের দরজা খুলল। টয়লেট পেপার, ক্লিনজার, ব্রাশ, স্পঞ্জ, এক বোতল বড়ি, রাবিং অ্যালকোহল।

দুম! চওড়া হলো ফাটল। কাঠের ছিলকা ছিটকে পড়ল বাথরুমের মেঝেয়।

অ্যালকোহলের বোতলটা তুলে নিল সাবরিনা। লেবেলের গায়ে কালো অক্ষরে বড়বড় করে লেখা FLAMMABLE আগুন কি জিন্দালাশদের কোনো ক্ষতি করতে পারে?

ক্ষতি করতে পারুক বা না পারুক ওটাকে ঠেকানোর এ মুহূর্তে এ ছাড়া আর কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছে না সাবরিনা।

দুম!

দরজার বড় একটা কাঠের টুকরো ভেঙে পড়ল ভেতরের দিকে। জায়গায় বরফের মতো জমে গেল সাবরিনা। দেখছে দরজাটা আবার দারুন জোরে কেঁপে উঠল এবং আরও কাঠ ভেঙে গেল, গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এল একটা হাত। হাতটার মাংস জায়গায় জায়গায় খসে পড়ে হাড় এবং শিরা বেরিয়ে পড়েছে। বীভৎস!

দুম!

গর্তের ফাঁকটা আরও বড় হলো। সেখানে উঁকি দিল পিটার ল্যানডাউর বিকট মুখ। তাকাল সাবরিনার দিকে। একটা ক্ষত-বিক্ষত হাত বাড়িয়ে দিল সে। ভাঙা দরজার গর্ত দিয়ে ছিটকিনি হাতড়াচ্ছে।

নিজেকে শান্ত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে সাবরিনা অ্যালকোহলের বোতলের ছিপি খুলল। সিঙ্কের পাশের হোল্ডার থেকে একটা গ্লাস নিয়ে তরল পদার্থটির পুরোটাই ওটার মধ্যে ঢেলে দিল। ঝাঁজাল গন্ধে চোখে পানি এসে গেল ওর।

পিটার এতক্ষণে ছিটকিনি খুঁজে পেয়েছে কিন্তু দরজায় ঘুসি মেরে মেরে আহত হাতটা দিয়ে খুলতে পারছে না। মাংস ছেঁড়া হাতটা ভেতরে টেনে নিয়ে গেল সে, গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এল অক্ষত অপর হাতটি।

সাবরিনা বোতল আর গ্লাস ভর্তি অ্যালকোহল মেঝেয় নামিয়ে .রেখে নিজের

পকেটে দেশলাই খুঁজতে লাগল। *ঈশ্বর, দেশলাই যেন পাওয়া যায়।*

পিটার যখন দরজার ছিটকিনি খুলছে ঠিক তখন সাবরিনাও দেশলাইয়ের বাক্সটা পেয়ে গেল।

দরজার ডোরনব মোচড় খেল। ভাঙা দরজা ভেতরের দিকে ধাক্কা খেল। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময় ভয়ংকর মূর্তিটাকে দোরগোড়ায় দেখতে পেল সাবরিনা। সে গ্লাস ভর্তি অ্যালকোহল তুলে নিয়ে বেগুনি মুখটার ওপর ছুড়ে মারল। ওটার মুখ এবং জামার সামনের অংশ একই সঙ্গে ভিজে গেল। হাত থেকে গ্লাসটা ফেলে দিল সাবরিনা। টাইলস বসানো মেঝেতে পড়ে চৌচির হয়ে গেল গ্লাস। দ্রুত হাতে একটা কাঠি জ্বালাল সাবরিনা, জ্বলন্ত কাঠিটা ছুড়ে মারল পিটারের দিকে, ওটা পিটারের কাঁধে বাড়ি খেয়ে নিভে গেল।

গলা দিয়ে চিৎকার বেরিয়ে এল সাবরিনার। পিটার এখন দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। একটা হাত অক্ষত কিন্তু অপর হাতটিতে মাংসের বালাই নেই বললেই চলে, বেরিয়ে পড়েছে হাড় আর শিরা। অ্যালকোহলের ঝাঁঝাল গন্ধ ছাপিয়ে পঁচা লাশের বিকট গন্ধ সাবরিনার নাকে ধাক্কা মারছে। আরেকটা কাঠি জ্বালাল ও। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে কাঠিটা চেপে ধরে হাত বাড়াল পিটারের অ্যালকোহল ভেজা শার্টের দিকে।

এক সেকেন্ড, দুই সেকেন্ড জ্বলন্ত কাঠিটি শার্টের ওপর ঠেকিয়ে রাখল সাবরিনা। দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। শার্ট আর ফোলা মাথাটাকে মুহূর্তে গ্রাস করল নীলচে অগ্নিশিখা। পিটার নামের ভয়ংকর জিন্দালাশটা টলতে টলতে পিছু হটল, বুকের ওপর থাবড়া মেরে নেভাতে চেষ্টা করছে আগুন।

পিটারকে পাশ কাটিয়ে হলওয়ের দিকে ছুটল সাবরিনা। তার পেছনে যন্ত্রণাকাতর অমানুষিক আর্তনাদ করতে করতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল পিটার। ধাওয়া করল সাবরিনাকে।

ফ্রন্ট ডোর খুলে প্রায় উড়ে এসে সিঁড়িতে পা রাখল সাবরিনা, একেকবার দু'তিনটা ধাপ টপকাচ্ছে। তার পেছনে ভয়ংকর চিৎকার ভেসেই আসছে। রাস্তায় নেমে পেছন দিকে তাকাল সাবরিনা। জ্বলন্ত মশালে পরিণত হওয়া মূর্তিটিকে দেখল বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে, হাত দুটো এখনও সামনের দিকে বাড়ানো। যেন থাবা মেরে ধরবে সাবরিনাকে।

লরেল কেনিয়ন থেকে ছুটে আসা একটি গাড়ি ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। সে পলায়নপর মেয়েটি আর জ্বলন্ত লোকটাকে দেখতে পেয়েছে। হৈ হল্লা শুনে এক লোক বেরিয়ে এল তার বাড়ি থেকে। তারপর একজন। তারপর আরও একজন। তারা সবাই মিলে ছুটে এল রাস্তায়, পিটারের বাড়ির সিঁড়ির নিচে ভিড় জমাল।

সিঁড়ির মাথায়, ওই জিনিসটা যাকে এখন কোনোভাবেই পিটার লানডাউ বলে চেনার উপায় নেই, ওটার পঁচা মাংস দাউদাউ জ্বলছে, হাড় ফেটে যাওয়ার টাশ টাশ শব্দ হচ্ছে, হোঁচট খেল সে, তারপর আগুনের একটা কুন্ডের রূপ নিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে সিঁড়ি থেকে ছিটকে পড়ে গেল রাস্তায়। জ্বলন্ত দেহটার দিকে এগিয়ে যেতে চাইল অনেকেই কিন্তু তীব্র উত্তাপে বাধা পেল।

'একটা কম্বল নিয়ে এসো কেউ!' চেঁচাল ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন।

'কোনো লাভ হবে না,' বলল আরেকজন,' একে কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

ডাটসানের গায়ে হেলান দিল সাবরিনা। আগুনের শিখা উল্লাসে লাফাচ্ছে। পিটারের মাংস পুড়ে যাচ্ছে হিসহিস শব্দে, গলে যাচ্ছে চর্বি। নাড়িভুড়ি থেকে ধোঁয়া উঠছে। সাবরিনা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল মুখ।

আগুনের শিখার তান্ডব কমে এলে এক প্রতিবেশী গার্ডেন হোস নিয়ে এসে পোড়া শরীরটার ওপর পানি ছিটাল। মুখের বেশিরভাগ পুড়ে গেছে শুধু অবশিষ্ট অংশে দেখা যাচ্ছে মাংস ফাঁক হওয়া চোয়াল আর দাঁত। বিকট একটা হাসির ভঙ্গি করে চেয়ে আছে আধপোড়া বিকৃত মুখটা।

বুকে হাত বেঁধে পোড়া লাশটার দিকে এগোল সাবরিনা। পরে সে পিটার লানডাউর জন্য শোক করবে, স্মরণ করবে লোকটা কত ভালো ছিল। কিন্তু এ মুহূর্তে সে শুধু একটা কথাই ভাবছে, *মাটিতে পড়ে আছে চার নম্বর জিন্দালাশ। ওরা রইল না আর কেউ। আমি জিতে গেলাম।*

একচল্লিশ

উপকূল থেকে আসা বাতাসের সঙ্গে কুয়াশা আর উঁচু উঁচু মেঘের সারি রোববার সকালে তীব্র দহন কমিয়ে এনে সান্তা অ্যানাকে তাড়িয়ে দিয়েছে মরুভূমিতে। সন্ধ্যাবেলায় সাবরিনা আর রবার্ট কাউচে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে টেলিভিশনে উডি অ্যালেনের ছবি দেখছিল। ছবিটি হাসির হলেও কেউ হাসছিল না কারণ ওদের কারও মনোযোগই টিভির প্রতি ছিল না।

'ইটস ওভার,' যেন নিজেকেই বলছিল সাবরিনা। 'সত্যি এটার সমাপ্তি ঘটছে। তবু কেন আমি সুখী নই?'

'তোমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে তাই,' বলল রবার্ট।

'হয়তো বা তাই।'

ওরা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আবার কথা বলল সাবরিনা।

'মাত্র এগারো দিনে এত কিছু ঘটে গেছে কল্পনা করতে পারো? এগারো দিন আগে আমি স্কাই হাই অ্যাপার্টমেন্টের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে গিয়েছিলাম এবং তারপর এই ভৌতিক দুঃস্বপ্নের শুরু হয়। আমার মনে হচ্ছিল জিন্দালাশগুলো অনন্ত কাল ধরে আমার পিছু নিয়েছে।'

'সুস্থির হতে কয়েকদিন সময় লাগবে,' বলল রবার্ট। 'একদিনেই তো আর সবকিছু ভুলে যেতে পারবে না। বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে মানিয়ে নিতে আরও কিছুদিন লেগে যাবে তোমার।'

'হ্যাঁ, বাস্তব পৃথিবী। যে পৃথিবীতে মৃতেরা মৃতই থাকে শুধু জীবন্ত মানুষেরা হেঁটে চলে বেড়ায়।'

একটু বিরতি দিয়ে রবার্ট জিজ্ঞেস করল, 'পিটারের মৃত্যু নিয়ে পুলিশ কোনো ঝামেলা বাঁধায়নি তো?'

'না। সার্জেন্ট অলিভার এসে সবকিছু সামলেছেন। আমাকে চিন্তা করতে মানা করেছেন। বলেছেন পিটারের মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হিসেবে পুলিশের রিপোর্টে লেখা হবে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে মনে হলো তিনি মুখে স্বীকার না করলেও এই জিন্দালাশদের ব্যাপারটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।'

ডোরবেল বেজে উঠল, দু'জনেই লাফিয়ে উঠল। তারপর একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসল।

'কে?' হাঁক ছাড়ল সাবরিনা।

'ডা. অশোক চৌধুরী।'

সাবরিনা উঠে গিয়ে দরজা খুলল। ভেতরে ঢুকলেন ডা. চৌধুরী। তার সঙ্গে স্বর্ণকেশী, সুন্দরী এক লম্বা মহিলা। মহিলার সোনালি চুলে সবে ধূসর পাক ধরতে শুরু করেছে। তার নীল চোখ জোড়া হাসিখুশি।

'সাবরিনা, রবার্ট,' বললেন ডাক্তার, 'তোমাদের সঙ্গে ক্যারোলিনের পরিচয় করিয়ে দিই, আমার স্ত্রী। হানি, এরা সেই জন যাদের কথা তোমাকে আমি বলেছি।'

ওদের দু'জনের সঙ্গে হাত মেলালেন ক্যারোলিন। 'তোমাদের সঙ্গে পরিচত হয়ে খুব খুশি হলাম। অশোক বলল তোমাদের ওপর দিয়ে নাকি অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে।'

'জ্বী,' বলল সাবরিনা। 'তবে আমরা ঝড়ঝাপটা সামলে উঠেছি।'

'শুনে খুব খুশি হলাম,' ক্যারোলিন তাঁর স্বামীর দিকে তাকালেন। 'আমাদের খারাপ সময়টারও সমাপ্তি ঘটেছে।'

রবার্ট ওদের দু'জনকে পালাক্রমে দেখল। 'এর মানে কি এই যে আমরা আমাদের একজন প্রতিবেশীকে হারাতে চলেছি?'

'শুধু আমার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদার অপেক্ষা,' বললেন ডা. অশোক। 'গত এক সপ্তাহের ঘটনাগুলো আমাকে আমার জীবন নিয়ে অনেক ভাবিয়েছে। আমাদের মতের অমিল রয়েছে। আমার এবং ক্যারোলিনের। এরকমটা কারই বা না থাকে? তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি একা একা থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আমিও একা থাকতে পারব না,' বললেন ক্যারোলিন। 'অশোক যখন আমাদের ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটার প্রস্তাব দিল, আমি সোৎসাহে লাফিয়ে উঠলাম। ও বলল লস এঞ্জেলেসের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় গাড়ি চালিয়ে অফিস করার চেয়ে বরং...'

স্ত্রীকে কথা শেষ করতে দিলেন না চৌধুরী। 'বরং ভ্যালিতে গিয়ে আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের সঙ্গে থাকা অনেক ভালো। ক্যারোলিন ওর ডিভোর্সের মামলা তুলে নিচ্ছে।'

'খুবই চমৎকার খবর,' বলল সাবরিনা। 'আমার ধারণা আপনারা এখন থেকে ঠিকই মানিয়ে চলতে পারবেন। আপনাদেরকে দেখলে মনে হয় আপনারা যেন একে অন্যের জন্যেই জন্মেছেন।'

'হ্যাঁ, আমরা তাই,' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন ডাক্তার।

'এবং খুব ভালোও বটে,' যোগ করলেন ক্যারোলিন।

'আমিও অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে এ অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দেব,' বলল রবার্ট।

'তাই নাকি? তার মানে তুমি আর সাবরিনা...?'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'আমরা শীঘ্রি বিয়ের পিড়িতে বসব,' বলল সাবরিনা।

'ওয়ার্ল্ড সিরিজের পরপরই,' হাসল রবার্ট।

ডা. চৌধুরী রবার্টের হাতে চাপ দিলেন। 'খুৰই খুশির খবর। অভিনন্দন। তুমি বউ হিসেবে একটি অসাধারণ মেয়েকে পাচ্ছ।'

'জানি আমি,' বলল রবার্ট।

'আর সাবরিনা, তোমার জন্য আমার অন্তরের সমস্ত শুভ কামনা রইল,' তিনি সাবরিনার গন্ডদেশে চুম্বন করলেন। সকলে হো হো করে হাসল। সবারই খুব ভালো লাগছে।

সাবরিনা এক বোতল বার্গান্ডি নিয়ে এল। মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সবাই একে অন্যের সৌভাগ্য কামনা করল। একটু পরে ডা. চৌধুরী তাঁর স্ত্রী বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ওদেরকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে টাটা দিল সাবরিনা এবং রবার্ট।

'ওদেরকে লাগছে নব দম্পতির মতো,' রবার্টকে বলল সাবরিনা।

'দ্যাখো দু'জনে কী সুন্দর হাতে হাত ধরে হেঁটে চলেছেন।'

'ডাক্তারকে আর কোনোদিন এত সুখী মনে হয়নি আমার,' মন্তব্য করল রবার্ট।

'কুড়ি বছর পরে আমাদেরকে দেখতে কেমন লাগবে গো?'

'কে জানে? আর জানতেই বা কে চায়?' হাই তুলল রবার্ট।

'আমিও এখন বিদায় হই। কাল থেকে আবার অফিস শুরু করতে হবে।'

'আবার আমাদের পুরানো সুন্দর পৃথিবীটার শুরু হবে,' বলল সাবরিনা।

ও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিদায় চুম্বন দিল রবার্টকে, দু'জনে হাত ধরাধরি করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ওখানে।

বিয়াল্লিশ

গাড়ি পার্ক করে খুশি মনে শিস দিতে দিতে ওয়েস্ট লস এঞ্জেলেসে রিসিভিং হসপিটালের ইমার্জেন্সি প্রবেশ পথের দিকে পা বাড়ালেন ডা. অশোক চৌধুরী। নাচের তালে কয়েকটি কদম ফেলার পরে লক্ষ করলেন দু'জন ছাত্র নার্স তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। ওদের দিকে হাত নাড়লেন ডাক্তার। প্রত্যুত্তরে ওরাও হাত নাড়ল।

হাসপাতালে আজ সোমবার তিনি এসেছেন কারণ কাল থেকে ছুটি নেবেন। ক্যারোলিনাকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাবেন। গতরাতটা দু'জনে একসঙ্গেই কাটিয়েছেন। প্রেমও করেছেন এবং আগের দিনগুলোর চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পেয়েছেন। তিনি ভাবলেন সকল দম্পতিরই উচিত আসলে তাদের দাম্পত্য জীবনের মাঝে একটা ব্রেক নেয়া। না, মাথা নাড়লেন তিনি, বেশিরভাগ দম্পতিরই হয়তো সংসার আবার জোড়া লাগত না। তবে তার আর ক্যারোলিনের ভাঙা সংসার জোড়া লেগেছে সেটাই আসল কথা।

হাসপাতালে প্রবেশ করলেন ডাক্তার, কয়েকজনের অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে মাথা ঝাঁকালেন, গায়ের জ্যাকেটটা খুলে নিয়ে সাদা কোর্টটি পরে নিলেন। ইমার্জেন্সিতে আজ সকালে তেমন কোনো জরুরি রোগী নেই।

ডা. চৌধুরী হলঘরে এলেন কফি পান করতে। ভাবছেন ক্যারোলিনের কথা। তিনি গত দুইদিনে বেশ কয়েকবার তার স্ত্রীকে ফোন করেছেন, অনেক কথা বলেছেন। তাদের দাম্পত্য জীবনের গত পাঁচ বছরেও এত কথা বলেননি দু'জনে। তিনি বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করেছেন যেসব বিষয় নিয়ে কখনও ভাবেননি বা গ্রাহ্যও করেননি সেসব বিষয়েও চমৎকার সব বুদ্ধিদীপ্ত মতামত দিয়েছেন ক্যারোলিন। তাঁর মনে হচ্ছিল নতুন এক নারীর সঙ্গে তিনি কথা বলছেন।

'এই যে বুড়ো খোকা, একা একা দাঁড়িয়ে আপন মনে হাসছ যে! মনে খুব সুখ বুঝি?'

কারমিট ব্রিডলাভের গলা শুনে চমক ভাঙল ডা. চৌধুরীর। তিনি বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন, বুঝতে পারলেন কফি হাতে দাঁড়িয়ে তিনি স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন আর আপনমনে হাসছিলেন।

'হাই, কারমিট,' প্যাথলজিস্টকে বললেন তিনি, 'তোমার বরফের বাক্সের খবর

কী?'

'গত রাতে এক নতুন মাল এসেছে। তুমি বলেছিলে নতুন কেউ এলে তোমাকে জানাতে। আমি তোমার অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করেছিলাম। কিন্তু কেউ ধরল না।'

ডা. চৌধুরী ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে গেলেন। 'নতুন মালটা কে?'

'একটা মেয়ের লাশ। ককেশিয়ান। বয়স আনুমানিক সতেরো, গতকাল বিকেল পাঁচটার দিকে নিও কারিল্লো বীচে মেয়েটার লাশ খুঁজে পাওয়া যায়। ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে এসেছিল। আমার ধারণা এ মেয়ে তোমার সেই পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়া মক্কেল।'

'ধন্যবাদ। তুমি কি মেয়েটির অটোপসি করেছ?'

'না। লাশের অবস্থা খুবই খারাপ। পাথরে বাড়ি লেগে শরীরের হাড়গোড় বোধহয় একটাও আস্ত নেই। আর সামুদ্রিক কাঁকড়া মেয়েটার গায়ের প্রায় সমস্ত মাংস খেয়ে সাবাড় করেছে।'

'তাহলে কি তুমি নিশ্চিত করে বলতে পারবে না মেয়েটা কখন মারা গেছে?'

'আমার অফিসে চলো দেখি বলতে পারি কিনা? ওখানে মেয়েটির কয়েকটি বন্ধুবান্ধব এসেছে লাশ সনাক্ত করতে।'

'তুমি কি পজিটিভ আইডি পেয়েছ?'

'হ্যাঁ।' মুখের একপাশ থেকে অন্যপাশে টুথপিকটা ঠেলে সরালেন ব্রিডলাভ। 'মেয়েটির নাম কিলা স্টাইটস। তার বাবা মা সান্তা বারবারায় থাকে। তবে এখন তারা বিশ্বভ্রমণে ব্যস্ত বলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। মেয়েটি অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরেই তার বাবা মা'র সঙ্গে থাকছিল না।'

হাসপাতালের হলওয়ে ধরে প্যাথলজিস্টের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অশোক চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কী, কারমিট, তুমি কী যেন আমার কাছ থেকে লুকিয়ে যাচ্ছ।'

'মেয়েটির বন্ধুদের কাছ থেকেই আসল ঘটনা জেনে নিও।'

নিজের অফিসের দরজা খুললেন ব্রিডলাভ, চৌধুরীকে ভেতরে ঢুকতে ইঙ্গিত করলেন। কালো চামড়ার একটি কাউচে দুই তরুণ আর মোটাসোটা একটি মেয়ে বসে আছে। মেয়েটির চিবুকভর্তি ব্রন। তিনজনেরই পরনে নোংরা, সস্তা পোশাক। ওদের গা থেকে গামের গন্ধ আসছে। এদেরকে দেখে ষাট দশকের হিপ্পিদের কথা মনে পড়ে গেল ডাক্তারের।'

তিনজনের মুখোমুখি বসেছে পরিষ্কার বাদামী উর্দি পরা এক যুবক। তার ইউনিফর্মে লস এঞ্জেলেস কাউন্টি শেরিফের অফিসের ব্যাজ লাগানো। দুই ডাক্তারকে ঢুকতে দেখে সে দরজায় মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

'তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, ডেপুটি,' বললেন ব্রিডলাভ। 'ইনি ডা. চৌধুরী, আমার একজন কলিগ।

ডেপুটি মাথা ঝাঁকিয়ে মনোযোগ ফেরাল কাউচে বসা তিন তরুণের দিকে।

'তোমরা ওই পোড়া কনডোমিনিয়াম মোট ক'জন থাকো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জানি না,' জবাব দিল শুকনো চেহারার, চাঁদের মতো গোল মুখের এক তরুণ। 'ছয়, আট, মাঝে মাঝে কুড়িজন। লোকে ওখানে আসে আর যায়, আপনারা তো জানেনেই।'

'কিলা স্টাইলস ওখানে ক'দিন ধরে ছিল?'

'এক সপ্তাহ বা একমাসও হতে পারে। সে অন্যদের মতোই এসে আবার চলে গিয়েছিল।'

একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল ডেপুটি। 'ঠিক আছে। বুধবার, আঠেরোই জুন রাতে ঠিক কী ঘটেছিল বলো?'

'আমাদেরকে তো এর মধ্যে জড়াবেন না?' জিজ্ঞেস করল মোটা মেয়েটি।

'ঠিক কী ঘটেছিল বলো, প্লীজ।'

এবারে দ্বিতীয় ছেলেটি কথা বলে উঠল। সে রোগা পাতলা, চোখা একটা নাক নেমে এসেছে ওপরের ঠোঁটের ঠিক উপরে।

'চিন্তা কোরোনা, আমরা তো আর কোনো অপরাধ করিনি যে পুলিশে ভয় পেতে হবে।'

'তোমাদেরকে এখানে গ্রেপ্তার করে আনা হয়নি,' ধৈর্য ধরে বলল ডেপুটি। 'আমি শুধু মেয়েটির মৃত্যু কীভাবে হলো তার বিস্তারিত বর্ণনা জানতে চাইছি।'

'ঠিক আছে,' গোল, চাঁদপানা মুখ ছেলেটি বলল, 'দাঁড়ান, একটু মনে করি।' ছাদের দিকে তাকিয়ে সে খানিক চিন্তা করল। তারপর চোখ নামিয়ে ধরল, 'আমরা বুধবার রাতে অ্যাঞ্জেল ডাস্ট সেবন করছিলাম।'

ব্রিডলাভ এবং অশোক পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলেন। অ্যাঞ্জেল ডাস্ট হলো এক ধরনের মাদক। দামে সস্তা, যে কোনো হাইস্কুলে এ জিনিস সহজলভ্য। তবে মাদকটি খুবই ভয়ানক।

'কিলা বোধহয় আগে কখনও অ্যাঞ্জেল ডাস্ট ব্যবহার করেনি,' বলে চলল তরুণ।' যদিও ভাব দেখাচ্ছিল এসব খেয়ে সে খুব অভ্যস্ত। তবে আমরা কী করে বুঝব জীবনে ওটাই তার প্রথম মাদক সেবন?

'ও এর আগে শুধু গাঁজা খেয়েছিল,' বলল ব্রনসুন্দরী। 'মাদক সে জীবনেও স্পর্শ করেনি।'

'তোমরা সবাই অ্যাঞ্জেল ডাস্ট খাওয়ার পরে কী হলো?' প্রশ্ন করল ডেপুটি। সে একটা নোটবুকে নোট নিচ্ছে।

'মাদকটা নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভট আচরণ শুরু করে দেয় কিলা। চিৎকার চেঁচামেচি করছিল সে, দৌড়াদৌড়ি করছিল পাগলের মতো। তারপর সে কোস্ট হাইওয়ের দিকে ছুটে যায়।'

'তোমরা ওকে থামানোর চেষ্টা করোনি?'

'মাথা খারাপ? অঞ্জেল ডাস্ট খাওয়ার পরে যারা পাগলামি শুরু করে তাদেরকে

বাধা দিতে গিয়েছেন কখনও? তখন ওদের শরীরে অসুরিক শক্তি ভর করে। সত্যি।'

ছেলেটার কথা শুনছেন ডা. চৌধুরী, সেসঙ্গে তাঁর ভেতরে একটা অজানা ভয় পাক খেয়ে উঠছে।

'তারপর কী হলো?' জানতে চাইল ডেপুটি।

'কিলা পাহাড়ের ওপরের ওই রেস্টুরেন্টের দিকে ছুটতে ছুটতে যায়। আমরা দু'তিনজন ওর পিছু নিয়েছিলাম। ভয় হচ্ছিল নেশার ঘোরে ও আবার কেলেঙ্কারি কিছু করে না বসে যাতে পরে পুলিশি ঝামেলা হয়।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। বলে যাও।'

'কিলার বোধহয় মাথাটাই গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। পাহাড় চুড়োয় সাগরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মেয়ে। কিলা বিকট চিৎকার করে বুনো জন্তুর মতো তার দিকে ছুটে যায়। কিলাকে তখন খুব ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। ওই মেয়েটি ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে থাকে। কিলা তাকে ধাওয়া করে। হৈহল্লা শুনে ওই সময় রেস্টুরেন্টের ভেতর থেকে লোকজন বেরিয়ে আসছিল। আমরা শেষ দৃশ্যটা দেখতে পাই কিলা আর সেই মেয়েটি চুড়োর কিনারে ধস্তাধস্তি করছে। চাঁদের আলোয় পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল ওদেরকে। তবে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভরসা পাইনি। তাই আমরা ফিরে আসি।'

'এসবই বুধবার রাতে ঘটেছে?'

'জ্বী।'

'আজ সোমবার। তোমরা আরও আগে এ ঘটনা জানাওনি কেন?

'পুলিশের ভয়ে জানাইনি রে ভাই, তাছাড়া আমরা তো নিশ্চিত ছিলাম না যে মারা গেছে কিলা।'

এবারে কথা বললেন ডা. অশোক। 'তোমরা গত বুধবার যখন মেয়েটার পিছু পিছু রেস্টুরেন্টের দিকে যাচ্ছিলে তখন মেয়েটা বেঁচে ছিল?

ঘরের সবাই ডাক্তারের দিকে ফিরল।

'আরে, জবাব দাও। মেয়েটা বেঁচে ছিল কিনা?' ধমকে উঠলেন অশোক চৌধুরী।

'অবশ্যই বেঁচে ছিল। ওর মাথাটা আউলা ঝাউলা হয়ে গিয়েছিল বটে তবে ও মারা যায়নি।'

আর কিছু শোনার দরকার ছিল না ডা. চৌধুরীর। তিনি ধাক্কা মেরে দরজা খুলে হনহন করে এগিয়ে চললেন নার্সদের রুমে। তাঁর মাথায় বারবার এ চিন্তাটা বাড়ি খাচ্ছে গত বুধবার বেঁচে ছিল কিলা স্টাইলস। বেঁচে ছিল। তার মানে সে জিন্দালাশদের কেউ ছিল না। এর অর্থ তিন জিন্দালাশ মারা গেছে, চারজন নয়। আর আজ মিডসামার নাইট, ইভ অব সেন্ট জনের দিন।

এক নার্স কাউকে ফোন করতে যাচ্ছিল, তার হাত থেকে রিসিভারটি টান মেরে ছিনিয়ে নিলেন ডা. চৌধুরী। তারপর সাবরিনার বাড়ির নাম্বারে ডায়াল করলেন। অনেকবার রিং হলো। কিন্তু ধরল না কেউ। হতাশ হয়ে ঠকাশ করে ক্রেডলে

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি।

'তোমার কাছে লস এঞ্জেলেস ফোন বুক আছে?' নার্সকে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

'জ্বী, আছে। কিন্তু কেন, ডক্টর?'

'ফোন বুকটা আমাকে দাও।'

চোখ পিটপিট করতে বিস্মিত নার্স কাউন্টার থেকে ইয়া মোটা লস এঞ্জেলেস ফোন বুকটা এনে দিল। ডা. চৌধুরী পৃষ্ঠা উল্টে সাবরিনা যে ডিপার্টমেন্ট স্টোরে কাজ করে সেটার ফোন নাম্বার খুঁজে বের করলেন। ডায়াল করে অধৈর্য ভঙ্গিতে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সুইচবোর্ড থেকে কর্পোরেট অফিসে ডাক্তারের লাইনটা স্থানান্তর করা হলো, অবশেষে বিজ্ঞাপনী বিভাগে। চৌধুরী ম্যানেজারকে চাইলেন।

'জন ওয়ালটন বলছি।'

'মি. ওয়ালটন, আমি ডা. অশোক চৌধুরী, সাবরিনা স্টুয়ার্টের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। খুব জরুরি।'

'কিন্তু সাবরিনা তো এখনও অফিসে আসেনি, ডক্টর। ফোন করে বলেছে আজ ওর একটু দেরি হবে।'

'সে আসা মাত্র দয়া করে বলবেন আমাকে যেন অবশ্যই ফোন করে। আমার ফোন নাম্বার হলো–' তিনি নাম্বারটা বলে গেলেন। 'বলবেন ভীষণ জরুরি।'

'নিশ্চয়ই বলব, ডক্টর।'

ফোন রেখে দিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন অশোক চৌধুরী। তার বুক ধড়াস ধড়াস করছে। সাবরিনা জানে সে শেষ জিন্দালাশকেও মেরে ফেলেছে। ফলে সে আজ থাকবে রিল্যাক্স মুডে এবং সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়। ওর কল্পনাতেও নেই সামনে কী ভয়ংকর বিপদ অপেক্ষা করছে।

তিনি আবার ফোন তুলে নিলেন। এবারে রবার্ট ডানের অফিসের নাম্বার ঘোরালেন। কিন্তু ফোন বেজেই চলল, ধরছে না কেউ। ওদিকে কুলকুল করে ঘামছেন ডা. অশোক চৌধুরী।

তেতাল্লিশ

বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে শঙ্কামুক্ত খুশি মনে হাঁটছে সাবরিনা স্টুয়ার্ট। অফিসে ফোন করে বলে দিয়েছে আজ ওর যেতে একটু দেরি হবে। ম্যানেজার জন ওয়ালটন বলেছে কোনো সমস্যা নেই। সাবরিনা বিছানায় শুয়ে এতক্ষণ আলস্য করছিল। এখন অফিসে যাওয়ার স্ফূর্তি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাচ্ছে ও।

চাবি দিয়ে ডাটসানের দরজা খুলল সাবরিনা। থমকে গেল। ফোন বাজছে না? এ সময়ে কে ফোন করতে পারে?

সে লন ধরে ছুটে গেল, চাবির কেস থেকে হাতড়ে বের করে নিল দরজার চাবি। ঘরের ভেতরে ঝনঝন শব্দে বেজেই চলেছে ফোন। সাবরিনা দরজা খুলল, সজোরে ঢুকল ঘরে। তুলল রিসিভার।

'হ্যালো?'

শুধু ডায়াল টোন শোনা গেল।

ধ্যাত্তেরি। ওর বেলা সবসময় এরকম হয় কেন? ফোন ধরার আগেই কেটে যায় লাইন। রিসিভার রেখে বেরিয়ে এল সাবরিনা। বসল গাড়িতে। তবে ফোন কলের কথাটা মন থেকে দূর করতে পারছে না। এ যেন শরীরের সেই চুলকানির মতো। এমন অসম্ভব জায়গায় চুলকাচ্ছে যেখানে হাত যায়না।

সান্তা মোনিকা বুলেভার্ড ধরে সেঞ্চুরি সিটির দিকে ছুটল সাবরিনা, তারপর এভিন্যু অব দ্য স্টারস-এ মোড় নিল। হঠাৎ সামনের ট্রাফিক জ্যামে পড়ে গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো ও।

কাজে ফেরার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে সাবরিনা। এক সপ্তাহ হয়ে গেল অফিস যায় না সে। কত কাজ যে জমে আছে! আর এখন কিনা হতচ্ছড়া যানজটে আটকা পড়তে হলো।

সাবরিনার পাশের ভলভো গাড়ি থেকে ক্রুদ্ধ চেহারার এক লোক নেমে এল। গলা বাড়িয়ে সামনের রাস্তাটা দেখল।

গাড়ির আসনের সামনে ঝুঁকে জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল সাবরিনা। 'ঘটনা কী?'

'সম্ভবত: অ্যাক্সিডেন্ট। পুলিশের গাড়ি আর অ্যাম্বুলেন্স দেখতে পাচ্ছি।' লোকটা

নিজের গাড়িতে গিয়ে বসল। স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে কটমট করে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। পারলে জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে দেবে যানজট।

সাবরিনা নিজের হাতের দিকে তাকাল। সে শক্ত করে ধরে আছে স্টিয়ারিং হুইল। হুইলের ওপর মুঠো আলগা করল ও, হাতজোড়া রাখল কোলে। গভীর একটা দম নিল সাবরিনা। মহানগরীতে বাস করতে হলে এসব কিছুই মেনে নিতে হবে। যানজট, ছিনতাই, মাদকসেবী, ভূমিকম্প। যেহেতু এসব সমস্যার সমাধান তোমার হাতে নেই কাজেই তোমার চুপচাপ থাকাই শ্রেয়।

এক পুলিশ অফিসার রাস্তার মাঝখানে এসে উদয় হলো। সে হাত তুলে নির্দেশ দিতে লাগল। নড়ে উঠল নিশ্চল গাড়ির সারি। চলতে শুরু করল। কার লেন ঘেঁষে চলছে সাবরিনা যাতে পার্কিং গ্যারেজে ঢুকতে সুবিধে হয়। প্রবেশ পথের কাছাকাছি এসেছে, কার লেনের কাছে পেভমেন্টে ছোপ ছোপ রক্ত দেখতে পেল। একটা অ্যাম্বুলেন্স ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, সাদা কোট পরা এক অ্যাটেনডেন্ট হাত নেড়ে নেড়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলছে। মানুষজন ভিড় করেছে তাদেরকে ঘিরে। সাবরিনা দৃশ্যপট থেকে ফিরিয়ে নিল মুখ। গত কয়েকদিনে অনেক রক্তপাত আর বীভৎস দৃশ্য দেখেছে। আর দেখতে চায় না।

গ্যারেজের এন্ট্রান্সে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ল সাবরিনা। স্লটে ঢোকাল কোডেড কার্ড। কাঠের বাক্সটা ওপরের দিকে উঠে গেলে সে র‍্যাম্প ধরে প্রথম সাব লেভেল পার হলো, তারপর সেকেন্ড লেভেলের দিকে এগোল। ওখানে তার কোম্পানির পার্কিং এরিয়া।

আজ ও দেরিতে এসেছে বলে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলমান গাড়ি বলতে শুধু ওরটাই। খালি জায়গা পাবার জন্য একদম শেষ মাথায় যেতে হলো ওকে।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সাবরিনা, ডাটসানের দরজায় তালা মারল, তারপর এলিভেটরের দিকে হাঁটা দিল, বিশাল ঘরটির মাঝখানে এলিভেটর। কংক্রিটের গুহায় ওর পায়ের হাইহিল প্রতিধ্বনি তুলল। ওর খুব শীত করছে। এখানে বেশ ঠাণ্ডা। পাতলা সোয়েটার মানছে না শীত।

নিরব গাড়িগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঝকঝকে আলো ছড়াচ্ছে ফ্লুরেসেন্ট বাতি, বাতাসে পেট্রলের গন্ধ, সবমিলে আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজটি কেমন গা ছমছমে একটা পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। নিজের অজান্তেই হাঁটার গতি বৃদ্ধি পেল সাবরিনার। ভল্টে ওর পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

না, আছে।

মৃদু ঘরঘর একটা শব্দ হচ্ছে, সেসঙ্গে খটখট একটা আওয়াজ। দাঁড়িয়ে পড়ল সাবরিনা। কান পাতল। কেমন চেনাচেনা লাগছে শব্দটা, কিন্তু কাছে পিঠে শব্দ হচ্ছে

না.। ওপরের লেভেলের র‍্যাম্প থেকে ভেসে আসছে আওয়াজ।

ছাদ ঠেক দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকান্ড প্রকাণ্ড থামগুলোর একটার গায়ে কার যেন ছায়া পড়ল। ঢাল বেয়ে নেমে আসছে কেউ। সাবরিনার হাতের রোমগুলো হঠাৎ সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল। সে স্থির দাঁড়িয়ে রইল, চোখ র‍্যাম্পের নিচের দিকে।

স্কেট বোর্ডের ওপর ছেলেটাকে যখন দেখা গেল স্বস্তিতে প্রায় হেসে উঠল সাবরিনা।

'ডেভি, তুমি এখানে কী করছ?'

তার কণ্ঠ শুনে দক্ষতার সঙ্গে দিক বদল করল ছেলেটা, পার্ক করা গাড়ির সারির মাঝ দিয়ে ওর দিকে ছুটে আসতে লাগল।

'তোমার সমস্ত ফুল বিক্রি হয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা। কংক্রিটের গায়ে বাড়ি খেয়ে ওর গলার স্বর উঁচু এবং অস্বাভাবিক শোনাল।

ছেলেটা সাবরিনার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জুতো পরা একটা পা মেঝেতে চাপ দিয়ে দিয়ে গতি বাড়িয়ে ওর দিকে আসতে থাকল।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়তে খটকা লাগল সাবরিনার। ডেভির তো এখানে আসার কথা নয়। ও কোনোদিনই আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে আসে না। আর ছেলেটা যেভাবে ছুটে আসছে তার ছোটার মধ্যে কেমন আড়ষ্ট এবং বিদঘুটে একটা ভঙ্গি। মোটেই স্বাভাবিক লাগছে না তার আচরণ। সাবরিনা আর কিছু না বলে এলিভেটরে পা বাড়াল।

আর ঠিক তখন একটা বাতির নিচে এসে পৌঁছাল ডেভি এবং সাবরিনা তার মুখখানা দেখতে পেল। এই ভয়ংকর মুখ সাবরিনা খুব চেনে। মরা মানুষের চোখের ও চাউনিও তার খুব পরিচিত। ছেলেটার চোখ কেমন চকচকে, মুখটা খোলা, মাথাটা একপাশে হেলে আছে। দুটো গাড়ির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে আসার সময় তার মাথাটা পরিষ্কার দেখতে পেল সাবরিনা। এক কানের পেছনে থকথক করছে রক্ত। আর বুঝতে বাকি রইল না ওর রাস্তায় কে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে। ডেভিকে সে বহুবার চলন্ত দুই গাড়ির মাঝখানে স্কেটিং করতে দেখেছে।

ছুট দিল সাবরিনা। পেছনে রোলার স্কেটের অশুভ ঘরর ঘরর শব্দ তুলে ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ডেভি।

চুয়াল্লিশ

এলিভেটরের সামনে পৌঁছে গেছে সাবরিনা। UP লেখা বোতামে থাবা মারল। হিট-সেনসিটিভ সবুজ তীরটি জ্বলে উঠল তবে খুলল না দরজা। এলিভেটর এখন অন্য কোনো ফ্লোরে। ওটার নিচে নেমে আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না সাবরিনা।

সে দ্রুত ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। যে করিডরে সাবরিনা আছে, একই করিডর ধরে এগিয়ে আসছে ডেভি। ওদের দু'জনের মাঝখানে কংক্রিটের সমতল বিস্তৃতি ছাড়া আর কিছু নেই। ডেভির হাতে ধারালো কাঁচি। এ কাঁচি দিয়ে সে গাছ থেকে ফুল কাটে।

'ঈশ্বর!' গুঙিয়ে উঠল সাবরিনা। আবার দৌড় দিল। খোলা করিডরে স্কেটবোর্ড পায়ে ছেলেটার গতি তার চেয়ে অনেক বেশি। তাই সাবরিনা পার্ক করা গাড়িগুলোর সারির মধ্যে ঢুকে পড়ল। এঁকেবেঁকে একটার পর একটা সারিতে ঢুকতে লাগল।

গাড়ির সাইড মিটারে হাত আর কনুই লেগে ছিড়ে গেল কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ছোটায় বিরতি দিল না সাবরিনা। তার পেছনে ডেভি গাড়ির সারির ভেতরে ঢোকার জন্য গতি মন্থর করতে বাধ্য হলেও দৌড় প্রতিযোগিতায় সে সাবরিনাকে ক্রমে হারিয়ে দিচ্ছিল।

ছুটতে ছুটতে সাবরিনা ভীত হয়ে আবিষ্কার করল সে গ্যারেজের শীতল কংক্রিটের দেয়ালের সামনে এসে পড়েছে। তার পেছনে ঘরর ঘরর অবিরাম শব্দ তুলে অপ্রতিরোধ্য গতিতে আসছে মূর্তিমান আতঙ্ক ডেভি। সাবরিনা দেয়াল ধরে র‍্যাম্পের দিকে এগিয়ে চলল। এ র‍্যাম্প গিয়ে মিশেছে পরবর্তী লোয়ার লেভেলে। হঠাৎ দুড়ুম করে একটা শব্দ শুনল সাবরিনা। পেছন ফিরে দেখে একটা গাড়ির সঙ্গে বাড়ি খেয়ে পপাত ধরনীতল হয়েছে ডেভি। পড়ে গিয়ে সামান্য সময়ের জন্য গতিরোধ হলো তার। পরক্ষণে সে সিধে হলো এবং আবার ধাওয়া করল সাবরিনাকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে পরের সাব লেভেলে চলে এল সাবরিনা। এখানেও সারি সারি গাড়ি। কিন্তু কোনো মানুষজন নেই। ওকে সাহায্য করার কেউ নেই। সাবরিনা মোড় ঘুরল, ছুটে আরেকটা লেভেলে চলে এল। মাথার ওপরের ঘরর ঘরর আওয়াজ

ভীতিকরভাবে জানান দিল ছুটে আসছে যমদূত।

বটম লেভেল। এখানেও জনমনিষ্যির চিহ্নমাত্র নেই। শুধু গাড়ির সারি। র‍্যাম্প থেকে ভেসে এল স্কেট বোর্ডের শব্দ। ছুটে আসছে সাঁ সাঁ করে।

আর কোনো র‍্যাম্প নেই। এলিভেটর? ওটার কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। ওখানে ঢোকার সময় পাবে না সাবরিনা। কোনো গাড়ির মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে পড়বে? কিন্তু খোলা দরজার গাড়ির সন্ধান পেতে পেতে ডেভি এসে হামলে পড়বে ওর ওপর। গাড়ির সারির মাঝ দিয়ে ছুটোছুটি করে খুব বেশিক্ষণ ডেভিকে ফাঁকি দিতে পারবে না সাবরিনা। আর তারপর...

কীসে পা বেঁধে যেতে আর্তনাদ করে উঠল সাবরিনা। ও প্রায় হোঁচট খেতে যাচ্ছিল। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে র‍্যাম্পের একধারে কুণ্ডুলি পাকিয়ে পড়ে রয়েছে সরু, হালকা ওজনের লোহার শিকল। শিকলের একটা প্রান্ত কংক্রিটের দেয়ালের একটা স্ক্রুর সঙ্গে আটকানো, অপর প্রান্তটি খোলা। এ প্রান্তের মাথায় একটি সুইভেল ফ্যাসনার বা ছিটকিনি রয়েছে, এ লেভেলে গাড়ি চলাচল বন্ধ করার সময় এটি বিপরীত র‍্যাম্পের দেয়ালে আটকে দেয়া হয়।

কোনো কিছু চিন্তা না করেই শিকল মুক্ত প্রান্তটি হাতে তুলে নিয়ে র‍্যাম্পের দিকে ছুটল সাবরিনা। সে বাল্ক হেডের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে বসল। বিপরীত দিক থেকে কেউ এলেও ওকে দেখতে পাবে না। শিকলটি মাটিতে আলগা এবং নিচু করে শুইয়ে রাখল ও। র‍্যাম্পের মেঝে জুড়ে পড়ে রইল শিকল, ধূসর কংক্রিটের গায়ে প্রায় অদৃশ্য।

ঘরর ঘররর-ক্লিক। সাবরিনার মাথার ওপরে শেষ মোড়টা ঘুরল স্কেটবোর্ড, ছেলেটার দীর্ঘ ছায়া পড়ল শিকলের গায়ে।

শিকলের প্রান্ত শক্ত করে চেপে ধরে রইল সাবরিনা। ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে কলজে। দেখল ভয়ানক গতিতে ঢাল বেয়ে নেমে আসছে স্কেট বোর্ডার। ডেভির এক হাতে ধারালো কাঁচি, অন্য হাত দিয়ে রক্ষা করছে ভারসাম্য। গাড়ি চাপায় প্রায় ছাতু হয়ে যাওয়া মাথাটা এপাশ-ওপাশ দুলছে, চকচকে চোখ মেলে গাড়ির সারির মাঝে সাবরিনাকে খুঁজছে সে।

গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে শিকলের প্রান্তটা ঝট করে টান দিল সাবরিনা। পেভমেন্ট থেকে লাফ মেরে শূন্যে উঠে এল ওটা, ছুটন্ত স্কেটবোর্ডের হলুদ চাকা আর ফাইবার গ্লাসের মাঝখানে বেঁধে গেল। তাল সামলাতে না পেরে গতির তীব্রতা ডেভিকে ছুঁড়ে দিল শূন্যে, ওর গায়ে যেন পাখা গজাল, সোজা উড়ে গিয়ে পড়ল একটি ক্যাডিলাক গাড়ির পেছনের জানালায়। ভারী কাচের গ্লাস ভেঙে ওর মাথাটা ঢুকে গেল ভেতরে, খন্ড বিখন্ড ধারালো কাচের মধ্যে আটকা পড়ল। মাথাটা মুক্ত

করতে খামোকাই হাত পা ছুড়ল ডেভি।

সাবরিনা তখনও র‍্যাম্পের পাশে কুঁজো হয়ে বসে আছে, হাতে ধরা শিকল। শিকলের গায়ে আটকে রয়েছে স্কেটবোর্ড, শুধু তার মালিক নেই। স্কেটবোর্ডের মালিক ক্ষুরধার কাচের ভাঙা টুকরোর ফাঁদে পড়ে তখন ছটফট করছে। সাবরিনা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল কাচের টুকরোর আঘাতে ডেভির ঘাড় ফালাফালা হয়ে বেরিয়ে পড়েছে শিরা, পেশী এবং শ্বাসনালী।

মাথার ওপর থেকে গাড়ির টায়ারের তীক্ষ্ণ ক্রিইইচ শব্দ ভেসে এল। হাত থেকে শিকল ছেড়ে দিয়ে বাল্ক হেডের গায়ে হেলান দিল সাবরিনা। কয়েক সেকেন্ড পরেই রবার্টের কামারো গাড়ি এসে থামল র‍্যাম্পের সামনে। রবার্ট লাফ মেরে নামল গাড়ি থেকে। একছুটে চলে এল সাবরিনার কাছে। ঢাল বেয়ে আরও মানুষের ছুটন্ত পদশব্দ শোনা গেল।

ক্যাডিলাকের পেছনের জানালায় ছটফট করতে থাকা ডেভির শরীর দেখতে দেখতে স্থির হয়ে এল। তার ধড়টা ওখানে ঝুলে রইল, মুণ্ডুটা আটকে আছে তরবারির মতো ধারালো কাচখণ্ডের ভেতরে। শেষ পিশাচের প্রতিহিংসার পরিণতি ঘটল এভাবেই।
